আলোরপথ

৬ষ্ঠ সংখ্যা • ৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ • ১৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরী

কাশিমপুরে যাওয়ার অপেক্ষায় আর থাকতে হবেনা আমাদের!

হেরার আলোর ঝলকানি এক নির্ভিক আল্লামা সাঈদী

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী: যুগশ্রেষ্ঠ এক মুফাসসির

Maulana Delowar Hossain Sayedee - A uniquely transgenerational inspiration for the masses

Supporting Care Ltd offers a care at home service, tailored to meet each of our client's needs, to ensure they continue living happy and fulfilling lives in the comfort of their own homes.

supporting care

Care Quality Commission
Overall rating for this service
Good

Supporting Care Ltd was established in 2012 offering services to local residents for over a decade. We have a network of franchises; Barking & Dagenham 020 3538 7767 and Redbridge 020 3007 4141.

We aim to provide the highest quality homecare to vulnerable and elderly clients. Our focus of attention is our clients, and we believe this is a two way partnership that works both ways, including their family or friends, being part of their journey with us.

We offer the following; Short flexible visits, domestic tasks, 24 hour visits/living in care, night care, palliative care, companionship, sit-in-service, respite care for families wanting short breaks, blitz one off cleaning service and many more, please check our website.

LOOKING FOR A JOB?

Home Care Worker required, ideally with Health and Social Care qualification or willing to undertake trainings. We'll help you develop your knowledge through our specialist training courses and ensure you have all the support you need from our team. If you have already worked as a domiciliary carer, health care assistant, a carer in a care home or hospital, then we'd love to speak with you about joining our team.

0207 5381010 **www.supportingcare.co.uk**

সাপোর্টিং কেয়ার লিমিটেড আমাদের ক্লায়েন্টের প্রতিটি প্রয়োজন মেটানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাতে তারা তাদের নিজেদের বাড়িতে আরামদায়ক সুখী এবং পরিপূর্ণ জীবনযাপন চালিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য হোম সার্ভিস কেয়ার অর্থাৎ ঘরে পরিচর্যা সেবা প্রদান করে।

সাপোর্টিং কেয়ার লিমিটেড ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের পরিষেবা প্রদান করে আসছে। আমাদের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নেটওয়ার্ক আছে; এগুলো হচ্ছেঃ **বার্কিং অ্যান্ড ডেগেনহাম ০২০ ৩৫৩৮ ৭৭৬৭ এবং রেডব্রিজ ০২০ ৩০০৭ ৪১৪১**।

দুর্বল এবং বয়স্ক ক্লায়েন্টদের সর্বোচ্চ মানের হোম কেয়ার প্রদান করাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হল আমাদের ক্লায়েন্ট, এবং আমরা বিশ্বাস করি এটি একটি দ্বিমুখী অংশীদারিত্ব যা উভয় উপায়ে কাজ করে এবং আমাদের সাথে তাদের যাত্রার অংশ হিসেবে এর সাথে তাদের পরিবার বা বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আমরা নিচে উল্লেখিত সেবাগুলো অফার করে থাকিঃ

সংক্ষিপ্ত নমনীয় পরিদর্শন, ঘরোয়া কাজ, ২৪ ঘন্টা পরিদর্শন/যত্নে বসবাস, রাতের যত্ন, উপশমকারী যত্ন, সহচরী, সিট-ইন-পরিষেবা, স্বল্প বিরতি পেতে চান এমন পরিবারের জন্য অবকাশ কেয়ার, ব্লিটজ ওয়ান অফ ক্লিনিং পরিষেবা এবং আরও অনেক কিছু।

বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন - **www.supportingcare.co.uk**

Head office : 19 Morris Road, London, E14 6FF, Tel: 0207 538 1010

চাকরি খুঁজছেন?

হোম কেয়ার কর্মী প্রয়োজন, আদর্শভাবে স্বাস্থ্য এবং সামাজিক যত্নের যোগ্যতা সহ বা প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক। আমরা আপনাকে আমাদের বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে আপনার জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করব এবং আমাদের টিমের কাছ থেকে আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা নিশ্চিত করব। আপনি যদি ইতিমধ্যে একজন আবাসিক তত্ত্বাবধায়ক, স্বাস্থ্যসেবা সহকারী, কেয়ার হোম বা হাসপাতালে একজন পরিচর্যাকারী হিসাবে কাজ করে থাকেন, তাহলে আমরা আমাদের দলে যোগদানের বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই।

আলোরপথ

৬ষ্ঠ সংখ্যা, ০৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, ১৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরী

উপদেষ্টামণ্ডলী

মোসলেহ ফারাদী
হামিদ হোসাইন আজাদ
নূরুল মতীন চৌধুরী

সম্পাদক

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সম্পাদনা সহযোগী

মোসাদ্দেক আহমেদ
সৈয়দ তোফায়েল হোসেন

রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স

আবু ইহসান
মাহবুবুল আলম সালেহী

পাবলিকেশন্স সহযোগী

জামিল মাহমুদ

জুনাইদ ভূইয়া

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

ইউসুফ ইসলাম

প্রকাশকাল

অক্টোবর : ২০২৩

প্রকাশনায়

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)
3rd Floor Business Wing
38-44 Whitechapel Road
London E1 1jx
www.mcasite.org

সূচিপত্র

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী: যুগশ্রেষ্ঠ এক মুফাসসির ০৪
মোসলেহ ফারাদী

কাশিমপুরে যাওয়ার অপেক্ষায় আর থাকতে হবে না আমাদের! ১০
মাসুদ সাঈদী

আমার দাদাজী ১৪
তাসনুভা তামান্না সাঈদী

"হেরার আলোর ঝলকানি" এক নির্ভিক আল্লামা সাঈদী ১৫
এ এন এম এ জাহের

বিলেতে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ২১
আবু সাকিব

আদর্শ স্থানীয় সফল জীবন গঠনে আল্লামা সাঈদী এক অনন্য প্রেরণার বাতিঘর ২৪
হামিদ হোসাইন আজাদ

ইসলামী জাগরণে মাওলানা সাঈদীর অবদান ২৬
শায়খ আব্দুল কাইয়ুম

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.): বিশ্বময় আলোড়ন সৃষ্টিকারী আল কোরআনের মুফাসসির ২৭
অধ্যাপক মফিজুর রহমান

সুখরঞ্জন বালি ও মাওলানা সাঈদী ৩২
ব্যারিষ্টার আব্দুর রাজ্জাক

পাশ্চাত্যে আল্লামা সাঈদীর অবদান ৩৫
মামুন আল আযামী

Maulana Delowar Hossain Sayedee (ra) - A uniquely transgenerational inspiration for the masses ৩৬
Muhammad Habibur Rahman

সূচিপত্র

Allama Sayedee's smiling departure and dynamic legacy ৩৯
Ajmal Masroor

দা'ঈ জীবনের অনুপম প্রেরণা শহীদ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) ৪২
মুহাম্মদ আবুল হুসাইন খান

শহীদ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) ৪৮
ডা. মোহম্মদ আমিন

আমার দেখা আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) ৫১
ড. আব্দুস সালাম আজাদী

স্মৃতির পাতায় কুরআনের পাখি আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী: তাযদীদে দ্বীন ও কুরআনের তাফসীরে তার অবদান ৫৪
আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) ও তার কৃত আল কোরআনের অনুবাদের উপর সংক্ষিপ্ত মুল্যায়ন ৫৯
ড. মিজানুর রহমান

আল্লামা সাঈদী স্মরণে ৬৫
আলী আহমাদ মাবরুর

"বড়ো দাঈ ইলাল্লাহ" মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) ৭১
এ. কে. মওদুদ হাসান

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী যুগের শ্রেষ্ঠ দাঈ ৭৩
ডা. মসিহুর রহমান

এক কিংবদন্তির বিদায়ে শোকাবিভূত বাংলার এপার-ওপার ৭৫
ইমরান হোসেন

যেভাবে শুরু হয়েছিলো শহীদ আল্লামা সাঈদীর (রহ.) মাহফিল জিন্দেগী ৭৭
আব্দুস শহীদ নাসিম

সাঈদী হুজুরের সাহচর্য ৭৮
আইয়ুব খান

লন্ডনে শহীদ মাওলানা সাঈদী: অম্লান স্মৃতিতে ভাস্বর ৭৯
মুহাম্মদ আনসার মুস্তাকিম

আপন নীড়ে কুরআনের পাখি : একজন অকুতোভয় নির্ভীক সৈনিক দাঈ ইলাল্লাহ'র বিদায় ৮০
মুহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুছ খান

মাওলানা সাঈদীর বিনয়, আদব ও রাসুল (সা.) প্রেম ৮২
মাহমুদ বিন সাঈদ

আল্লামা সাঈদীকে যেমন দেখেছি ৮২
উম্মে তাহমিদ

আল্লামার সাথে দুইবার সাক্ষাতে এক ও অভিন্ন নসিহা ৮৩
আবু নাঈম মু শহীদুল্লাহ

আমার ভাই দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ৮৫
হাজী আব্দুল মান্নান

ইসলামে মহিলাদের অধিকার: শহীদ মাওলানা সাঈদীর অসাধারণ বক্তব্য ৮৭
আনজুম আরা বেগম (বিউটি)

কবিতা

Departure of Maulana Sayedee ৯০
Syed Nuh

শহীদ আল্লামা সাঈদী (রাহি.) -মোহম্মদ ওমর ফরহাদ ৯০

প্রিয় আল্লামা -হাসান আল রুমি ৯১

গান

আল্লামা সাঈদী তুমি মরনি -জুবায়ের আহমেদ তাশরীফ ৯২

হযরত আল্লামা সাঈদী- মোঃ রোকন আহমেদ ৯২

সংগঠন সংবাদ ৯৩

স্মৃতি এ্যালবাম ৯৯

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ। মস্তক অবনতচিত্তে শুকরিয়া আদায় করছি বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। যিনি আমাদেরকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন, একনিষ্ঠ দাঈ ইলাল্লাহ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর তথ্যবহুল একটি ম্যাগাজিন প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দূত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, যার দেখানো পথে বিশ্ব মানবতার ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও সমৃদ্ধি রয়েছে।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.) বিংশ শতাব্দীর এক ক্ষণজন্মা প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন। যিনি একাধারে মুফাসসিরে কোরআন, দাঈ, সমাজ সংস্কারক, ইসলামিক চিন্তাবিদ, জাতীয় সংসদ সদস্য ও ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ নেতা। দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয়পাত্র। কুরআনের দাওয়াত নিয়ে তিনি সুদীর্ঘ ৫০ বছরের অধিক সময় দেশের প্রতিটি জনপদ থেকে শুরু করে পৃথিবীর বহুদেশে অসংখ্যবার ছুটে গিয়েছেন। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু পথহারা মানুষ পেয়েছে সত্যনিষ্ঠ পথ 'সিরাতুল মোস্তাকিম'র সন্ধান। আলোর সন্ধান পাওয়া মানুষেরা তার নাম দিয়েছে 'কুরআনের পাখি'।

আল্লামা সাঈদী ছিলেন সময়ের সাহসী কণ্ঠস্বর। বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে পথভোলা মানুষদের হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে কুরআন হাতে নিয়ে তিনি ছুটেছেন দুরন্ত গতিতে। যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেছেন বলিষ্ঠকণ্ঠে। সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ ও পুঁজিবাদের অসাড়তা তুলে ধরে তৌহিদী জনতাকে সত্যের লড়াইয়ে শামিল করেছেন। তার সাহসী উচ্চারণ, যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য ও সর্বোপরি কুরআনের বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ দল, মত, বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষকে আকর্ষণ করেছে তীব্রভাবে।

আল্লামা সাঈদী'র প্রচারিত আদর্শকে পরাজিত করতে না পেরে ১৯৭১ সালের মীমাংসিত ইস্যুকে বিকৃতভাবে সামনে এনে আল্লামাকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা করা হয়। তথাকথিত মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের নামে আল্লামা সাঈদীকে দীর্ঘ ১৩ বছরের অধিক সময় কারাগারে আটক রেখে শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হয়েছে। বয়োবৃদ্ধ এই আলেমেদ্বীনকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে সুচিকিৎসা ও সেবা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ধীরে ধীরে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আল্লামা সাঈদীকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

আল্লামা সাঈদী'র ইন্তেকালে বিশ্ব একজন কুরআনের খাদেমকে হারিয়েছে। যার শূন্যতা পূরণ আমরা মনে করি অসম্ভব। কুরআনের পাখির বিদায়ে পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে কোরআনপ্রেমিকদের অশ্রু ঝরেছে। হৃদয়ের ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস ভারী হয়েছে। একই সাথে তার অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নেওয়ার দীপ্ত শপথ গ্রহণ করেছে তার উত্তরসূরীরা।

'আলোর পথ' ম্যাগাজিনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এর ৬ষ্ঠ সংখ্যাটি কুরআনের পাখি আল্লামা সাঈদী (রাহি.) এর জীবন ও কর্মের ওপর প্রকাশ করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে, আমরা দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ আলেমেদ্বীন, আল্লামা সাঈদী'র সহযোদ্ধা, লেখক-গবেষক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও তার পরিবার সদস্যদের তথ্যবহুল লেখা নিয়ে এই সংখ্যা আপনাদের নিকট উপস্থাপন করেছি। এই সংখ্যা আলোর পথের অতীতের যেকোনো সংখ্যা থেকে কলেবরে বড়ো হয়েছে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া একটি ম্যাগাজিনে এবং একটি সংখ্যায় আল্লামা সাঈদী (রাহি.)-এর বিশাল কর্মযজ্ঞ তুলে ধরাও অসম্ভব। আমাদের সীমাহীন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পাঠকের চাহিদা আলোকে এই সংখ্যা সাজানোর চেষ্টা করেছি। আল্লাহ আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

এই সংখ্যায় আল্লামা সাঈদী'র জীবনের নানা দিক সংশ্লিষ্ট লেখকরা বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। যা বৃহৎ পরিসরে অনেকের অজানা। এসব তথ্যের দায়-দায়িত্ব লেখকের ব্যক্তিগত। একইসাথে, এই সংখ্যা সমৃদ্ধ করতে লেখকরা যেভাবে এগিয়ে এসেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একই সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, পাঠক ও যারা সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা জুগিয়েছেন তাদের প্রতি। আলোর পথ প্রকাশের সম্পৃক্ত সকলকে আল্লাহ আখেরাতে উত্তম জাযাহ দান করুন। আমিন।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী: যুগশ্রেষ্ঠ এক মুফাসসির

মোসলেহ ফারাদী

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। যুগশ্রেষ্ঠ এক দাঈ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত নায়েবে আমীর। সাবেক সংসদ সদস্য। অভিজ্ঞ পার্লামেন্টেরিয়ান। বহু গুণে ও যোগ্যতায় সমৃদ্ধ একজন মানুষ। স্বাধীন বাংলাদেশে তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের সূত্রপাতের ইতিহাসের সাথে তার নাম জড়িয়ে আছে। আর তাঁর সুকণ্ঠী বয়ান দিয়েই তাফসীরুল কুরআনের এই আয়োজন আজ জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছে।

আল্লামা সাঈদী নিছক কোনো নাম বা পদবি নয়। বরং বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের একটি গৌরবজ্জল অধ্যায়। তাঁর সিলসিলা এবং রেখে যাওয়া অনন্যসাধারণ সব কর্মকাণ্ড যুগ যুগ ধরে অগণিত মানুষকে আলোর পথ দেখাবে, তার জন্য সাদকায়ে জারিয়া হয়ে বিদ্যমান রবে ইনশাআল্লাহ।

দেশে ও বিদেশে তাঁর অসংখ্য ভক্ত ও গুণগ্রাহী তো আছেনই, ভিন্নমতের ও ভিন্ন আদর্শের মানুষের কাছেও তাঁর জনপ্রিয়তা নজিরবিহীন। এমনকি তার প্রতিপক্ষও তার নানামুখী কর্মকাণ্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালের পর সরকারি দলের নানা স্তরের নেতাকর্মীরা যেভাবে শোকবাণী দিয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি করেছেন এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সরকারি দল থেকে যে পরিমাণ নেতাকর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে– এমন দৃষ্টান্তও বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় আর কারো বেলায় ঘটেনি।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী শুধু একজন আলেমে দ্বীনই নয়, বরং অসংখ্য আলেমের ওস্তাদ ও পথ প্রদর্শক। জীবনের শেষ কয়েক বছর প্রচণ্ড নির্যাতন ও বৈরিতার মুখে যেভাবে তিনি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে গেছেন তা আগামী বহু বছর মানুষকে প্রেরণা দিয়ে যাবে। তিনি মুফাসসিরদের মধ্যে একজন কিংবদন্তি ছিলেন। উৎকৃষ্ট শব্দচয়ন তার বক্তব্যকে করেছে সমৃদ্ধ। এত স্পষ্ট এবং এত প্রকাশ্য আলোচনা সহজে শোনা যায় না। এরকম বক্তাও পাওয়া খুবই কঠিন, যার বক্তব্য একইসাথে সমাজের আমজনতা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষিত পর্যন্ত সব শ্রেণিকে একইভাবে বিমোহিত করেছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, পিতা-সন্তান, স্বামী-স্ত্রী সবাই তার ওয়াজে চিন্তার খোরাক পেতেন, মানসিকভাবে স্বস্তিবোধ করতেন। তিনি যখন ওয়াজ শুরু করতেন তখন দেখা যেতো, সামনের ময়দান তো বটেই, আশপাশের ভবনগুলোর বারান্দা, ছাদ থেকে এমনকি গাছের মগডালে বসে মানুষজন তাঁর ওয়াজ শ্রবণ করতো। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় বক্তা। সুদীর্ঘ ৫০টি বছর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, প্রতিটি জেলায়, উপজেলায়, ইউনিয়নে এবং দেশের বাইরের অগণিত স্থানে কুরআন নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা, ইবনে তাইমিয়া, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালসহ অসংখ্য সালাফ কারাগারে অন্তরীণ থাকার যে নজরানা রেখে গেছেন আল্লামা সাঈদীও সেই সিলসিলা অনুসরণ করে গেছেন অত্যন্ত দৃঢ় ও বলিষ্ঠভাবে। তিনি গত ১৪ আগষ্ট ৮৪ বছর বয়সে কারাগারের প্রিজন সেলে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ড ইনশাআল্লাহ আরো অনেক বছর বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা মুসলিমদের প্রেরণা জুগিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পাদিত নেক আমলগুলো কবুল করুন। আজকের এই সংক্ষিপ্ত রচনায় আমি আল্লামা সাঈদীর জীবন ও কর্মের ওপর সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

জীবনের প্রাথমিক অধ্যায়

১৯৪০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি বর্তমান পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলার সাইদখালী গ্রামে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইউসুফ সাঈদী একজন স্বনামধন্য ইসলামী পণ্ডিত বা আলেম ছিলেন। স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় পিতার হাত ধরেই আল্লামা সাঈদীর দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরে তিনি খুলনা আলিয়া মাদ্রাসায় কিছুদিন এবং পরে ১৯৬২ সালে ছারছিনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করেন। কামিল পাশ করার পর বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্র নীতি, মনোবিজ্ঞান ও বিভিন্ন তত্ত্বের উপর দীর্ঘ ৫ বছর অধ্যায়ন করেন। তখন থেকেই তার গ্রাম ও আশপাশের এলাকায় তিনি মাওলানা সাঈদী হিসেবে পরিচিত হতে শুরু করেন। বাংলা ভাষা ছাড়াও উর্দু, আরবি, পাঞ্জাবি, ইংরেজি ভাষায় তার পারদর্শিতাও ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিনয়ে সমৃদ্ধ একজন মানুষ

আল্লামা সাঈদীর মধ্যে যতগুলো মানবীয় গুণের সমাবেশ ছিল তার মধ্যে বিনয় ছিল সর্বজনস্বীকৃত। যদিও তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ একজন আলেম ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন, এরপরও

তিনি নিজেকে বরাবরই তালিবে ইলম বা জ্ঞানের একজন ছাত্র হিসেবেই অভিহিত করতেন। তাকে মুফাসসির বললে তিনি লজ্জা পেতেন এবং প্রকাশ্যে নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করতেন। কুরআনের ওপর এতটা জ্ঞান থাকার পরও তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত তাঁর বিনয়েরই বহিঃপ্রকাশ। এত বড়ো মাপের একজন মানুষ এবং তুমুল জনপ্রিয় একজন বক্তা হওয়ার পরও তিনি অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে অপরের পরামর্শ আমলে নিতেন। এতে তাঁর হৃদয়ের বিশালতাই প্রকাশিত হয়। বিনয় এবং অপরের সমালোচনাকে গ্রহণ করার এই মানসিকতা তাকে এগিয়ে যেতে অনেক বেশি সহায়তা করেছে। তিনি জ্ঞানার্জনকে জীবনের মিশন বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাই নতুন কিছু শেখার বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল ব্যাপক। বিনয় এবং অপরের সাথে মিশে যাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতার কারণেই আল্লামা সাঈদী জনমানুষের ওপর এতটা প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন। তাঁর সাথে একবার সাক্ষাত হয়েছে এমন কেউই তাঁর হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা কখনো ভুলতে পারেনি।

রাজনৈতিক জীবন

১৯৭৯ সালে সাধারণ সমর্থক হিসেবে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৮২ সালে তিনি সংগঠনের রোকন (সদস্য) হন। এরপর ১৯৮৯ সালে তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে তিনি জামায়াতের নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালে তিনি জামায়াতের নায়েবে আমীর নির্বাচিত হন এবং ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

আল্লামা সাঈদী ১৯৯৬ সালে পিরোজপুর-১ সংসদীয় এলাকা থেকে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ২০০১ সালে তিনি আবারও একই আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। দুইবার সংসদ সদস্য থাকাকালীন সময়ে এলাকার ও জনপদের ব্যাপক উন্নয়ন করেন। ইসলামী একজন স্কলার, সাবেক আইন প্রণেতা এবং বিদগ্ধ বক্তা হওয়ার কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি একজন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত হন। তিনি এমন একটি সংসদীয় আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন যেখানে ভোটারদের অর্ধেকাংশই ছিল সংখ্যালঘু বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের। অথচ তিনি হিন্দুদের ভোটই বেশি পেয়েছিলেন।

তার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা মূলত ধর্ম, দলীয় পরিচয় ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝেই বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই ২০১৩ সালে যখন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ট্রাইবুনালে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত করা হয় তখন রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় গোষ্ঠী ও ব্যক্তি নির্বিশেষে সবাই তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত অন্যায্য রায়ের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে এসেছিল। একদিনে ২শরও বেশি লোকের নিহত হওয়ার ঘটনাও তখন ঘটেছিল যা বাংলাদেশ তো বটেই বিশ্ব রাজনীতিতেও নজিরবিহীন একটি ঘটনা। এত বিশাল সংখ্যক মানুষের আত্মত্যাগ আল্লামা সাঈদীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও তার ব্যাপক জনপ্রিয়তারই সুস্পষ্ট নিদর্শন।

১৯৯৬ সালে যখন প্রথমবারের মতো আল্লামা সাঈদী একজন সদস্য হিসেবে সংসদে গমন করেন তখনই একজন মার্জিত, দক্ষ এবং যোগ্য পার্লামেন্টেরিয়ান হিসেবে তিনি তার সফলতার সাক্ষর রাখেন। তাঁর বক্তব্য শুনে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকই এমনও বলেছিলেন যে, 'আল্লামা সাঈদীর কথা শুনলে মনে হয় না তিনি প্রথমবার নির্বাচিত হয়ে সংসদে এসেছেন। বরং মনে হয়, তিনি যেন বহুদিন ধরেই পার্লামেন্টে অবস্থান করছেন আর পার্লামেন্টের আদব ও রীতিনীতি সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট পরিমাণে সিদ্ধহস্ত।' আল্লামা সাঈদী যখনই পার্লামেন্টে কথা বলতেন, তাঁর কথায় ও শব্দচয়নে পরিপক্কতা ও দূরদর্শিতার সন্ধান পাওয়া যেতো। তিনি পার্লামেন্টে দ্ব্যর্থহীনভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা ঘোষণা করতেন এবং বলতেন, জনগণ নয় বরং আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস। তিনি আরো বলতেন, সার্বভৌমত্ব জনমানুষের মালিকানাধীন কোনো বিষয় নয়, বরং সার্বভৌমত্ব হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সবচেয়ে বড়ো একটি নেয়ামত।" এর আগে পার্লামেন্টে প্রবেশ করার সময় স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে মাথা নিচু করে প্রবেশের একটি রেওয়াজ ছিল। আল্লামা সাঈদী প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করেন এবং স্পিকারের সামনে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করেন। কারণ তিনি বলিষ্ঠভাবেই বলেছিলেন, "একজন মুসলিম আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নোয়াতে পারে না।"

তিনি খুবই নিখুঁতভাবে এবং নিয়মসম্মতভাবে পার্লামেন্টে বিল নিয়ে আসতেন এবং উক্ত বিল পাস করানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি ধর্ম মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর এসব কার্যক্রম মূলত জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করে। নৈতিকতার পক্ষে এবং জনগণের কল্যাণে তাঁর সরব কণ্ঠস্বর তাকে পার্লামেন্টেরিয়ান হিসেবে একটি ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।

সংসদে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়েও বলিষ্ঠ বক্তব্য দিয়েছেন। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে আল কায়েদার কথিত সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা মিত্ররা যখন আফগানিস্তানে সামরিক আগ্রাসন শুরু করেন, আল্লামা সাঈদী তাঁর তীব্র বিরোধিতা করে

তখন সংসদে বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি নানা অজুহাতে মুসলিম দেশগুলোর ওপর পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক আগ্রাসন ও অভিযানের সমালোচনা করেন। তিনি তখন বলেছিলেন, পশ্চিমারা মূলত এসব দেশের খনিজ সম্পদের ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে এবং অস্ত্র বাণিজ্য করে বিপুল অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যেই এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করে। আল্লামার এই কথাগুলো কালের বিবর্তনে এখন অনেকটাই সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

একজন দাঈ ইলাল্লাহ

১৯৬৭ সাল থেকেই আল্লামা সাঈদী দাঈ ইলাল্লাহ হিসেবে তার কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তীতে একটানা ৫০ বছরের বেশি তিনি বাংলাদেশের সর্বত্র এবং বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশজুড়ে এই দাওয়াহ কার্যক্রম অব্যহত রাখেন। বাংলাদেশে ধারাবাহিক আকারে বা একইস্থানে টানা কয়েকদিন তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে বক্তব্য দেওয়ার নতুন ধারার সূচনা করেন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। তার এই কয়েকদিন ব্যাপী তাফসীর মাহফিলের মধ্যে রয়েছে:

ক. চট্টগ্রাম প্যারেড গ্রাউন্ড ময়দানে প্রতি বছর ৫ দিন করে দীর্ঘ ২৯ বছর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কাবা শরীফের সম্মানিত ইমাম এ মাহফিলে দু'বার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

খ. খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানসহ শহরের বিভিন্ন মাঠে প্রতি বছর ২ দিন করে দীর্ঘ ৩৮ বছর তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

গ. সিলেট সরকারি আলীয়া মাদ্রাসা মাঠে প্রতি বছর ৩ দিন করে দীর্ঘ ৩৩ বছর যাবৎ তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ. রাজশাহী সরকারি মাদ্রাসা মাঠে প্রতি বছর ৩ দিন করে দীর্ঘ ৩৫ বছর যাবৎ তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ঙ. বগুড়া শহরে প্রতি বছর ২দিন করে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চ. ঢাকা কমলাপুর রেলওয়ে ময়দান ও পল্টন ময়দানে প্রতি বছর ৩ দিন করে দীর্ঘ ৩৪ বছর যাবৎ তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ছ. কুমিল্লা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে তিনদিন ব্যাপী দীর্ঘ ৩১ বছর যাবৎ তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসব মাহফিলে আল্লামা সাঈদীর দেওয়া বক্তব্য এখন অডিও-ভিডিও আকারে নানা প্লাটফর্মে সংরক্ষিত আছে যেগুলো আগামী দিনগুলোতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষকে উজ্জীবিত করে যাবে।

আল্লামা সাঈদী ছিলেন আপাদমস্তক একজন দাঈ ইলাল্লাহ। গাজীপুর হাসপাতালে তিনি অল্প সময় ছিলেন। উক্ত হাসপাতালের রেজিষ্ট্রার পরবর্তীতে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাসে লিখেন যে, অতি অল্প-সময়ে ডাক্তার-নার্স, অন্যান্য রোগী সকলেই তাঁর আচরণে মোহিত হয়ে যায়। তিনি বিদায় নেওয়ার সময় ডাক্তার সাহেব এর মাথায় হাত দিয়ে বলেন, "বাবা ঠিকমত নামাজ পড়বে"। তারপর যখন তাকে ঢাকায় পিজি হাসপাতালে আনা হয় এ্যম্বুলেন্স থেকে নামানোর সময় যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপনি কেমন আছেন?' তখনও তিনি হৃদয়গ্রাহী হাসি দিয়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভাল আছি। সেই সময় তিনি যে সকল কারারক্ষী তাঁকে নিয়ে আসেন কৃতজ্ঞতাসহ তাদের সেবাযত্নেরও প্রশংসা করেন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আল্লামা সাঈদী

দাঈ ইলাল্লাহ হিসাবে কার্যক্রম তাকে দ্বীনের দাওয়াতের অংশ হিসেবে বিশ্বের অনেক দেশে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। ১৯৭৬ সাল থেকে সৌদি আমন্ত্রণে রাজকীয় মেহমান হিসেবে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী হজ পালন। ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর রমজান মাস মক্কা মদীনায় গমন তাঁর নিয়মিত রুটিনে পরিণত হয়েছিল।

১৯৮২ সালে ইমাম সৈয়দ আলী হোসেইনী খোমেনির আমন্ত্রণে ইরানের প্রথম বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তেহরান সফর করেন। ১৯৯১ সালে সৌদি বাদশার আমন্ত্রণে কুয়েত-ইরাক যুদ্ধের মিমাংসার জন্য আয়োজিত বৈঠকে তিনি যোগদান করেন। ১৯৯১ সালে ইসলামী সার্কেল অফ নর্থ অ্যামেরিকা তাকে "আল্লামা" খেতাবে ভূষিত করে। ১৯৯৩ সালে নিউইয়ার্কে জাতিসংঘের সামনে অ্যামেরিকান মুসলিম ডে প্যারেড সম্মেলনে মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীকে "গ্র্যান্ডমার্শাল" পদক দেওয়া হয়। দুবাই সরকারের আমন্ত্রণে ২০০০ সালের ৮ই ডিসেম্বর আরব আমিরাতে ৫০,০০০ হাজারেরও বেশি শ্রোতার সামনে তিনি কুরআনের তাফসির পেশ করেন। লন্ডন মুসলিম সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কাবা শরিফের সম্মানিত ইমাম "শায়েখ আব্দুর রাহমান আস সুদাইসির" সাথে মাওলানা সাঈদীও আমন্ত্রিত হন।

উঁচুমানের একজন লেখক

আল্লামা সাঈদী ৭০টিরও বেশি বই লিখে গেছেন যেগুলো আগামী দিনে পাঠকের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

অনন্য গুণাবলিতে সমৃদ্ধ এক মানুষ

আল্লামা সাঈদী ছিলেন বহু গুণে গুনান্বিত একজন মানুষ। বহু বছর নিরন্তর ও কর্তব্যনিষ্ঠভাবে কুরআনের তাফসীর দিয়ে যাওয়ায় তার ওপর জনমানুষের আস্থা ও বিশ্বাস প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর কুরআনের তাফসীরের ভাষা ছিল সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক। তাই সাধারণ মানুষ দারুণভাবে তাঁর তাফসীর উপভোগ করতো। রাসুল (সা.) এর নির্দেশনা অনুযায়ী (আললিমু ওয়া ইয়াসসিরু) তিনি সরল ভাষাতেই বক্তব্য প্রদানে অভ্যস্ত ছিলেন। আল কুরআনের ওপর নিপুন বক্তব্য ও বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপন তাকে মুফাসসির জগতের উৎকর্ষ অবস্থানে উন্নীত করেছিল।

আল্লামা সাঈদীর আগেও বাংলায় কুরআনের আলোচনা হতো। তবে সেগুলোকে ঠিক তাফসীরুল কুরআন বলা হতো না। আর তৎকালীন বক্তারাও এমনটা দাবি করতেন না। তারা অনেকটা পুঁথি, অনেকটা রূপকথা এবং সত্য মিথ্যার মিশ্রণে মানুষের সামনে কেচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করতেন। এক্ষেত্রে আল্লামা সাঈদী নতুন একটি ধারার সূচনা করেন। তিনি কুরআনের ওপর ভিত্তি করেই কুরআনের আলোচনা শুরু করেন। তাঁর তাফসীরের বয়ান ছিল জ্ঞান ও তথ্য নির্ভর। তাঁর তাফসীর আলোচনা ছিল বহু বিষয়ের সমন্বয়। এ কারণে তাঁর মাহফিলগুলোতে ছাত্র, শিক্ষক,

অভিভাবক, সন্তান, পেশাজীবী, সাধারণ নাগরিক, নেতৃবৃন্দ, কর্মী, লেখক, গবেষক, সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষসহ সকলেই যোগদান করতো এবং তাঁর আলোচনা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রবণ করতো। আল্লামা সাঈদীর রেখে যাওয়া একটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কুরআনের প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোকবর্তিকার সহায়তায় সমাজের বৈচিত্রময় সব অন্তরকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারতেন। পরস্পরের ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারতেন এবং প্রত্যেকেরই মন জয় করতে পারতেন। এ কারণে তাঁর আদর্শিক ও রাজনৈতিক বিরোধীরাও ওয়াজের ভক্ত ছিলেন।

১৯৭৫ সাল। আমি তখন ফেনী আলিয়া মাদ্রাসার কামিল (হাদিস) বিভাগের একজন ছাত্র। তখনই আমি সর্বপ্রথম একটি মাহফিলে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাই যেখানে আল্লামা সাঈদী বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। ঐ মাহফিলে বিপুল সংখ্যক মানুষ সমবেত হয়েছিল। সেদিনের একটি স্মৃতি আমি কখনোই ভুলবো না। এই স্মৃতিটি আমার সাথে এখনো রয়ে গেছে এবং আমি যতদিন বাঁচবো স্মৃতিটি অমলিন হয়ে আমার সাথে থেকে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমি সেদিন মঞ্চের খুব কাছাকাছি বসতে পারিনি। বরং মঞ্চ থেকে অনেকটা দূরেই আমার অবস্থান ছিল। তিনি যখন ওয়াজ করছিলেন, আবেগের সাথে বক্তব্য প্রদান করছিলেন আমার মনে হচ্ছিল যেন আমাকে তিনি তাঁর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই সম্মোহিত হওয়ার অনুভূতিটি আজও আমার সাথে আছে।

পরবর্তীতে তিনি যখন যুক্তরাজ্যে আসলেন, তখন আমি মুসলিম কম্যুনিটি এসোসিয়েশনের পূর্ববর্তী সংস্করণ ইসলামিক ফোরাম অব ইউরোপের সেক্রেটারি ছিলাম। তখন আতিকুর রহমান জিলু ভাই আর আমরা একসাথে কাজ করতাম। সম্ভবত জিলু ভাই আজকের এই আয়োজনে আছেন এবং তিনিও সেই স্মৃতিগুলো রোমন্থন করবেন। আমরা তাকে নিয়ে দাওয়াহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। আমি বয়সে তাঁর চেয়ে ১৫ বছরের ছোট। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে, আমি তাঁর তুলনায় বয়সে ছোট, জ্ঞানের বিবেচনায় অনগ্রসর এবং যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতায় অনেকটা পিছিয়ে থাকার পরও সংগঠনের সেক্রেটারি হিসেবে তিনি আমাকে অনেক বেশি সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমরাও বিষয়টি শিখতে পারি। একজন মানুষ আপনার থেকে জ্ঞানে, বয়সে বা অভিজ্ঞতায় পিছিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সংগঠনে তিনি যদি দায়িত্বশীল কোনো অবস্থানে থাকেন তাহলে তাকে সেই সম্মানটুকু দিতে হবে।

তাঁর আরেকটি বড়ো গুণ ছিল তিনি যেকোনো কাজ পরামর্শ করে করতেন। একটি ঘটনার কথা আমার আজও মনে পড়ে। তাকে একটি সংবাদ সম্মেলনে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিলেন এই সংবাদ সম্মেলনে যাওয়া তাঁর জন্য ইতিবাচক হবে। পরবর্তীতে তিনি আমাদের ডেকে বলেছিলেন যে সংবাদ সম্মেলনে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি সঠিক হয়নি। কিন্তু বিষয়টি বোঝার পরও তিনি সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন এবং আনুগত্য করেছিলেন।

তাঁর তাজদিদ ও রেখে যাওয়া অনুসরণীয় সব বৈশিষ্ট্যসমূহ

রাসুল (সা.) এর হাদিস অনুযায়ী মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, প্রতি এক শতকে একজন করে মুজাদ্দিদ জন্ম নেয়। এই মুজাদ্দিদেরা ইসলামের বিভিন্ন ধারা ও বিলুপ্তপ্রায় সুন্নাহ'র পুনর্জাগরণে ভূমিকা রাখেন। আল্লামা সাঈদীর ক্ষেত্রেও এমনটা ভাবার সুযোগ আছে। বিশেষ করে কুরআনের তাফসীর ও রাজনীতিতে তার যে ঐতিহাসিক ভূমিকা তার আলোকে এমনটা দাবি করার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

তিনি তাঁর তাফসীরের মাধ্যমে কুরআনের প্রকৃত মর্মার্থ এবং দিক নির্দেশনাগুলো তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি বলিষ্ঠভাবে ঈমান ধারণ এবং জালিমের নিপীড়নের মুখেও সাহসের সাথে সত্য কথা বলার জন্য সবাইকে তাগিদ দিয়েছেন। সত্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর দুঃসাহসী ভূমিকা এবং জালিমের সমঝোতা প্রস্তাব প্রত্যাখানের দৃষ্টান্তগুলোও মুজাদ্দিদ হিসেবে তাঁর অবস্থান চূড়ান্ত করে। তিনি সারাজীবন সমাজে ন্যায়বিচার, ইনসাফ, সত্য এবং ধর্মীয় সংহতি বজায় রাখার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। প্রতিকূল অবস্থায় কীভাবে ঈমান লালন করা যায়, দ্বীনি অনুশীলন অব্যাহত রাখা যায়, আল্লামা সাঈদী বারবার তাঁর জীবনে সেই দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

আল্লামা সাঈদী ছিলেন শিরক ও বিদআতের ঘোর বিরোধী একজন মানুষ। মাজারপূজার বিরুদ্ধে বরাবরই সরব ছিলেন তিনি। তাঁর সত্যনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ভাষণের মধ্যদিয়ে তিনি সমাজ থেকে এসব অনাচার দূর করার প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর ওয়াজের মাধ্যমে তিনি সমাজ থেকে শুধুমাত্র শিরক ও বিদআত দূরীকরণেই চেষ্টা করেননি বরং একইসাথে অসংখ্য অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণেও তিনি ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর তাফসীরের আলোকছটায় মুগ্ধ হয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। এমনকি জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়ার পরও যাদের ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানের কমতি আছে তাদেরকেও ইসলামী শিক্ষা প্রদানে তিনি অবদান রেখেছেন।

আল্লামা সাঈদী শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুশীলনেই শুদ্ধতা নিয়ে আসার চেষ্টা করেননি বরং একইসাথে বিভাজন কমানোরও উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি ইসলামকে ইতিবাচক ও জনকল্যাণমূলক স্বার্থে উপস্থাপন করে মানুষের মাঝে সংহতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর অবদানের কারণেই বহু মানুষ ইসলামের প্রকৃত অনুশীলনে এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অর্জনে মনোযোগী হয়েছেন। আল্লামা সাঈদী ব্যতিক্রম এক মানুষ। বহু বছরেও এমন মানুষ কোনো ভূখন্ডে জন্মায় না। আল্লামা সাঈদী (রহ.) এর জীবন ও কর্ম নিয়ে শুধু কয়েক ঘণ্টার আলোচনা কিংবা কিছু লেখালেখি করাই যথেষ্ট নয়। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ও অবদান নিয়ে অনেকগুলো গবেষণা করা বা একাডেমিক রিসার্চ করা সময়ের দাবি। বিশেষ করে, কুরআনের তাফসীর, ইসলামের ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সমাজ সংস্কারে আল্লামা সাঈদীর ভূমিকা নিয়ে একাধিক পিএইচডি গবেষণা, জীবনী পর্যালোচনা এবং নির্মোহ বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের গবেষণা ও বিশ্লেষণ শুধুমাত্র তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণেই ভূমিকা রাখবে না বরং পরবর্তী প্রজন্মকে আল্লামার বর্ণাঢ্য জীবন ও নানামুখী কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও জানার ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কারাবরণ

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত সংক্রান্ত মামলায় ২০১০ সালে আল্লামা সাঈদীকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের সময় কথিত মানবতা বিরোধী অপরাধ করার দায়ে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিতর্কিত এক রায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে আপীল বিভাগ তার সাজা হ্রাস করে তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করেন। অসংখ্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সেই সময়ে অভিযোগ করে বলেছিল যে, আল্লামার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাঁর বিচারিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা না থাকায় সমালোচনা করেছিল। এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গ এবং জাতিসংঘ তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়া অন্যায্য রায়ের নিন্দা জানায়।

আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত যত মিথ্যা অভিযোগ

মামলা চলাকালীন সময়ে দেখা যায় রাষ্ট্রপক্ষ কোনো এক দেলোয়ার শিকদারের বিচার করছে। তারা দাবি করছেন দেলোয়ার শিকদার ও দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী আসলে একই ব্যক্তি। আল্লামা সাঈদীর আইনজীবীরা অবশ্য আদালতে সফলভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে দেলোয়ার শিকদার ও দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী সম্পূর্ণ ভিন্ন দুজন মানুষ। মূলত আল্লামা সাঈদীর জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তার বিরুদ্ধে মামলা করে এবং মামলায় রাজনৈতিক উপকরণ সংযোজন করে মূলত তার সুনাম ও ভাবমূর্তি নষ্ট করে। রাজনৈতিক অভিসন্ধি পূরণের জন্য সরকার যেভাবে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে তা প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

কারাঅন্তরীণ থাকা অবস্থায় আল্লামা সাঈদী তাঁর বড়ো সন্তান রাফীক বিন সাঈদীকে হারান। ছেলের জানাজায় অংশ নেওয়ার জন্য তাকে সীমিত সময়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। জানাজায় উপস্থিত লক্ষ্য জনতার সামনে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "আল্লাহর ইজ্জতের কসম! ১৯৭১ সালের কোনো কাঁদামাটি আমার গায়ে লাগে নাই, লাগে নাই, লাগে নাই। আমি রাজাকার নই। আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর একটিও সত্য নয়।"

আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে জনৈক বিশাবালীকে হত্যার একটি অভিযোগ আনা হয়। ভিকটিম বিশাবালীর ভাই সুখরঞ্জন বালীর নাম সাক্ষী হিসেবে রাষ্ট্রপক্ষ জমা দেয়। তারা সুখরঞ্জন বালীকে চাপ দেয় যাতে সে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সুখরঞ্জন বালী মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজি হয়নি। বরং তিনি মাওলানা সাঈদীর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি চান। অথচ এজন্য তাকে চরম নির্মমতার শিকার হতে হয়। ট্রাইবুনালের সামনে থেকেই তাকে অপহরণ করে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে জানা যায়, সুখরঞ্জন বালী প্রতিবেশি দেশ ভারতের একটি কারাগারে বন্দী রয়েছেন। এই ঘটনা আল্লামা সাঈদীর মামলার অসাড়তাকে আরো একবার সবার সামনে নিয়ে আসে।

এই সুখরঞ্জন বালী পরবর্তীতে আল্লামা সাঈদীর জানাজাস্থলে আগমন করেন। সেদিন অসংখ্য মিডিয়ার সামনে তিনি আবারও জোর দিয়ে বলেন, আল্লামা সাঈদী তাঁর ভাইয়ের হত্যায় কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নন। শুধু তাই নয়, সাঈদী ৭১ সালে কোনো ধরনের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড বা অপরাধের সাথেও যুক্ত ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধের একজন ডেপুটি সেক্টর কমান্ডারও একটি বিবৃতি দিয়ে নিশ্চিত করেন, মাওলানা সাঈদী রাজাকার বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিলেন না। এভাবেই মাওলানা সাঈদীর নিষ্পাপ অবস্থান জাতির সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়।

ইসলামী আদর্শের প্রতি তার বলিষ্ঠ অবস্থান

আল্লামা সাঈদী ছিলেন ইসলামী আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ। শত প্রতিকূলতার মুখেও তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও ন্যায়ের পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। কারা অন্তরীণ থাকা অবস্থায় তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যদি তিনি জামায়াতে ইসলামী থেকে দূরে সরে যান তাহলে তাকে কারামুক্তি দেওয়া হবে। অথচ তিনি সেই প্রস্তাব দ্ব্যর্থহীনভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এই প্রস্তাব শুধু প্রত্যাখানই করেননি বরং এই প্রস্তাবটিকে রীতিমতো অবমাননা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি আপোষ ও বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে বরং তাঁর সততাপূর্ণ অবস্থান ধরে রাখতেই আগ্রহী ছিলেন। এই ঘটনার মাধ্যমেও তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আদর্শের প্রতি বলিষ্ঠ অবস্থান প্রমাণিত হয়।

ইন্তেকাল

১৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখে কারাগারে থাকা অবস্থায় বুকে ব্যাথা অনুভব করায় তাকে প্রথম কাশিমপুর কারাগার থেকে গাজীপুরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে নিয়ে আসা হয় ঢাকার পিজি হাসপাতালে। পরের দিন অর্থাৎ ১৪ আগষ্ট রাত ৮:৪০ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার কথিত অসুস্থতা এবং পরবর্তী চিকিৎসা প্রক্রিয়া নিয়ে নানা ধরনের ধোঁয়াশা ও প্রশ্ন উঠেছে যা প্রমাণ করে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে সঠিক চিকিৎসা দেননি বরং অবহেলা করেছেন।

বিভিন্ন মহলের শোক

আল্লামা সাঈদীর মৃত্যুতে অগণিত মানুষের পাশাপাশি দেশে ও বিদেশের অসংখ্য স্কলার শোকাহত হয়েছেন। শোক প্রকাশ করেছেন। ভারতের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা সালমান নদভী তার ফেসবুক পেইজে আল্লামার ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করেছেন। আরবি ভাষায় লেখা ঐ স্ট্যাটাসে তিনি আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালে দুঃখ প্রকাশ করেন। ইসলামের একজন দাঈ হিসেবে মাওলানা সাঈদীর মেধা ও মননের প্রশংসাও করেন তিনি। মাওলানা নদভী আরো বলেন, সাঈদীকে মিথ্যা অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০১০ সাল থেকেই অন্তরীণ থাকা আল্লামা সাঈদীর রুহের মাগফিরাত কামনায় তিনি দুআ করেন এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের জন্য ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রত্যাশা করে দুআ করেন।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়েখ আহমাদুল্লাহ তার শোকবাণীতে কুরআনের প্রচারে আল্লামা সাঈদীর কথা স্মরণ করেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও তিনি স্মরণ করেন। তিনি আল্লামার যাবতীয় নেক আমল কবুল করার জন্য এবং জান্নাত নসীব করার জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করেন।

ঢাকাস্থ শায়েখ জাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রধান মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি সাঈদীকে একজন বিনয়ী বক্তা হিসেবে মূল্যায়ন করেন। মদিনায় তাঁর সাথে হওয়া একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের কথাও তিনি স্মরণ করেন। তিনি দুআ করেন যাতে আল্লাহ তাআলা মাওলানা সাঈদীর নেক আমলগুলো কবুল করে নেন এবং তাঁর পরিবার ও হিতাকাঙ্খীদের ওপর রহম করেন।

প্রখ্যাত কলামিস্ট ও গবেষক ড. আফম খালিদ হোসাইন দুআ করেন যাতে আল্লাহ তাআলা মাওলানা সাঈদীর ভুল-ত্রুটি সব ক্ষমা করে দেন এবং তাকে জান্নাত নসীব করেন।

বাংলার খতিব নামে পরিচিত আল্লামা জুনায়েদ আল হাবিব আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন। আল্লামাকে আন্তর্জাতিক মানের একজন স্কলার হিসেবে উল্লেখ করে জুনায়েদ আল হাবিব বলেন মাওলানা সাঈদী তাওহীদি জনতার হৃদয়ের স্পন্দন। তাঁর বক্তব্য অসংখ্য মানুষকে আলোড়িত করেছে। তিনি ইসলাম প্রচারে মাওলানা সাঈদীর অবদানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপের অন্যতম ফকীহ, শায়খ ড. হাইছাম আল হাদ্দাস প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোক বার্তায় তিনি বলেন, "আল্লামা সাঈদীর মৃত্যু উম্মতের জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলিমদের জন্য বড়ো ধরনের শূন্যতা তৈরি করেছে। আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহম করুন। আখেরাতে উত্তম মর্যাদা দান করুন। তিনি মানুষকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। হেদায়েতের পথে ধাবিত করেছেন। জুলুম, অবিচার ও দীর্ঘ কারাবাস সত্ত্বেও তিনি সবর করেছেন। আমাদের আরো অনেক সালাফের মতোই কারাবন্দী অবস্থায় ঈমানের ওপর অবিচল থেকেই তিনি বিদায় নিয়েছেন।"

জানাজায় লাখো মানুষের উপস্থিতি

সরকার আল্লামা সাঈদীর জানাজাকে বাঁধা দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছে। একজন মানুষ মারা যাওয়ার পর তাঁর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর না করে ভোর রাতে পিরোজপুর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। তাঁর ভক্তরাসহ দেশের আম জনতার প্রত্যাশা ছিল ঢাকাতেই তাঁর প্রথম জানাযা হবে যাতে সারা দেশের মানুষ অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় কিন্তু সরকার ঢাকায় জানাযার অনুমতি দেয়নি। এমনকি হাসপাতাল কম্পাউন্ডের ভেতরে ফজরের নামাজরত মুসল্লীদের উপর সাউন্ডগ্রেনেডসহ কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ করে তাঁর কফিন পিরোজপুরের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। এত কিছুর পরও পিরোজপুরে আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশনের খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হওয়া জানাজায় লাখ লাখ মানুষ অংশ নেয়। তারা সেখানে তাদের প্রিয় মুফাসসিরে কুরআনের জন্য চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন করে। চোখের জলে তারা তাদের আল্লামাকে বিদায় দেয়। দেশে ও বিদেশে অসংখ্য স্থানে আল্লামা সাঈদীর গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে অজস্র মানুষ অংশগ্রহণ করে।

তার জীবন: আমাদের জন্য শিক্ষা

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং মুজাদ্দিদ আল ফেসানীর মতো আল্লামা সাঈদীও ইসলামী নীতিমালা ও শরীয়াতের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। যে সকল মানুষেরা জুলুম ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন, আল্লামার জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদেরও উচিত ধর্মীয় মূল্যবোধ, অনুশীলন রক্ষায় ও দ্বীনের পুনর্জাগরণে নিরন্তর ভূমিকা পালন করে যাওয়া। ঈমানের মজবুতি ও ধারাবাহিকতা রক্ষায় এর কোনো বিকল্প নেই।

উপসংহার:

আল্লামা সাঈদীর মৃত্যু অসংখ্য সৃজনশীল প্রাণ বিশেষ করে অসংখ্য কবি ও শিল্পীকে ভারাক্রান্ত করেছে। তারা তাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, গান গেয়েছেন, আন্তরিকভাবে দুআ করেছেন। দলমত নির্বিশেষে মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসার কারণে অগণিত মানুষের স্মৃতিতে তিনি যুগ যুগ বেঁচে থাকবেন। সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতা তাঁর ব্যাপারে মানুষের ধারণাকে উচ্চকিত করেছে এবং করতে থাকবে। এ কারণেই দলমত, বর্ণের ঊর্ধ্বে ওঠে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ তাঁর জন্য দুআ করছে, অশ্রুজলে তাকে স্মরণ করছে।

আল্লামা সাঈদীর জীবন ও কর্ম আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ও অবদান নিয়ে নির্মোগ গবেষণা ও পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। আর তাঁর প্রতিষ্ঠিত আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন আগামী দিনগুলোতে যোগ্য আলেম ও কুরআনের তাফসীরকারক তৈরিতে ভূমিকা রাখবে সেই প্রত্যাশা অনেকরই। আল্লামা সাঈদীর কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষায় এবং দ্বীনি ইলম অর্জন ও প্রচারের সহায়তায় এই ফাউন্ডেশন 'ইসলামী স্কলারশিপ' চালু করতে পারে। যারা আল্লামার ভক্ত রয়েছেন তারা তাঁর লেখা বইগুলো পড়া এবং তাঁর গড়া প্রতিষ্ঠানসমূহকেও সহযোগিতা করে যেতে পারেন। আল্লামার লেখনি ও তাঁর কর্মকাণ্ড অনুসরণ করার মাধ্যমে এই ভক্তরাই তার শিক্ষা ও বার্তার প্রচারে দায়িত্ব নিতে পারেন।

নিঃসন্দেহে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ছিলেন গুটিকয়েক মহান মানুষের মধ্যে একজন যারা সমাজের সামষ্টিক সচেতনতা ও সংশোধন কার্যক্রমগুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সার্থক ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। তিনি প্রতিটি ঘরকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করার তাগিদ দিয়ে গেছেন। কুরআনের পাখি নামে পরিচিত আল্লামাকে আরব ও মুসলিম বিশ্বের পুরোধা ব্যক্তিগণ কুরআনের খাদেম হিসেবেও অভিহিত করেছেন। তিনি বাংলাদেশের মুফাসসিরদের মধ্যে কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় দেশে ও বিদেশের নানা অঞ্চলে তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে কালজয়ী বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে অগণিত মানুষের হৃদয়ে তিনি আসন গড়ে নিয়েছেন। আল্লাহ পাক তার নেক আমল, দ্বীন ইসলামের জন্য যাবতীয় অবদান ও কুরবানি কবুল করে নিন। আমিন।

লেখক: কেন্দ্রীয় সভাপতি: মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

কাশিমপুরে যাওয়ার অপেক্ষায় আর থাকতে হবে না আমাদের !

মাসুদ সাঈদী

আজ এক এক করে ৪৪টি দিন পার হয়ে গেল আব্বাকে হারানোর। আমার মাথার তাজ, আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাকে যে আমরা চিরতরে হারিয়ে ফেলেছি। এখনো মনে হয় এক ধরনের ঘোরের মধ্যে আছি। আব্বার বিদায়ের শেষ সময়গুলো শুধু স্বপ্নের মত মনে হয়। মনে হয় একটা দুঃস্বপ্ন দেখে মাত্রই জেগে উঠলাম।

মাঝে মাঝে চিৎকার করে ডুকরে কেঁদে উঠি। বুকভরা যন্ত্রণাগুলো অশ্রু হয়ে অনবরত ঝরতে থাকে চোখের কোণ বেয়ে। বুকের জমানো ব্যথাটা একটু হালকা হয়। কিছু সময় পর আবারও বুকটা ভারী হয়ে যায়, মনে হয় যেন বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে আমার। আব্বার হাজারো, লাখো স্মৃতি প্রতিনিয়তই এসে ভিড় জমাচ্ছে মনের কোণে। আর অস্থির হয়ে আব্বাকে খুঁজতে থাকি।

মনে হয় আব্বাকে একটু জড়িয়ে ধরতে পারতাম! তাঁর বুকে মাথা রেখে বাবা বাবা বলে চিৎকার করে মনের যত ব্যাথা আছে একটু দূর করতে পারতাম! কিন্তু সে সুযোগ যে আমাদের আর নেই। আমরা যে আব্বার স্নেহ, ভালোবাসা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। আব্বা যে আমাদেরকে ইয়াতিম করে রেখে তাঁর প্রিয় মুনিবের ডাকে সাড়া দিয়ে পরকালীন জীবনের বাসিন্দা হয়ে গেছেন! নামাজের বিছানায়, সেজদায় শুধু আব্বা আব্বা বলে চিৎকার করে পরম করুনাময় আমার মহান রবের কাছে এই দোয়াই করছি, "রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগিরা"

১৩ আগস্ট ২০২৩, মঙ্গলবার। সালাতুল আসরের শেষ রাকাতে শেষ বৈঠকে বসা। হঠাৎ করে ফোনে রিং বেজে উঠল। সালাম ফিরিয়ে কিছু দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে কলটা শেষ হয়ে গেল। একটু পরেই কলটা আবার আসে। কল রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে একজন সালাম দিয়ে বলতে থাকে হুজুরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর কী হয়েছে, কেন হাসপাতাল নেওয়া হচ্ছে, কখন নিয়ে গেছে তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানাতে পারলেন না। তিনি সেখানকার একজন স্থানীয়। কল কেটে মনে মনে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কারা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা শুরু করলাম। কিন্তু তাদের কেউই ঐ সময়ে আমার ফোন রিসিভ করেননি। এই সময়ে আমার অস্থিরতা আর ব্যাকুলতা কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে এই ব্যাখ্যা দেওয়ার ভাষা এই মুহূর্তে আমার জানা নেই। মেঝো ভাই দেশের বাহিরে। ছোট ভাই নাসিমকে জানিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে দৌঁড়াতে শুরু করলাম। আর অস্থির হয়ে ফোনে কারা কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন জায়গায় অনুমান নির্ভর কল দিতে লাগলাম শুধু এইটুকু তথ্য জানার জন্য যে, আব্বাকে তাঁরা কোথায় নিয়ে আসছে, কিন্তু কোনভাবেই তা জানতে পারলাম না। এমনকি কারা কর্তৃপক্ষও আমাকে বিষয়টি জানানোর কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো না।

আমি ভাবতে লাগলাম তাঁরা আব্বাকে কোথা নিয়ে যেতে পারে! আমি অনুমান করলাম- যেহেতু আব্বা হার্টের পেশেন্ট তাই তাঁরা মোহাম্মদপুরের হৃদরোগ ইন্সটিটিউট, মিরপুরের ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এবং শাহবাগের বিএসএমএমইউ (সাবেক পিজি) হাসপাতাল- এই ৩টি হাসপাতালের যে কোন একটিতে নিয়ে যেতে পারে। আমি সংগঠনকে পুরো বিষয়টি অবহিত করলাম। ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এবং বিএসএমএমইউ হাসপাতালে আমাদের স্বজন ও সাংগঠনিক নেতৃবৃন্দ চলে গেলেন আর আমি চলে গেলাম মোহাম্মাদপুরের হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে। ঘড়ির কাটায় তখন রাত ৯:১০ মিনিট। তখনো কোন কনফার্ম নিউজ আমার কাছে নেই যে, আব্বাকে তাঁরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!

অপেক্ষার প্রহর যেন আর শেষই হচ্ছে না। রাত ১০.০০ টারও কিছু সময় পর আমি নিশ্চিত হলাম আব্বাকে পিজি হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে। খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে মোহাম্মদপুর থেকে আমি

হাজির হয়ে গেলাম পিজিতে। এরই মধ্যে আমার ছোট ভাই নাসিম সাঈদীসহ নিকট আত্মীয়-স্বজন ও সংগঠনের ভাইয়েরা এসে হাজির হল হাসপাতালে। ততক্ষণে ঢাকার চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়েছে আল্লামা সাঈদী অসুস্থ এবং তাকে পিজিতে নিয়ে আসা হচ্ছে।

আব্বাকে নিয়ে আসার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই মানুষের ভিড় জমতে থাকে পিজি হাসপাতালের সামনে। সংগঠন, মিডিয়াকর্মী, ভক্ত অনুরাগী ছাড়াও পিজির আশেপাশের এলাকার ব্যাপক মানুষ এসে জড়ো হতে থাকে হাসপাতালের সামনে। আব্বার অপেক্ষায় সবার

দৃষ্টি পিজির মূল গেটের দিকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধ, প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে হাজারো মানুষ অপেক্ষা করতে থাকে আব্বাকে এক নজর দেখার জন্য। অবশেষে রাত ১১:০০ টার দিকে হঠাৎ এম্বুলেন্সের আওয়াজ ভেসে আসল পিজির মূল গেটের দিক থেকে। সাথে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিশাল বহর। আব্বাকে বহন করা এম্বুলেন্স ঢুকল পিজির গেট দিয়ে। সবার চোখ সেই এম্বুলেন্সের দিকে। এম্বুলেন্সের গ্লাসের ভেতর থেকেও যদি একবার তাদের প্রিয় আল্লামার অবস্থা বুঝা যায়– এই আশায়। সবার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা! কেমন আছেন আমাদের হুজুর? এম্বুলেন্স সোজা পিজি হাসপাতালের ডি ব্লকের ইমার্জেন্সির সামনে গিয়ে থামল। সবাই দৌড়ে সেখানে হাজির হওয়ার চেষ্টা করলেন। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আটকে দিলেন সবাইকে। এক পলক দেখার জন্য দূর থেকে সবার দৃষ্টি এম্বুলেন্সের দরজার দিকে। সবার আশা তিনি বের হবেন, আল্লামাকে এক নজর দেখে সবাই চোখ জুড়াবেন, পিপাসার্তরা হৃদয়ের হাহাকার মিটাবেন, তাঁর চেয়েও বেশী উৎকণ্ঠার বিষয় জনতার হৃদয়ে– কী অবস্থায় দেখবেন তাঁরা তাদের প্রিয় আল্লামাকে!

গাড়ির দরজা খুলল। দু'জন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যের কাঁধে ভর করে আব্বা নামলেন। জনতার আল্লামা! মেহেদি মাখানো লাল দাড়িতে আব্বার চেহারাটা খুব মায়াবী লাগছিল। দু'জনের কাঁধে ভর করে নেমেই স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতে তিনি হাত নেড়ে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম'। সাথে তাঁর সেই ভুবন কাড়া হাসি। মুহূর্তের মধ্যে একটা শোরগোল পড়ে গেল। কেউ নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলেন না। সবার চোখ ভিজে গেল। কয়েক

শব্দের কুশলও বিনিময় করলেন আব্বা সবার সাথে। তখনও বুঝাই গেল না তাঁর হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। হুইল চেয়ারে বসিয়ে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হল ইমার্জেন্সিতে। অল্প কয়েকজনকে ঢুকতে দিয়ে ডি-ব্লকের মূল গেট বন্ধ করে দেওয়া হল। আমি পাগলের মত পেছন পেছন ছুটলাম ইমার্জেন্সির দিকে। ইমার্জেন্সিতে প্রাথমিক চেকআপ সেরেই দ্রুত সিসিইউতে স্থানান্তর করে দেওয়া হল আব্বাকে। এ সকল প্রক্রিয়ায় সবমিলিয়ে সময় লেগেছে ৩০ থেকে ৪০ মিনিটের মত। এর ফাঁকে আব্বার সাথে কোনরকম আলাপ কিংবা খোঁজ খবর নেওয়ার কোনো সুযোগই তারা আমাকে দিল না!

আব্বাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে লিফট, ইমার্জেন্সি এবং সিসিইউ এই তিন জায়গায় নেওয়ার পথে যতদূর সুযোগ পেয়েছি তাকিয়ে শুধু নয়ন জুড়িয়েছি। আমার দিকে তাকিয়ে আব্বা হাসিমুখে ইশারা করে বুঝিয়েছিলেন, তিনিও ভালো আছেন। আমাদের কাউকে আব্বার একটু কাছেও ভিড়তে দেওয়া হয়নি। ছেলে হয়েও বাবার প্রতি আমাদের কোন অধিকারই যেন ছিল না সেদিন। একটু স্পর্শ করার কিংবা একটু কুশলাদি জিজ্ঞেস করার!

পিজির চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নিলো প্রাথমিক চেকআপের পর আব্বাকে সিসিইউতে স্থানান্তর করবে। আমরা রুমের সামনে অপেক্ষমান। হঠাৎ রুমের দরজা খুলে গেল। আব্বা হুইল চেয়ারে ঠিক দরজার দিকে মুখ করেই বসা ছিলেন। সামনেই আমরা কয়েকজন দাঁড়ানো। দরজা খোলার সাথে সাথে আব্বা আমাকে দেখে এক অমায়িক হাসি দিলেন। আমাকে দেখে আব্বা কতটা তৃপ্ত হলেন তাঁর হাসি দেখেই আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম। আব্বা ভরসা পেলেন তাঁর সন্তান তাঁর কাছেই আছে! আমি হুইল চেয়ারে বসা আব্বার ডান হাতটা শক্ত করে ধরলাম। আব্বা আমার থেকেও বেশি শক্ত করে আমার হাতটা ধরলেন। আমার দু'চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়লো। আহ! এই তো আমার মহান পিতা। আমার ভালোবাসা। আমি আমার সমস্ত আবেগ, ভালবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে আব্বার হাতটা ধরে রাখলাম। কে জানতো– আব্বার পবিত্র হাতটা এটাই আমার শেষবারের মতো ধরা!

আব্বাকে ইমারজেন্সি থেকে বের করে দোতলায় সিসিইউর দিকে নিয়ে যাওয়া শুরু করলো। হুইল চেয়ারে বসা আব্বার হাত ধরে

আমি আব্বার সাথেই লিফটে উঠতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমাকে লিফটে ঢুকতেই দিল না! আব্বার পবিত্র হাতটা আমি ছেড়ে দিলাম। লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলাম। লিফটের বরাবর সামনেই সিসিইউ। লিফট থেকে নামিয়ে আব্বাকে সিসিইউর দিকে নিয়ে যাচ্ছ। আব্বা অপলক আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমি দৌঁড়ে গিয়ে আব্বার হাতে লম্বা করে একটা চুমু দিলাম। আব্বা গভীর মমতায় আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

আমাকে এক প্রকার ঠেলেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আব্বার কাছ থেকে। আব্বার কাছে আর যেতে দিচ্ছে না আমাকে! আমি দূর থেকে 'আব্বা আব্বা 'বলে চিৎকার করে শুধু আব্বার চোখে চোখে থাকার চেষ্টা করছি। সিসিইউতে আব্বাকে ঢুকিয়ে ফেলা হচ্ছে। আব্বা ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। দূর থেকে চিৎকার দিয়ে আমি বললাম, 'আব্বা আমরা সবাই আছি এখানে। আমরা আছি আব্বা। আপনাকে মহান আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলাম'। আব্বা পেছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তখনো অপলক তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। সেই তাকানোটাই যে আব্বার বিদায়ী চাহনি ছিল, আব্বার অসীম দৃঢ়তা আর হাসিমুখ দেখে আমি সেটা অনুমানই করতে পারিনি।

আব্বাকে সিসিইউর ভেতরে নেওয়া হল। দরজা মিলিয়ে যাচ্ছে। আব্বা তখনো হাসিমুখে ঘাড় বাঁকিয়ে আমাদের দিকেই দৃষ্টি নিবন্ধ করে রেখেছিলেন। আমরা বিলকুল বুঝতেই পারিনি যে আব্বা তাঁর সন্তান, স্বজনদের শেষবারের মত মন ভরে দেখে নিচ্ছেন।

সিসিইউ রুমের দরজা মিলে গেল। আব্বা আমাদের চোখের অন্তরালে চলে গেলেন। আব্বা দুনিয়ার অন্তরালের যাওয়ার আগ মুহূর্তে এভাবেই আমাদের চোখের অন্তরালে চলে গেলেন। এই যে যাওয়া– এটাই যে শেষ যাওয়া, এটাই যে শেষ দেখা, এটা কেন আমি সেদিন একটুও বুঝতে পারলাম না? আব্বাকে দেখে সেদিন এমন কিছু কেন আমি অনুমান করতে পারলাম না? আব্বা তাঁর প্রিয় মুনিবের ডাকে সাড়া দেবেন, আব্বা তাঁর এই মায়ার বাঁধনকে চিরতরে ছিন্ন করে তাঁর মুনিবের সাক্ষাতে যাত্রা শুরু করবেন, এটা যদি সেদিন ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারতাম, তাহলে নিজের হায়াতের বিনিময়ে পরম দয়ালু আমার মহান রবের কাছে আব্বার হায়াত ভিক্ষা চাইতাম!

আব্বা.....! সেই যে আপনার শেষ চাহনি, ঘাড় বাঁকিয়ে শেষ তাকানো, জ্বল জ্বল করা মায়াবী চেহারা, আমাকে যে এক সেকেন্ডের জন্যও স্থির থাকতে দিচ্ছে না। আপনি কেন তাকিয়ে ছিলেন এভাবে আমার দিকে? আমি যে এখন এক যন্ত্রণাকাতর চাতক পাখি হয়ে আছি আব্বা। আমার অস্থির বেদনাবিধুর মন-মস্তিষ্ককে কোনকিছু দিয়েই বুঝিয়ে রাখতে পারছি না আব্বা....!

আব্বা....! আব্বা....! আহ্ ..... আব্বা!

আমি আমার মুনিবের কাছে উত্তম ধৈর্য কামনা করছি।

সিসিইউতে নিয়ে তারা আব্বাকে আমাদের চোখের অন্তরাল করে ফেলল। এরপর থেকে শুরু হল আব্বাকে এক নজর দেখা ও তাঁর সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ। আব্বা সিসিইউতে কেমন আছেন, কেমন কাটাচ্ছেন, চিকিৎসা কেমন চলছে, কি কষ্ট নিয়ে আব্বা এখানে এলেন, আসলেই কী বুকে কোন ব্যাথা ছিলো কি না, শারীরিক অবস্থা কেমন যাচ্ছে আব্বার- তা একটিবার স্বচক্ষে দেখার জন্য কত অনুরোধ, কত আবদার, কত অনুনয় যে করেছি তাদের কাছে- সে কেবল আমার আল্লাহ স্বয়ং স্বাক্ষী। হাসপাতালের সামনে সিঁড়িতে, ফ্লোরে রাত দিন এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি– কখন আব্বাকে এক নজর দেখার ডাক পাব। চিকিৎসাধীন বাবাকে মৃত্যুর আগে একটিবারের জন্যও তাঁর সন্তানদের দেখার সুযোগ দেওয়া হয় না; পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম দ্বিতীয় কোন ঘটনা আছে কিনা আমার জানা নেই। নিশ্চয়ই ইতিহাসের কালো পাতায় আওয়ামী জালিমদের এই বর্বরতা জঘন্য ইতিহাস হিসেবেই লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

তাদের কাছে যতবারই অনুরোধ করেছি তারা এই কর্তৃপক্ষ সেই কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগবে বলে বারবারই আমাকে পাশ কাটিয়ে গেছে। তারা আব্বার সাথে আমার দেখা করিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন বলে এক মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে রেখেছিলেন আমাকে। আমি চাতক পাখির মত কখনো ফ্লোরে, কখনো সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করেছি কখন ডাক আসবে, কখন আব্বাকে এক নজর দেখে আমার হৃদয়ের হাহাকার মিটাবো!

১৪ আগস্ট ২০২৩, সোমবার। মাগরিবের অনেক আগে থেকেই আব্বার দ্বিতীয়বার হার্ট এ্যাটাকের খবর ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসে। পাগলের মত ছুটোছুটি করেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো খবর বের করতে পারলাম না। দায়িত্বরত প্রশাসনের লোকজনের কাছে গিয়ে বিষয়টির সত্যতা জানতে চাইলে তারা জানালেন যে, তিনি একেবারেই নাকি স্বাভাবিক আছেন। তারা দেখে এসেই নাকি আমাদের জানাচ্ছেন। কিন্তু তাদের চোখে চোখ রেখে আমি আশ্বস্ত হতে পারলাম না। এরই মধ্যে হাসপাতালের পরিবেশ ভারি হতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পরপরই সরকার এবং পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের গাড়ি হাসপাতাল চত্বরে আসতে শুরু করলো। হাসপাতালের চারিদিকে বিপুল পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হলো। হাসপাতালের ডাক্তার আর প্রশাসনের লোকদের ছুটোছুটি দেখতে পেলাম।

আব্বাকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকে নিয়ে আব্বার দুনিয়ার সফর শেষ করা পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিংবা কর্তব্যরত চিকিৎসকগণ আব্বার চিকিৎসার বিষয়ে আমার/ আমাদের সঙ্গে একটিবারের জন্যও কোন আলোচনা করেনি, আব্বার পুরনো রোগ কিংবা চিকিৎসা সম্পর্কেও আমাদের কাছে কিছু জানতে চায়নি, তারা আব্বার কী চিকিৎসা করছেন সে সম্পর্কেও আমাদেরকে পরিষ্কার করে কিছু বলেননি, তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আব্বার শারিরীক অবস্থার আপডেটও আমাদেরকে জানায়নি, সন্ধ্যার পর থেকে আব্বার শারিরীক অবস্থার অবনতি হচ্ছিলো– সেই খবরটিও আমাদেরকে জানায়নি, দ্বিতীয়বার আবারো আব্বার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বা কার্ডিয়াক এরেস্ট হয়েছে– সেটিও তারা

অফিসিয়ালি আমাদেরকে কিছু জানায়নি, শেষ পর্যন্ত আব্বাকে তারা লাইফ সাপোর্টি নিয়েছে– এই বিষয়েও আমাকে/আমাদেরকে অবহিত করেনি, এমনকি আমাদের কাছ থেকে কোন লিখিত বা মৌখিক অনুমতিও নেয়নি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আব্বার গোটা চিকিৎসা প্রক্রিয়াটাই ছিলো রহস্যজনক এবং সন্দেহজনক। কেন তারা আব্বার চিকিৎসা সম্পর্কে আমাদেরকে অন্ধকারে রেখেছে বা কেনই বা তারা আমাদেরকে কোনকিছু জানতেই দেয়নি– সেইসবের জবাব নিশ্চয়ই স্বৈরাচার হাসিনা ও আওয়ামীলীগকে এই জাতির কাছে একদিন দিতেই হবে।

হাজারো ভাবনা, অস্থিরতা আর ছুটোছুটির মধ্যেই এশার আযান হয়ে গেল। সকল অস্থিরতা এক দিকে রেখে মনের প্রশান্তি আর আব্বার দ্রুত সুস্থতা ও নেক হায়াত কামনায় মালিকের দরবারে সেজদা দেয়ার জন্য মসজিদের দিকে ছুটলাম আমি। ইমাম সাহেব শাহাদাতের আয়াত ধরলেন। মনের অজান্তেই অনর্গল চোখ বেয়ে পানি গড়াতে লাগল নামাজের ভেতরেই। মনে হচ্ছিল ভেতরটা ধুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। নামাজের ভেতরেই চিৎকার দিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু চোখের পানি তো আর ধরে রাখতে পারছিলাম না। শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে চোখের পানিতে নামাজ শেষ করলাম। মুনাজাতরত অবস্থায়ই একজন পুলিশ অফিসার এসে আমাকে সালাম জানালেন। বললেন, মসজিদের বাইরে রমনা জোনের এডিসি ও শাহবাগ থানার ওসি আমার সাথে কথা বলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখলাম তারা অল্প দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কান্নাভেজা চোখ সামলে তাদের কাছে যাওয়ার পর তারা তাদের সাথে সিসিইউতে যেতে বললেন। আমার ছোট ভাই নাসিমকে ছাড়া যেতে রাজি হলাম না। নাসিম তখন মসজিদেই নামাজরত ছিলো। আব্বার সাথে সাক্ষাত হবে আমাদের! ওকে ছাড়া কীভাবে যাই! সাক্ষাতের জন্য তারা আমাদের ডেকেছে! দীর্ঘ প্রতিক্ষার প্রহর শেষ হয়েছে আমাদের! আব্বাকে একনজর দেখতে যাচ্ছি আমরা। শাহবাগ থানার ওসি আমাদেরকে নিয়ে মানুষের ভিড় ঠেলে উপরে দোতালায় সিসিইউর সামনে চলে আসলেন। সেখানে আরো কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তা অপেক্ষমান ছিলেন। ইতোমধ্যেই বাতাসে আব্বার দ্বিতীয়বার হার্ট এ্যাটাক হওয়ার খবরে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে আব্বার রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। বহুল প্রতিক্ষিত ডাক আমাদের জন্য। আব্বাকে একনজর দেখে আসার জন্য ডাক এসেছে। আমরা এসেছি।

কিন্তু ডেকে নিয়ে তারা যে সংবাদটি জানাল, সেটি বইবার মত ক্ষমতা আমাদের ছিল না তখন। পৃথিবী সমান ওজন আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বার ইন্তেকালের দুঃসংবাদ দিল তারা আমাদেরকে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আব্বা এ দুনিয়াতে আর বেঁচে নেই। মাথা ঘুরতে লাগল। চোখ ঝাপসা হয়ে আসল। হাত-পা অকেজো হয়ে যেতে লাগল। এত ওজনী এই দুর্বিষহ সংবাদ বহন করার মত শক্তি কী আমার আছে! এ কি শুনছি আমি! এটা হতে পারে না। চিৎকার করে বলে উঠলাম, কী বলছেন আপনারা এসব। 'আব্বা আব্বা' বলে চিৎকার দিলাম। প্রশাসনিক লোকদের শোরগোলে আমার সেই চিৎকার হারিয়ে গেল। তাদের কথা মিথ্যা মনে হল। আমি আব্বাকে দেখতে চাইলাম। ওরা আমাকে আব্বার কাছে নিয়ে গেল। সাদা একটি কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা কোরআনের পাখিকে আমি দেখলাম। আমি তাঁর কপালে চুমু দিলাম। আমি তাঁর পা দু'টি ধরলাম। লম্বা করে চুমু দিলাম ত'র পবিত্র দু'পায়ে।

আমার চোখের পানি ফোটায় ফোটায় আব্বার পায়ে পড়তে লাগলাম। আর আমি আব্বাকে ডাকতে লাগলাম, আব্বা.... আব্বা.... আব্বাগো..... !

আব্বা হারিয়ে গেলেন চিরতরে। বাবা হারা পৃথিবীর লাখো বনি আদমের কাতারে আজ আমিও শামিল হয়ে গেলাম। আব্বার মুখে তাঁর অবস্থার কথা জানার অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো না। অপেক্ষা এক মহা শোকে পরিণত হয়ে আরেক দীর্ঘ অপেক্ষার সূচনা করল। জান্নাতে সাক্ষাতের অপেক্ষা।

২০১০ সাল থেকে প্রথমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ও পরে কাশিমপুর কারাগারে আব্বাকে দেখতে প্রতি মাসে একবার (আমাদের জন্য বানানো কারা কর্তৃপক্ষের রীতি অনুযায়ী) যাওয়া আমাদের প্রতি মাসের মূল কাজ ছিলো। যত ব্যস্ততা থাকুক, যত কাজই থাকুক– আব্বার সাথে সাক্ষাতের দিনে কোন কাজই আর রাখতাম না। আজ থেকে কাশিমপুরে যাওয়ার অপেক্ষায় আর দিন গুণতে হবে না আমাদের! সেখানে গিয়ে আব্বার সাথে সাক্ষাতের আবেদন জমা দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়েও থাকতে হবে না আমাদের! আজ থেকে আমাদের ছুটি!

আব্বার জন্য যারা হাসপাতাল থেকে শুরু করে জানাযা ও দাফনে সময় দিয়েছেন, শহীদ এবং আহত হয়েছেন, কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন, বহু শত মাইল পাড়ি দিয়ে জানাযায় এসেছেন, কবরে এসেছেন, আমাদেরকে সান্ত্বনা জুগিয়েছেন, এখনো আল্লাহর দরবারে আব্বার জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করে যাচ্ছেন– তাদের সকলকে আমাদের পরিবারে পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে সকলের উত্তম জাযা কামনা করছি।

আমরা আল্লাহর জান্নাতে আব্বার সাথে আবারও মিলিত হব ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। এ জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের আদেশ নিষেধ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে দ্বীন কায়েমের রাস্তায় সময় দিয়ে নিজেদেরকে জান্নাত হাসিলের যোগ্যতা অর্জন যেন করতে পারি– আপনাদের সকলের কাছে কায়মনবাক্যে সেই দোয়া চাচ্ছি। আল্লাহ এবং রাসুল (সা.) এর সাথে সাক্ষাতের একমাত্র জায়গাই যে জান্নাত; সেই জান্নাতেই আমরা আব্বাকেও পাবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা দয়া করে আল্লামা সাঈদীর কবরটাকে কোরআনের নূর দিয়ে আলোকিত করে দিন, কোরআনের পাখিটাকে দয়া করে জান্নাতের পাখি বানিয়ে দিন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর গোলামকে দয়া করে তাঁর কাছে একটি ঘর বানিয়ে দিন আর একান্ত দয়া পরবশে আমাদেরকে পিতা হারানোর যন্ত্রণাকর শোক সইবার তাওফিক দিন।

লেখক: আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর তৃতীয় সন্তান
সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, জিয়ানগর, পিরোজপুর।

আমার দাদাজী

তাসনুভা তামান্না সাঈদী

শুরুতেই মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি; আমার প্রিয় মানুষটাকে নিয়ে আমার অনুভুতি লেখার মাধ্যমে প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আসলে যাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে চাচ্ছি, তার সাথে আমার অগণিত স্মৃতি। আমি কোনটা রেখে কোনটা বলবো বুঝে পাই না। আমার দাদাজীর অসংখ্য অসংখ্য গুণের মধ্যে আমার সবচাইতে পছন্দ হতো তার বিনয়! দাদাজী আমার অসম্ভব বিনয়ী ছিলেন। আর ছিলেন প্রচণ্ড সামাজিক আর বন্ধুসুলভ মানুষ।

মুখে হাসি লেগেই থাকতো তার। এমন মায়ার হাসি দিয়েই তিনি দুনিয়ার সফর শেষ করেছেন। আমার জীবনে এই মানুষটার শূন্যতা কী যে ভীষণ অনুভব হচ্ছে আমি বলে বোঝাতে পারবো না। আসলে তাকে নিয়ে কিছু বলতে বা লিখতে গেলে বুক ভেঙে কান্না আসে।

আমি ছোট বেলা থেকেই খুব প্রশ্ন করতাম। এত প্রশ্ন করতাম সবাইকে যে মাঝে মাঝে উত্তর দিতে গিয়ে সবাই বিরক্ত হয়ে যেতো। কিন্তু দাদাজী কে প্রশ্ন করলে, তিনি এত মন দিয়ে আমার প্রশ্নটা শুনতেন যেনো মনে হতো প্রশ্নটা তারই ছিল আমি করে ফেলেছি।

একবার দাদাজী খুবই ব্যস্ত ছিলেন। বিকেলে তাকে কোনো বিষয় নিয়ে একটা প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু তিনি জবাব দেওয়ার সময় পাচ্ছিলেন না। এর মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে আমি প্রায় ঘুমিয়ে যাচ্ছিলাম। আর ঐই দিন অনেক রাতে ছিল দাদাজীর লন্ডন যাওয়ার ফ্লাইট। দাদাজীকে airport এ দিয়ে আব্বু বাসায় ফিরলেন তখন অনেক রাত।

আমি ঘুমে। সকালে উঠে দেখি আমার বালিশ এর পাশে একটা চিঠি। সেই চিঠিটা আমার করা প্রশ্নের উত্তর ছিল; যেটা দাদাজী চিঠিতে লিখে দিয়ে গেছেন আব্বুর হাতে, আমাকে দেওয়ার জন্য। তার সাথে আমার অনেক অনেক স্মৃতির মাঝে এটা খুব বেশি মনে পড়ে।

> “মনকে বোঝাই এই বলে যে এই বিচ্ছেদ খনিকের। ইনশাআল্লাহ চির সবুজ জান্নাতে আল্লাহ আবার আমাদের মিলিত করবেন।”

দাদাজী তুমি আমার কলিজার টুকরা। দাদাজী তুমি আমার নয়নমণি। আল্লাহ আমার দাদাজীকে আপনি অনেক আদরে রাখেন।

তাকে দুনিয়াতে যেভাবে সম্মানিত করেছেন আখেরাতে এর চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত করুন। আমার দাদাজী কে মাফ করে তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নিন। আমিন।

লেখক : আল্লামা সাঈদীর জেষ্ঠপুত্র মরহুম রাফিক বিন সাঈদীর বড় মেয়ে।

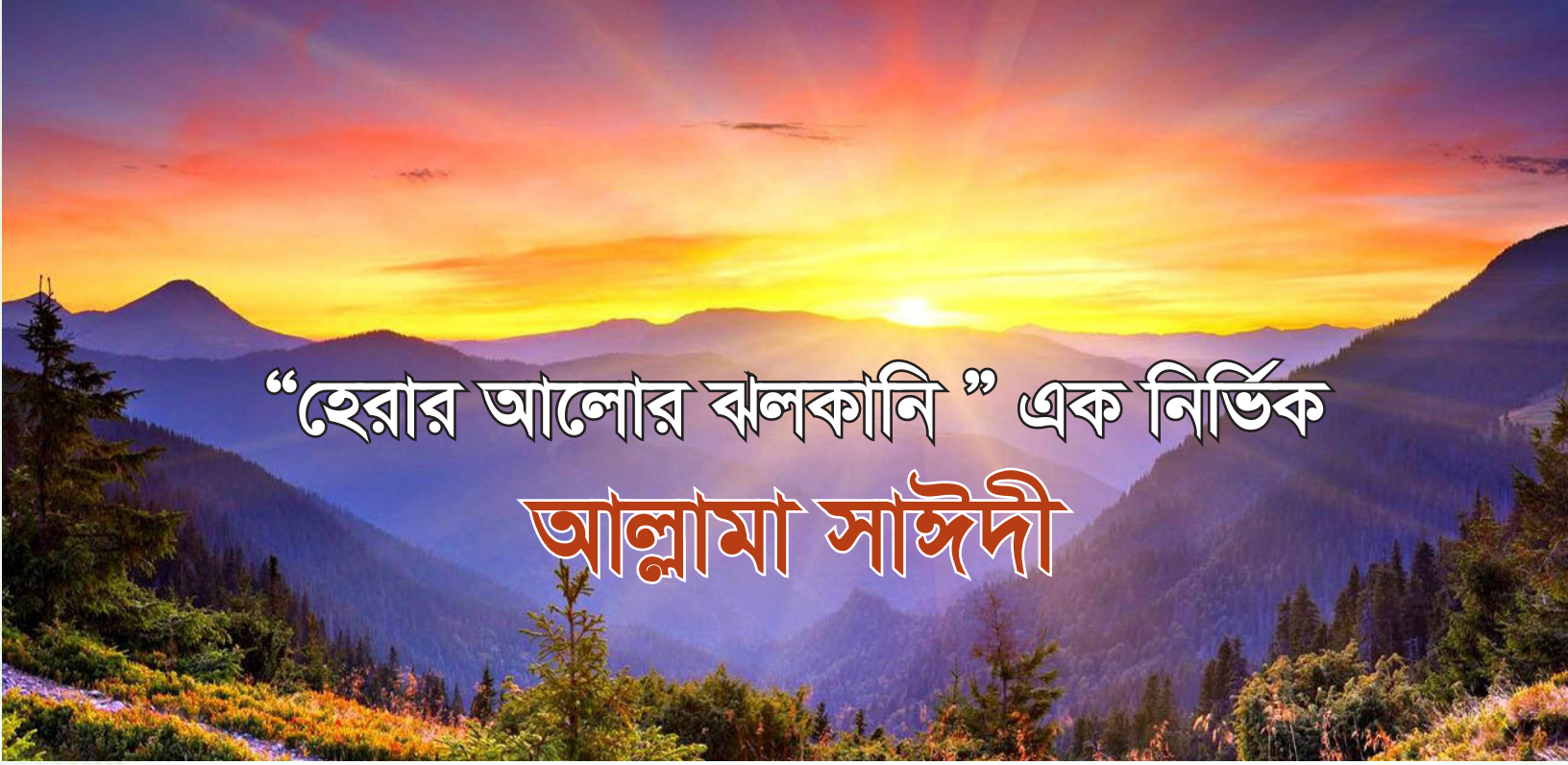

“হেরার আলোর ঝলকানি ” এক নির্ভিক আল্লামা সাঈদী

এ এন এম এ জাহের

মরহুম আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব কে আমি দেখেছি কোরআনকে হাতে নিয়ে আল্লাহর এক নিবেদিত বান্দা। আল্লাহর এক সাহসী গোলাম। সারা বাংলাদেশের শহরে বন্দরে গ্রামেগঞ্জে যেভাবে কোরআনকে হাতে নিয়ে তিনি হাজারো লাখো মানুষের সামনে কোরআন মজিদের তাফসির করেছেন। মানুষের কাছে কোরআনের আহ্বান সুস্পষ্ট করে তুলেছেন এবং কাজ করেছেন। সে আল্লাহর বান্দা সম্পর্কে আমার অনুভব, অনুভূতি, আমার আবেগ, যতখানি আমি দেখেছি, জেনেছি, শুনেছি এবং বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। তাঁরই কিছু বিষয় কলমবন্দি করে আদিষ্ট হয়ে এখন পেশ করতে যাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তৌফিক দান করুন।

আল্লামা সাঈদী তখন পর্যন্ত আমি তাঁর নাম শুনিনি। এমনকি কেউ তাঁর নাম শুনেছেন; এমন কারো কাছ থেকেও আমি শুনিনি। আল্লাহর এই গোলামের সাথে আমার দেখা হয় ১৯৭২ সালের শেষ অথবা '৭৩ সালের শুরুতেই। আমি তখন যশোর কোটচাঁদপুরের খন্দকার মোশাররফ হোসেন ডিগ্রী কলেজের ইংরেজির লেকচারার হিসেবে কর্মরত। তখনকার সময় সম্পর্কে আমাকে এটা লিখতেই হবে, এটা ছিল এমন; যেমন অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত্রি। অন্ধকার রাতে চতুর্দিকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ঘরে একটিমাত্র চেরাগ জ্বলছে। যার তেল ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন জ্বলে যতখানি আলো আসছে তাঁর বেশি আর কোন আলো চারিদিকে দেখা যাচ্ছে না। একমাত্র পুরুষ ঘরে। তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত। ঘরে খাদ্য নাই, পরিধান করার মতো তেমন কাপড়চোপড় নাই। স্ত্রী স্বামীকে পাহারা দিচ্ছে। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের দ্বীনি দিক থেকে সহিহ কোরআন এবং সুন্নাহর দিক থেকে এক অন্ধকার সময় অতিক্রান্ত হচ্ছিল।

এর সাথে আর একটুখানি যোগ করতে চাই। বিশাল মরুভূমিতে যেখানে পথের দিশা নেই। কোনো মরু ঝড়ে আক্রান্ত লোক যদি আজানের শব্দ শুনতে পায় অথবা আল্লাহু আকবার এই আওয়াজ শুনতে পায় অথবা যদি ঘোড়ার খুরের আওয়াজে কোন কাফেলা পার হচ্ছে কোথাও সেটা শুনতে পায় অথবা একটি গাছ যাতে অনেক ফল আছে এবং কিছুটা সন্ধান যদি সেখানে পাওয়া যায়। তখন যাদের কাছে এই জাতীয় কোন উপায় উপকরণ নেই, তাদের সংখ্যা এক-দুই জন হতে পারে, বেশি হইতে পারে, তাদের যে মানসিক অসহায়ত্ব এটা আসা জায়গায় এরকম একটা অবস্থা আপনার মনে করুন। এরকম একটা অবস্থায় সেই মরুচারী বা মরুভূমি অতিক্রম করছে, যে লোক অথবা যে সমস্ত লোকেরা তাদের মনে জীবনে বেঁচে থাকার ইচ্ছা সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের চিত্র এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল বলে আমি মনে করি না। এই যে একটা অসহায়ত্ব বিশাল শূন্যতা যে দ্বীনের প্রতি মানুষ ঈমান এনেছে এবং যার সাথে “লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ” যার ভিত্তি এবং “আল্লাহু আকবার” যার আওয়াজ এটা প্রায় যেন হারিয়ে গেছে সেই সময় আপনি একটু কল্পনা করুন। কোথাও যদি “আল্লাহু আকবার” এই আওয়াজ আপনার কানে আসে; তাহলে আপনার ঈমান থাকার কারণে যে প্রশান্তি, যে হিম্মত এবং যে আবেগ সৃষ্টি করবে এমন একটি অবস্থার কথা বলছি। যেটা ৭২,৭৩,৭৪ এই সময় কম বেশি বেশিরভাগ জায়গায় বিরাজমান ছিল।

এখন আসুন এই না জানা, না শুনা এমন একটা লোকের সাথে আমার পরিচয়টা হলো কিভাবে? আমি আগেই বলেছি যে, আমি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের লেকচারার আরো ‘হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট’। আমি কলেজে যাচ্ছিলাম, সাধারণত আমার অবস্থানের জন্য কলেজে একটা বিল্ডিং এ থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, ঐখান থেকে কলেজ কাছেই কয়েক মিনিটের পথ।

৫-১০ মিনিটের পর হঠাৎ করে আমার কানে আসলো যে, সেদিনই

মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে সোলায়মানপুর জামে মসজিদ, সেই মসজিদে বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল। আমি একদিকে হেঁটে যাচ্ছি, মাইকিং হচ্ছিল। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল যে এই বার্ষিক মাহফিলে প্রধান বক্তা মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী। এই নামটা আমি জীবনে প্রথম শুনলাম এবং আগে যেমন আমাদের দেশের মসজিদ, মাদ্রাসায় ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হইত। সেটা একাত্তরের পর থেকে শুধু সীমিতই হয়নি বরং প্রায় অনুপস্থিত হয়ে গিয়েছিল।

তখনকার ওই জমিনে দ্বীনের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু লোক আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে আসে। তাঁরা দেশে দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং কোরআনের রাজ কায়েম করার স্বপ্নে বিভোর ছিল। এটার জন্য যারা রাত দিন মেহনত করেছেন সেই লোকগুলি বিভিন্ন জায়গায় জুলুমের শিকার হয়েছেন এবং পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হয়েছেন এবং এই জাতীয় লোকদের বয়সের কোন সীমা ছিল না। ৮০-৯০ বছরে বৃদ্ধ ছিলেন। আবার কোনোদিন আল্লাহর দুনিয়া ওই জমিনের ওই টুকরায় প্রকাশ্যভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠন ছোট হোক অথবা বড়ো হোক মাথা তুলে কাজ করতে পারবে; এরকম কোন রকমের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না।

সেই সময়ে আমার মত একজন নগণ্য মুসলমানের কানে এটা ওয়াজ মাহফিলের ঘোষণা কেবলমাত্র তৃপ্তি দিয়েছে, তা নয়। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত করলাম, যে এই মাহফিলে আমাকে যেতেই হবে।

শুধু কোটচাঁদপুর নয় সে সময়ের আমি সারা দেশের খুব সাধারণ একটা চিত্র তুলে ধরেছি। এখানে একটা ব্যতিক্রম, সাধারণত ব্যতিক্রম হচ্ছে এইটা সাধারণভাবে মুসলমানরা যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু সাধারণভাবে আমি দেখলাম 'কোটচাঁদপুর আমাদের প্রতিবেশী দেশের সংস্কৃতিতে পৃষ্ঠে বাধা'।

এখানে আর একটা ইনফরমেশন আমি দিতে চাই। আপনাদের জন্য এটা হয়তো বা কোনই প্রয়োজন নেই কিন্তু আমি প্রয়োজন মনে করেছি। ১৯৮৬ সালের। মিউনিসিপালিটি পৌরসভা বাজার খুব ছোট নয় কিন্তু ওখানে বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীও আছে এবং দুইটা মসজিদ, একটা মাদ্রাসা, একটা কলেজ, একটা হাই স্কুল এগুলি সবই আছে। কিন্তু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ওই শহরে প্রকাশ্যে গরু জবাই গরু গোশত বিক্রি এগুলি হতো না! আমি এটা শুনলাম সেখানকার লোকদের কাছ থেকে, গরু জবাই হতো ওই শহরের থেকে তিন-চার মাইল দূরে কোনো এক জায়গায়।

আর এখন তো আমাকে বলতে হবে সেখানকার সাধারণ মানুষ যে ধর্মেরই হোক বিশেষ করে মুসলমানরা দ্বীনের দিক থেকে তারা কেমন ছিল; তার একটা উদাহরণ দিলে বুঝা যাবে। সাধারণত ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহার সময় মেয়েরা বাপের বাড়ি আসতো। এই সময় ছুটি থাকত; ছুটি তখনও ছিল কিন্তু মেয়েদের বাপের বাড়ির রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু ওখানে শুনলাম এটা নাকি দুর্গাপূজার সময় আসে। যাই হোক আমি গিয়ে যে কয়েকটা জিনিস এখানে দেখলাম প্রচুর সংস্কৃতি অনুষ্ঠান হতো এবং মহিলা-পুরুষরা গান পরিবেশন করতো। লোকজন একত্রিত হতো। সারা বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি এই কথাটা শক্তভাবে বলতে পারবো না। কারণ সারা বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার জানা সেই সময় কোন সুযোগ ছিল না।

আমি কলেজে গেলাম। আমার অভ্যাস ছিল ক্লাস শুরু হওয়ার পাঁচ সাত মিনিট আগে কলেজে যেতাম। স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমার ক্লাস তো ৪৫ মিনিটের, আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন এবং অন্য শিক্ষকরা রাজি হয়, তাহলে আজকে আমি দুই ঘণ্টা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়াতে চাই। এটা যদি আপনার অনুমতি থাকে এবং অন্য শিক্ষকেরা রাজি হন, তাদেরও তো সাবজেক্ট আছে। প্রিন্সিপাল রাজি হয়ে গেলেন এবং শিক্ষকেরাও রাজি হয়ে গেল।

আমি ক্লাসে গেলাম ফার্স্ট ইয়ারে আমার আর সাইন্স এন্ড কমার্সে কম্বাইন্ড ক্লাস অনেক বড় হলে হতো। তাই কিছু বেশি অথবা কিছু কম ছাত্র-ছাত্রী। আমি তাদেরকে বললাম তোমরা কি আজকে কোন মাইকিং শুনেছ? তাদের মধ্যে কিছু ছাত্র এবং কিছু ছাত্রী তারা বলল যে স্যার আমরা শুনেছি। আমি বললাম এ জাতীয় মাহফিল গুলিতে চাঁদাও তোলা হয় এবং বেহেশত বিক্রি করা হয়। আমি তো তোমাদেরকে ইংরেজি পড়াই আমার কিন্তু বেশ ইচ্ছা তো, আমার দরকার আমি সেখানে যাব। তোমরা কে কে যেতে চাও? আমি দেখলাম যে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের বেশির ভাগই বলো স্যার আমরা যাব। আমি মেয়েদেরকে বললাম যে সম্ভবত মহিলাদের জন্য কোন ব্যবস্থা সেখানে থাকবে না। আমি জানি না থাকে কিনা তো তোমরা মেয়েরা যেও না। আমি আমার ছাত্র যারা যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী তাদের সাথে আমি ওখানে যেতে চাই। সন্ধ্যার পরে গেলাম এবং গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেলাম। ভিতরে মাঠে মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে পুরা বক্তৃতা শুনলাম বা পুরা ওয়াজ শুনলাম। এই জাতীয় ওয়াজ মাহফিলে সাধারণত দ্বীনদার আলেম-ওলামা আমি একাত্তরের পাকিস্তান আমল আমি এটাই দেখেছি। কিন্তু আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত শ্রোতা নাকি এদের শ্রোতা অভ্যস্ত ছিল না বা যেত না আবার আমি ইংরেজি ভাষাও সাহিত্যের শিক্ষক। কিন্তু যেহেতু আমি লোকদের সাধারণ মানুষের কাছে খুব মোটেও পরিচিত ছিলাম না বা খুব কমই পরিচিত ছিলাম। আমার ছাত্র-ছাত্রী আমাকে জানত তাদের কিছু বক্তৃতা শুনলাম আর আবেগ আপ্লুত হলাম আশাবাদী হলাম যেন আমার দীর্ঘদিনের মনে কষ্ট যে পেরেশানি তা কিছুটা দূর হল।

একটা আলোকবর্তিকা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো যদিও আমি এ ব্যাপারে সব সময়ই মজবুত ঈমান পোষণ করতাম। মুসলমানদের ইতিহাসে সারা দুনিয়াব্যাপী লক্ষ কোটি মানুষ দ্বীনের জন্য শহীদ হয়েছে। আবার মুসলমান শাসকদের অন্যের ভূমি দখল করা যুদ্ধ অথবা কোন সুন্দরী মেয়েকে পাওয়ার জন্য, অন্য শাসক মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এই সমস্ত বিভিন্ন রকমের ইতিহাস আপনাদের জানা। এটার জন্য যত মুসলমান মারা গিয়েছে বা শহীদ হয়েছে কারণগুলি আপনাদের জানা বা আপনার জেনে নিতে পারেন, যদি না জেনে থাকেন। আমি আশা করি সবাই জানেন কিন্তু আপনারা কোনো এক জায়গা তো শুনেন নাই, ইতিহাসের কোথাও নাই, মুসলিম অমুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে কারো লেখাতে এইটা নাই, যে এত মুসলমান শহীদ হওয়া বা মারা যাওয়ার পরেও ইসলামকে শহীদ করতে পেরেছে অথবা ইসলাম

বন্ধ করে তারিখ বিদ্ধ করে, এটা হয় নাই ইসলাম ছিল; ইসলাম আছে। যদিও দ্বীনপন্থী মুসলমানরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছিল না কিন্তু দ্বীনের ওই যে গভীর মাটির অনেক গভীরে যে ছোট্ট শ্লোক এটা কোনদিন বন্ধ হয়নি এবং কোনদিন বন্ধ হবে না। ইনশাআল্লাহ আমি আমার বাসস্থানে ফিরে আসলাম যেখানে আমি থাকি। তারপর সাঈদী সাহেবের দেখা কিভাবে হল এটা আমি এর পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

মনে একরাশ আনন্দ ছিল, প্রশান্তি ছিল, অন্তরে আশা সৃষ্টি হয়েছিল। যে স্বপ্ন নিয়ে কাজ করেছিলাম দ্বীনের। এবং বাংলাদেশ হওয়ার পরে ৭২ সাল থেকে একই কাজ করতে ছিলাম। কেউ প্রকাশ্যে কেউবা অপ্রকাশ্যে। কিন্তু প্রকাশ্যে কথা বলার দ্বীনের ব্যাপারে বিশেষ করে দ্বীন কায়েমের। যে চিন্তা সামনে রেখে প্রকাশ্যে কথা বলার সুযোগ উন্মুক্তভাবে কথা বলার সুযোগ ছিল না। যাইহোক ওই রাতটা ভালোভাবে কাটলো আর রাতে ভালো কিছু স্বপ্ন দেখলাম এবং সিদ্ধান্ত করলাম। আল্লাহর গোলাম আল্লামা সাঈদী সাহেবের সাথে সরাসরি দেখা করা অত্যন্ত জরুরি।

ফজরের নামাজের পরেই তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। তখন তিনি থাকতেন কোটচাঁদপুরের একজন অত্যন্ত বড় ব্যবসায়ী দ্বীনদার তাঁর দোকানের দোতালা একটা রুমে। আমি ওনার সাথে দেখা করার জন্য ছাত্র বাবলু আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের ছেলেকে বললাম যে মাওলানা জেগে আছেন কিনা? নিচের দিকে নামবেন কিনা? আমাকে জানালো যে তিনি জেগে আছেন। এরপর আমি তারই মাধ্যমে মাওলানাকে জানাতে বললাম যে ডিগ্রী কলেজের ইংলিশের একজন শিক্ষক। আপনার সাথে দেখা করতে চায়। তিনি আনন্দে শুধু অনুমতি দিলেন না; উনি আমাকে দরজাতেই স্বাগত জানালেন।

এরপর দুজন বসলাম মাওলানাকে বললাম যে আমি আপনার ওয়াজ শুনলাম এবং অনেক বছর পরে প্রকাশ্য ময়দানে একটা দ্বীনি আলোচনা শুনলাম। ইসলামের উপরে ওয়াজ শুনলাম এবং আমি এটা যা শুনলাম তা ধারণ করার চেষ্টা করলাম। আমার সাধ্য অনুযায়ী, যোগ্যতা অনুযায়ী। আল্লামা সাহেব আপনার সাথে কি খোলামেলা কথা বলা যায়, আপনার সাথে খোলামেলা এর উপরে কথা বলা যাবে কিনা? তিনি বললেন অবশ্যই কেন নয়! আপনাদের কোরআন শরীফের মধ্যে কি এই কথা নাই? তিনি বললেন যে আমাদের কোরআন শরীফে আছে। এবং উনাকে এরপরে বললাম এই জাতীয় কথা কি আপনাদের হাদিস শরীফে নাই? তিনি বললেন যে হ্যাঁ আমাদের হাদিস শরীফও আছে এবং আপনাদের হাদিস শরীফে একই কথা। এভাবে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হল কিন্তু আমি এটা বুঝতে পারলাম মোটামুটি চিনেছি। তিনিও আমার সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে ধারণা লাভ করেছেন যে আমিও দ্বীনের পথেরই একজন মানুষ বা একজন কর্মী। আল্লামার সাথে এরপর আরো বিভিন্ন বিষয়ে কথা হল।

আল্লামার প্রথম দিনের প্রোগ্রাম ছিল সোলেমানপুর মসজিদের মাহফিল। দ্বিতীয় দিন ছিল একটা স্কুল মাঠে। শহর থেকে দুই মাইল পশ্চিমে, সেখানে সেদিন বিকালে ওনার মাহফিল ছিল। আমি আল্লামাকে বললাম সাহেব, আপনি কী আজকে আলমপুরে

শুধু "কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর উপরে আলোচনা করতে পারবেন কিনা? তিনি বললেন, আপনারা দোয়া করলে আমি চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ। পরের দিন সকালেই একই সময় আমি আবার উনার সাথে একই জায়গাতে দেখা করতে গেলাম এবং আমি উনাকে বললাম যে আমি আপনার বক্তব্য পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি আমার সাধ্য অনুযায়ী। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আপনাকে তৌফিক দান করুক। এরপর আমি উনাকে অনুরোধ করলাম আজকের ফুলপুর মাহফিলে আপনি শুধু "মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম" এর উপরে বক্তব্য রাখবেন, এটা আমার অনুরোধ। তিনি বললেন যে দোয়া করুন আল্লাহ তৌফিক দিলে আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব ফুলপরের মাহফিলে গেলাম। সেখানে অন্তত হাজার পাঁচেকের মত লোক দেখলাম। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এখানে ছোট্ট একটা Comparative statement আমি দিচ্ছি না দেখলাম চার-পাঁচশ, আলমপুরে দেখলাম প্রায় দুই হাজার, আর ফুলপুরে এসে দেখলাম যে প্রায় ৫ হাজারের মতো লোক। তাঁর আলোচনা একটা চাইতে একটা শুধু শুধু মূল্যবান এই নয়; অত্যন্ত জোশ এবং শুধু বিষয়ভিত্তিক ছিল তাই নয় বরং তাঁর আলোচনা গোটা শ্রোতাদের মধ্যেই আমি দেখলাম যেন বেশিরভাগ লোক সম্মোহিত হয়ে গেল। এই তিনটা মাহফিলের কথা বলে এর পরে আমার পরবর্তী।

এই শেষ মিটিংটা সম্ভবত আমার জীবনের এবং তাঁরও জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি উনার কাছে জানার চেষ্টা করলাম যে আপনি কি এরকম ছোটখাটো জায়গায় এবং মসজিদে শুধু ওয়াজ করেন, না বড় কোন জায়গাতেও করেন? তিনি বললেন যে আমি খুলনার কিছু কিছু জায়গায় যাই আর বগুড়াতে এক জায়গায় যাই একটা ফ্যাক্টরির মাহফিলে এবং পাবনা একটা জায়গাতে যাই। আপনি কী সারাদেশে এই কোরআনের আওয়াজ নিয়ে তৌহিদ, রেসালাত ও আখেরাত ভিত্তি করে বক্তব্য রাখার জন্য তৈরি আছেন কিনা? তিনি বললেন যে, আমি তো এই মাহফিল চিন্তা করি নাই। আল্লাহ যদি আমাকে তৌফিক দেন এটা কি আমি এটাকে আমার আল্লাহর কাছ থেকে একটা বড় নেয়ামত হিসেবে গ্রহণ করব। আমি ব্যক্তি সাঈদীর জন্য না এ দেশের মানুষের জন্য এবং যারা দ্বীন কায়েমের জন্য একনিষ্ঠ হয়ে যে কোন অবস্থায় কাজ করে যাচ্ছে। তাদের রাস্তা যদি আমার দ্বারা প্রশস্ত হয় এটাকে আমি সবচেয়ে বড় নেয়ামত হিসেবে গ্রহণ করব।

আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আমি আমার সামান্য জ্ঞান এবং স্টাডি থেকে আমি আপনাকে তিন চারটা কথা বলতে চাই, যার প্রতিটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি প্রস্তুতি ছাড়া কোন বক্তব্য আপনি না দেওয়ার অনুরোধ করে চেষ্টা করবেন এবং আপনি সতর্ক শব্দ ব্যবহার করবেন। আপনি মুসলমানদেরকে কোরআন হাদিস দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবেন এবং আপনার শ্রোতা কোনো বিশেষ শ্রেণি নয় বরং সমাজের সকল স্তরের লোক সকল বয়সের নারী এবং পুরুষ জন্য থাকে। মুসলিম এবং অমুসলিম সকলের জন্য খোরাক যেন থাকে এবং আমরা দোয়া করি আপনার কথা যেন আপনার শ্রোতাদের মন মগজ কে দ্বীনের ব্যাপারে, দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে সচেতন করে।

ফিরে গিয়ে মাওলানা কে এটাও বললাম যে মুসলিম যুবক এবং শিক্ষিত মহিলা ছাত্র ওলামায়ে কেরাম সহ দেশের যাদেরকে বুদ্ধিজীবী বলা হয় এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাদের সবার জন্য যেন খোরাক থাকে এবং তাদের মধ্যে পরিবর্তনের দ্বীনের পথে ফিরে যাওয়া, জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া, মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জমিন যেন তাদের অন্তরে আস্তে আস্তে সৃষ্টি হয়। আমি এখানে এরপর সাঈদী সাহেবকে এটা অনুরোধ করলাম যে এখনো দেশের মানুষ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সবচাইতে ভালোবাসে।

যদিও তাদের খুব কম লোকেই অর্থসহ কোরআন শরীফ পড়া, সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সাথে যাদের সম্পর্ক হয়েছে ৯০% এরও বেশি লোকের সিরাত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেই। এবং আল্লাহর কালামের অর্থ পড়ার যোগ্যতা থাকলেও এটাযে প্রয়োজন এই ধারণা তাদের নাই। আপনি এবং আপনাদের মত আলেমদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে যেন এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দেয় এর প্রয়োজনীয়তা তারা যেন গভীরভাবে অনুভব করে এবং তাদের নিজের পরিবারের, সমাজের, দেশের, রং পরিবর্তন করে।

আল্লাহর যে রং, সে রং তাদের সন্তানদের দ্বীন সহিহ, দ্বীন ইসলাম সঠিক ধারণা দিয়ে সমাজের রং পরিবর্তন করে দেওয়ার প্রিয় সংকল্প সৃষ্টি করে দেয়। চূড়ান্তভাবে ইসলামকে ক্ষমতার অধিকৃত করে এবং একটি ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র তৈরি করার প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়। আল্লামা বললেন আমি দোয়ার মহতাজ, কামিয়াবি আমার হাতে নয়, আমার মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার হাতে।

আমি এর পরের দিনেই কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে ঢাকার পথে রওনা করি এবং ঢাকা গিয়ে পৌঁছায় সন্ধ্যার পরেই। মাগরিবের পরেই দিনের নকিব যারা তারা যেখানে একত্রিত হন মাঝেমাঝে আমি সে জায়গায় গিয়ে হাজির হই। আমি অত্যন্ত আবেগের সাথে তাদেরকে মাওলানা সাঈদী সাহেবের ওয়াজ শোনা তার মাহফিল গুলোতে যোগদান করা তার সাথে আমার কথাবার্তা এই সমস্ত বিষয়ে উনাদেরকে অবহিত করি।

কয়েকজন ৬৩, ৬৪ সাল থেকে জেনে পরিচিত। তিনি বললেন যে এখন তোমার পক্ষ থেকে আমাদের করণীয় কি? এই সম্পর্কে কথা শুনতে চাই। আমি বললাম যে এই মাসেও সাঈদী সাহেবের প্রোগ্রাম অমুক জায়গায়, অমুক জেলা, অমুক জেলার অমুক জায়গাতে আছে। তারপরে মাসে এই এই জায়গাতে আছে আপনার মেহেরবানী করে আরো কয়েকজনকে ওই সমস্ত জায়গায় যে সমস্ত আপনাদের পরিচিত লোক আছে তাদেরকে বলেন। তার মাহফিলে অংশগ্রহণ করে যতটুকু সম্ভব যারা অংশগ্রহণ করতে পারে। তারা অংশ করে তারা শুনে এবং আপনাদেরকে অবগত করুন। ঢাকা থেকেও একটা টিম আপনারা পাঠান এরপর আমি আবার আপনাদের কাছে এসে আপনাদের সাথে বসবো এবং পরবর্তী বক্তব্য আবার চিন্তা-ভাবনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। কিন্তু সমস্ত বিষয়ে আপনারা আমার চাইতে অনেক বেশি অভিজ্ঞ এবং ইসলামের পথে আপনাদের খেদমত বিশাল।

আমিও বললাম যে, আমার দৃষ্টিতে আমি বিশাল এবং খনির সন্ধান পেয়ে, বিশাল এই জাতীয় কিছু লোক তৈরি করার জন্য আবেদন

করছি। তারা জনগণের সামনে সহিহ ইসলাম এবং কুরআনের দাওয়াত তুলে ধরতে পারে তাহলে এই জমিন একদিন কথা বলবে এই বেদখল হওয়ার জমিন আবার ফেরত পাওয়া যাবে। আর ফুলেফলে সাজানো অনেক বাগান ইনশাআল্লাহ তৈরি করে দেবেন।

আমার স্কুল লাইফে কবি ফররুখ আহম্মদের পাঞ্জেরী কবিতাটা আমার খুবই প্রিয় ছিল। তাঁর কবিতার দুই তিনটা লাইন একটা লাইন 'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি? এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে? সেতারা, হেলার এখনো ওঠেনি জেগে? তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে; অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি। রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?

আমি ওনাদের কাছ থেকে বিদায় নেই। মাওলানার সম্পর্কে তারা যতটুকুন সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন এবং যারা আলোচনা শুরু থেকে শুনেছেন তাদের কাছ থেকে তাদের রিপোর্ট পেয়েছেন। এরপরে মুরুব্বিরা একটা কমিটি করে দেয় যে তারা যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানেই মাওলানার সাঈদী সাহেবের মাহফিলের আয়োজন করবে। এখন থেকে কাজ শুরু হয়ে গেল তিয়াত্তরের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে কয়েক বছর এই পরিকল্পিত মাহফিল। ঢাকা থেকে বিভিন্ন এলাকায় যারা যে কোন অবস্থাতেই দিনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের কাছে ঢাকা নির্দেশিকা পৌঁছে গেল। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কোরআনকে হাতে নিয়ে মাহফিল করা শুরু করলেন। আমি এটাকে এভাবেই বিশ্লেষণ করি যে তিনি মাঠে নেমেছিলেন এক সৈনিক হিসেবে। মাত্র দুই-তিন বছরের ব্যবধানে তিনি হয়ে গেলেন এক শক্তিশালী মুয়াজ্জিন এবং হাজারো হাজারো লোকের মহব্বত এবং বিশ্বাসের নকীব। তিনি ছিলেন দায়ী ইলাল্লাহ এবং দাওয়াতে ইলাল্লাহ এর সার্বক্ষণিক কর্মী এবং নেতা।

আল্লামা সাঈদী সাহেব রাহিমাহুল্লাহ কয়েক যুগ ধরে বাংলার জমিনে, পাশের দেশের বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে এবং দুনিয়ার যেখানেই বাংলাদেশীরা অবস্থান করতেন প্রায় সব লোক। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুফাসসিরে কোরআন এবং প্রায় দলমত নির্বিশেষে সকলের নিকট ছিলেন একজন ইমাম। আগেই বলেছি তিনি ছিলেন আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা নির্বিশেষ সাহসী গোলাম নিবেদিত প্রাণ যিনি আদর্শ ও সংগঠনের এক অনুপম ব্যক্তিত্ব, অনুগত ব্যক্তিত্ব। তিনি কথায় কাজে আমলে কোরআন এবং সুন্নতে রাসুলের ধারক বাহক ছিলেন। বাংলাদেশের আর গোলাপ সর্বজন শ্রদ্ধেয় দ্বীনি আন্দোলনের নির্ভীক নেতা এবং ভালোবাসা শ্রদ্ধার কেন্দ্র সম্মানিত প্রফেসর সাহেব তাঁকে 'কোরআনের কণ্ঠস্বর' বলে আখ্যায়িত করতেন। ৭৪,৭৫ সাল থেকে শুরু করে জেলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি দেশে-বিদেশে বাংলা ভাষাভাষী লোকদের কাছে এক আবেগময় এবং সর্বোচ্চ মুফাসসির বক্তা।

আমার ব্যক্তিগত এবং সংগৃহীত তথ্য থেকে বলতে পারি সাত-আট কোটি লোক তার বক্তব্য সরাসরি শুনেছে। তাঁর মুখ থেকে আর তাঁর যদি কোরআন ও সিরাতে আলোচনা ক্যাসেট আকারে বা ক্যাসেটের মাধ্যমে শ্রোতার হিসাব ধরতে হয় তাহলে এটা সোনা সম্ভব নয়। কেননা আমার জানা মতো ব্যক্তিগতভাবে যাকে তাদের আদর্শ তারাও তার বক্তব্য রেকর্ডের বক্তব্য শুনেছে। এবং তারা তাদের মধ্যে অনেকের কাছ থেকে আমি এটা সরাসরি শুনেছি যে তারাও সাঈদী সাহেবের তাফসির বক্তব্য ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক, আগ্রহে হোক, অনাগ্রহে হোক, তারাও শুনেছে। এমনকি তিনি যখন এমপি হননি, তখনও তার কথা পার্লামেন্টেও আলোচনা হয়েছে। দেশের মানুষের মধ্যে একটি ইসলামিক চেতনা আবেগ অনুভূতি ব্যক্তিগত সামষ্টিক বিপ্লব ঈমানের এক নবজাগরণ সৃষ্টি হয়ে গেল।

বাংলাদেশের যেকোনো জায়গায় এক সকাল বেলা যদি মাইকিং করে বলা হতো অমুক জায়গাতে আজ রাতে সন্ধ্যার পরে আল্লামা সাঈদী সাহেব তাফসির করবেন, সেখানে হাজার হাজার লোক পুরুষ-মহিলা একত্রিত হয়ে যেত। তার তাফসির তার বক্তব্য শুধু শুনতেই না বরং তারা তাদের মধ্যে এক পরিবর্তন নিজেরাই অনুভব করতো। এক কথা বলা যায় সাঈদী সাহেব তাদেরকে আল্লাহর কোরআনের দিকে ডাকতেন। আর তারা শুধু আবেগ নয় সমস্ত অন্তর দিয়ে স্লোগানের মাধ্যমে তারা সাড়া দিত। আপনারা জানেন 'আল কুরআনের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো' এটা ছিল মাহফিলের প্রধান স্লোগান এবং তা ধ্বনিত হইত ছাত্র যুবকদের কণ্ঠ থেকে। আর বয়স্ক লোকদের চোখ থেকে কেবল পানি ঝরতে থাকতো। এভাবেই জনগণের মনে আল্লামা সাঈদী সাহেবের জন্য এক মজবুত নির্ভেজাল মাকাম তৈরি হয়ে গেল। ছাত্র ও যুব সমাজ তাকে তাদের অন্তরেই নয়, কোরআন এর বক্তব্য তারা ধারণ করল এবং কুরআনের এই আলোকবর্তিকা কে নিয়ে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই ইসলামের মজবুত দেয়াল সিসা ডালা জমিন তৈরি হতে থাকলো। এবং একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আল্লাহ তায়ালা তার এই গোলাম সাঈদী সাহেবের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে এক বিরাট বিপ্লবের সৃষ্টি হল।

একদিকে যেমন যারা দিনের বিজয়ের স্বপ্ন দেখত তাদের জন্য জমিন এর এই অগ্রগতি অপপ্রচার এবং আল্লাহর গোলামের কণ্ঠকে কিভাবে স্তব্ধ করা যায় তারা তাদের ষড়যন্ত্রে জাল বুনতে থাকলো। আমার জানা মতো, আমার এই বয়সে আমি শুনি নাই এক ব্যক্তির মাহফিল বন্ধ করার জন্য যেখানেই তার মাহফিল যে জেলায় হোক যে শহরেই হোক এটাকে বন্ধ করার জন্য সেখানে তিনি যেন যেতে না পারেন। কোরআনের এই কণ্ঠস্বর রাসুলের জিন্দেগীর কথা যেন জানতে না পারে। তার জন্যই এই সমস্ত হরতাল দেওয়া হয়েছে কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে তার সাহসী গোলাম একটি ছাড়া ৭৬ টি মাহফিলে যথারীতি পেশ করেছেন। কোরআনের কথা বলেছেন, নবীদের কথা বলেছেন।

তাদের টার্গেট ছিল আখেরি পয়গম্বরের বাণী শুনা থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা। কিন্তু সাঈদী সাহেব একটি ছাড়া ৭৫ টি মাহফিলে যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং লাখো লাখো লোকের সামনে তিনি তাফসীর পেশ করেছেন এবং সিংহের গর্জন দিয়েছেন। সেখানকার মাহফিলে আগের তুলনায় দ্বিগুন তিনগুণ চারগুণ লোক উপস্থিত হইতো। এক একজন সৈনিকের মত আমি আগেই বলেছি তিনি একটি মাহফিলে যেতে পারেন নাই, সেটা তার নিজের কোন দুর্বলতা অথবা ভয়ের কারণে নয়। তাকে তার মুরুব্বীরা যেতে নিষেধ করেছে; সেই জায়গা ছিল নারায়ণগঞ্জ। মাহফিলে ১৪৪

ধারার মতোই তখনকার সরকার সেখানে অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করল।

চট্টগ্রামে তাফসীর মাহফিল হতো চট্টগ্রাম কলেজ মাঠে, সেখানে হতে দিল না, জনগণের চাপে বাধ্য হয়ে আমার যতখানি মনে পড়ে চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ডে মাহফিল অনুষ্ঠানের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। আল্লামা ঢাকা ফিরে আসার পরে আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাহফিল কেমন হয়েছে? তিনি বললেন, ভাইজান এই মাহফিলে কত লোক হয়েছে আমি বলতে পারব না। তবে এই ময়দান ও যার বিভিন্ন পাশের, বড় বড় রাস্তা, গাছপালা, এমারতের ছাদ, সর্বত্র শুধু আমি মানুষের এক মহাসমুদ্র দেখেছি। তারপর তিনি হেসে উঠে বললেন এই মাহফিলের আমার অনুভব অনুভূতি বললেন 'আল্লাহর কাজ খোদার কাজ আল্লাহই করে দিয়েছে'।

আল্লামা সাঈদী রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর এক নির্ভেজাল অনুসারী ছিলেন এবং রাসূলের প্রতিষ্ঠিত মদিনার আদলে একটি ইসলামী সমাজ, একটি ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামের শাসন, ইসলামী বিচার, ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা এবং পরিবার, সমাজ, দেশ কায়েমের দিকে তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি একান্ত আবেগ এবং দৃঢ় প্রত্যয় এর সাথে বলতেন, 'দ্বীন কায়েম করতে হলে দারিদ্র্যের মোকাবেলা করতে হবে'। দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতে হবে, জেলে যেতে হবে, ফাঁসি, শাহাদাতের পানি পান করতে হবে। তাঁর ইন্তেকাল হলে ঐ দিনই লোকেরা, তার শ্রোতারা, তাকে সাধারণ ভাবে মৃত্যুবরণ করা কোন লোক হিসেবে আখ্যায়িত করেন নাই। কুরআনের এই পাখিকে, কোরআনের কণ্ঠস্বরকে 'শহীদ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

দেশের বহু আলেম আল্লামা সাঈদীর বক্তব্য ধারা আলোচনা করে থাকে। কারণ মানুষের কান, মানুষের মগজ, মানুষের দিল, দেমাগ, এই ধরনের বক্তব্য ছাড়া অন্য কিছুকে গ্রহণ করার জন্য আর তৈরি ছিল না। অতীতের সম্মানিত ইমাম বড় বড় আলেম যাদের কথা আমরা বইপুস্তকে দেখতে পেয়েছি, মুখে শুনতে পেয়েছি, তাদের কারণেই বাংলাদেশের তথা ভারতের উপরে ইংরেজদের প্রায় দুইশত বছরের শাসন এবং তখনকার লোকদের গোলামী জিন্দেগি যতদিন চলেছিল। সেখানে আলেমেরা যারা দ্বীনকে হারিয়ে যেতে দেয় নাই, তারা ছিল আলেম-ওলামা, ইমাম-মোয়াজ্জিন এবং দ্বীনপন্থী লোকদের বক্তৃতা বিবৃতি এবং মাইলের পর মাইলে হেঁটে হেঁটে ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে মানুষের কাছে ছুটে গেছেন, গোপনে প্রকাশ্যে তাদের এই চেষ্টা প্রচেষ্টা জিহাদ যেন বেকার যায়নি।

আল্লামা সাইদী সাহেব ভারতের অনেক বিখ্যাত আলেমদের সমপর্যায়ে নন। কিন্তু আল্লাহর গোলাম হিসেবে তিনি তারই মেহেরবানী-তে তিনি তেলাওয়াতকে এমন ভাবে মানুষের অন্তরে জায়গা করে দিয়েছেন। কোরআনের পাখি আজকে "ওপেন ইউনিভার্সিটি প্রধান" ইউনিভার্সিটির ছাত্র প্রায় প্রতিদিনই বেরোচ্ছে। আপনারা গত কয়েক বছরের বাংলাদেশের দ্বীনী বক্তাদের বক্তব্য শুনে আমার এ কথাটাকে আশাকরি স্বীকার করবেন।

আমার শেষ কথা যা বলতে চেয়েছিলাম তা সব বলতে পারেনি, আমার ভাষা দুর্বল, স্মৃতির দুর্বলতা এবং কয়েক বছরের অনভ্যাস সব মিলে আপনাদের কোন একজনের ও ভালো না লাগতে পারে এবং আমি ভুলভাল কিছু বলতে পারি। আপনারা দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

আরো ২/৩ টি কথা-

(1) ৭২ এর থেকে ইসলামী আন্দোলন ও দ্বীনি দাওয়াতের যে নতুন যাত্রা, তার সঠিক ইতিহাস যারা লিখবেন, তাতে সাঈদী সাহেবের অবদান বা তার মাধ্যমে সৃষ্টি, এতে তার জন্যে ৪০/৫০ ভাগ রাখতে হবে।
(2) মাটির গভীরতম জায়গায় কঠিন পাথরের ফাঁকে দিয়ে যে ঝর্ণাধারা বয়ে গেছে, সেখানে সাঈদী সাহেবের কোরআনের কণ্ঠ খুঁজে পাওয়া যাবে অবশ্যই, ইনশাআল্লাহ।
(3) তিনি প্রায় ১৩ বছর স্বশরীরে জনগনের মধ্যে অনুপস্থিত কিন্তু তাঁর পথ ধরে শত শত কণ্ঠ আল্লাহ জন্ম দিয়েছেন। এ মিছিল বন্ধ হওয়ার নয়, হবে না কোন দিন। তিনি বেঁচে থাকবেন জনম।
(4) ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের পাতাকার সাথে কালেমার পতাকা উঠবেই তাতে যতদিন লাগে, সুবেহ সাদেক লোকেরা দেখবেই, মৃত বা জীবিত অবস্থায়।

সাঈদী সাহেবের বড় সন্তান মরহুম বুলবুল সাঈদীর ইন্তেকালের পর যে জানাজা, সেই জানাজায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টার পরে চাপাচাপির পরে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে আমার মনে হয় সেই জায়গায় কত বড় সংখ্যক পুলিশ এবং কত সরকারি লোক ছিল বলতে পারব না, তারা একে অপরের সাথে সরাসরি বা ওয়াকিটকিতে কথা বলতেছিল "এখান থেকে সাঈদী সাহেবকে আমাদের শক্তিতে নেওয়ার কোন শক্তি নাই। যদি বাধা দেওয়া হয় আমরা নিতে পারবো না"। কথাটা সত্য ছিল কিন্তু সাঈদী সাহেব এবং সেই জানাজায় উপস্থিত দ্বীনী আদর্শের বুদ্ধিমান লোকেরা আইনের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন নাই। সাধারণত আমি এই কোন জনসভা অথবা এই জাতীয় কোন জায়গায় নিজেকে প্রথম কাতারে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম না কোন এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে শুনি অথবা অনেক জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হয় না। আমি এই জায়গায় নিজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি, উনি যেখানে সেদিকে সেখানে ছুটে যাই আল্লাহর ইচ্ছা মানুষ নিজে থেকে আমাকে রাস্তা করে দেয় সাঈদী সাহেব মরহুম আমাকে দেখলে এবং আমার মাথাটা ধরে কপালে এক মহব্বতের চুমু দিলেন। সেই চুমু নিয়েই বাংলাদেশের এই কোরআনের পাখিরে নিয়ে আমি আপনাদের কাছে এই কথাগুলো বললাম। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের মধ্য থেকে আরো হাজারো সাঈদীর জন্মদান করুন, কথা বলার তৌফিক দিন, কাজ করার তৌফিক দিন, আল্লাহ তার দ্বীনকে বাংলাদেশ এবং মুসলিম দেশে সারা দুনিয়ায় দিনের রাজ কায়েম করুন। আমিন।

বিলেতে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

আবু সাকিব

বছরটা ঠিক মনে নেই। নব্বই দশকের মাঝামাঝি হবে বোধ হয়। বার্মিংহাম জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের হলে ওয়াজ মাহফিল চলছে। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর তাফসীর মাহফিল। সামনের সারিতে বসে ওয়াজ শুনছি। পাশে বসেছেন আমার বন্ধুবর, ইসলামিক রিলিফ ইউকের চেয়ারম্যান ডক্টর হানী আল বান্নাহ। ডক্টর হানী মিশরি, বাঙালি নন, এক বর্ণ বাংলা ও জানেন না। আর তরজমার কোন ব্যবস্থা ও ছিল না। ভাবছিলাম উদ্যোক্তাদের দাওয়াতে নেহায়েত ভদ্রতা বশতই এসেছেন, একটু পরেই হয়ত অনুমতি নিয়ে চলে যাবেন। দু-একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম অস্বস্তি বোধ করছেন কিনা। কিন্তু তাঁর চোখে মুখে এসবের কোন চিহ্ন মাত্রও দেখা গেল না। বরং বেশ তন্ময় হয়েই শুনছিলেন। তবুও একরকম গায়ে পড়েই একবার মৃদু সরে বললাম, ডক্টর হানী, চাইলে আপনি চলেও যেতে পারেন, কোন অসুবিধা হবে না। তিনি ইশারায় জানালেন যে 'তিনি শুনতেই চান, যাবেন না'। মাওলানা সাঈদীর আলোচনা সংক্ষিপ্ত হয় না, এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত তো চলেই। পুরো সময়ই ড. হানী তফসীর শুনলেন। তারপর অংশ নিলেন দীর্ঘ মোনাজাতেও। সভা শেষে একরকম স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই তিনি তাঁর অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, "আপনি হয়ত আশ্চর্য হচ্ছিলেন আমি কেন পুরো আলোচনা শুনলাম। জীবনে ইসলামি আলোচনা অনেক শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম এক সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ওয়াজ শুনলাম। বক্তব্য অবশ্য পুরোটা আমি বুঝিনি, তবে প্রায় সারা বক্তিতাই কোরআন হাদিসের অগণিত রেফারেন্সে ভরপুর থাকায় মূল বিষয়বস্তুটা আঁচ করতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু যা আমাকে অভিভূত করেছে তা হল মাওলানার অসামান্য পরিবেশনা-দক্ষতা। আমি ঘুরে ফিরে শ্রোতাদের অবস্থা দেখছিলাম, সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর বক্তব্য গ্রাস করছিলেন। ঠিক কোরআনে কারিমের মতই এক অসামান্য যাদুকরী স্পর্শে তিনি শ্রোতাদের কখনও হাসাচ্ছেন, কখনও কাঁদাচ্ছেন। মানুষের অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত স্পর্শ করার এই অপরিসীম দক্ষতা নিতান্তই আল্লাহর এক বিশেষ দান, এই যোগ্যতা সকলের থাকে না। এমন প্রতিভাকে দলীয়করণ না করে ময়দানে ছেড়ে দিলে গোটা জাতিকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।"

মাওলানা সাঈদীর সাথে বাংলাদেশে আমার পরিচয় ছিল না। সত্তরের শেষ অংশে কোরআনের বাণী নিয়ে তিনি টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত সারা বাংলাদেশের প্রান্তে প্রান্তে ছুটে বেড়াতে শুরু করেছিলেন। তাঁর তাফসীর মাহফিল গুলোতে জমায়েত হচ্ছিল লাখো মানুষ। সেই টেপ-রেকর্ডারের যুগে ঘরে ঘরে বিলি হচ্ছিল তাঁর ওয়াজের ক্যাসেট। শীঘ্রই সেই সব ক্যাসেট বিলাতে এসেও হাজির হতে লাগল। সে সময় ইউকে ইসলামিক মিশনই ছিল বিলাত প্রবাসী মুসলমানদের সংমিলিত সংগঠন। বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতে দ্বীনের কাজকে আরও জোরদার, আরও প্রাণবন্ত করার জন্য তখন আমরা নানা নতুন পথ ও পন্থা তালাশ করছিলাম। এই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে প্রবাসীদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত কেমন করে আরও দ্রুত গতিতে পৌঁছনো যায় তার কার্যকরী কৌশল খোঁজাও ছিল আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। বিলাতের স্বল্প শিক্ষিত বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার বেশি ছিল না বটে, তবে আমাদের দাওয়াতের মূল লক্ষ্য যারা সাধারণ শ্রমজীবী হলেও সত্যকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তারাও শিক্ষিতদের চেয়ে কোন অংশেই পিছপা ছিলেন না। তাঁদের অন্তরের ভিতরের সেই সুপ্ত ইমান জাগিয়ে দেওয়ার জন্য শুধু প্রয়োজন ছিল পূর্ণাঙ্গ ইসলামের বাণী সহজ জনবোধ্য ভাষায় তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। বাইরের জগতে "অডিও বুকের" প্রচলন এখনকার মত ব্যাপক হওয়ার আগেই সে সময় বিভিন্ন বইয়ের অংশ বিশেষ পড়ে অডিও ক্যাসেট করে বিতরণ করতে শুরু করা হল। ঠিক এমন সময় সাঈদী সাহেবের ওয়াজের ক্যাসেট গুলো

যোগ হল আমাদের দাওয়াতি উপকরণের আর একটা মূল্যবান মূলধন হিসাবে। ঘরে ঘরে দাওয়াতি আভিযানে বেরিয়ে এগুলোর কপি বিতরণ করা হতো। আর বাড়িতে বাড়িতে, টেইলারিং ফ্যাক্টরি আর ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট গুলোতে বাঙালি কর্মীরা অনবরত টেপ রেকর্ডারে এসব ক্যাসেট শুনত। যারা এতে রুহানী খোরাক পেত, তারা নিজেরাই খুঁজতে আসতো এমন আরও টেপের জন্য। মাওলানা সাঈদী সাহেবের ওয়াজের যাদুকরী ফল দেখে আমরা ভাবলাম, শুধু ক্যাসেট কেন, ক্যাসেটের মূল উৎস খোদ সাঈদী সাহেবকেই ইংল্যান্ড সফরে নিয়ে আসা যাক না কেন? এই প্রাথমিক প্রস্তুতির পর বাংলাদেশী ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের নিয়ে আলাদা নতুন সংগঠন 'দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে' ও আয়ার গঠন করা হল ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে বার্মিংহাম সেন্ট্রাল মসজিদে অনুষ্ঠিত দুই দিন ব্যাপী সর্বশেষ যৌথ সম্মেলন। এতে বক্তৃতা করার জন্য মাওলানা সাঈদী সাহেবকে দাওয়াত দেওয়ার সিধান্ত নেওয়া হল। দাওয়াতুল ইসলাম গঠনের পরপরই দাওয়াতি উপকরণের প্রয়োজন পূরণের জন্য কিছু বাস্তব পদক্ষেপ ও নিলাম। যারা পড়তে পারেন তাদের পক্ষেও বড় আকারের বই পড়াটা সহজ ছিল না। তাছাড়া আমাদের ইসলামি বইপত্র গুলোর ভাষাও ছিল উচচাঙ্গের, খুব একটা জনবোধ্য নয়। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল মোটামুটি ইসলামের মূল দাওয়াতের সারসংক্ষেপ পেশ করে এমন চারটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে। এ জন্য মাওলানা মওদূদির অমর লেখনী থেকে চারটি নির্বাচিত পরিচ্ছদের ভাষা খানিকটা সহজি-করণ করে "এবাদত", "মুসলমান কাহাকে বলে?", "খোদার হুকুম পালন করা দরকার কেন?" ও "মুসলিম জাতির দায়িত্ব" নামে চারটি ছোট পুস্তিকা বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়ে আনালাম।

এসব পুস্তিকা, পড়ে-টেপ-করা-বইয়ের ক্যাসেট ও সাঈদী সাহেবের ওয়াজের ক্যাসেট বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রচুর সাড়া জাগাতে সক্ষম হল। ধীরে ধীরে তারা এক এক করে ইসলামি আন্দোলনের দাওয়াতে লাব্বায়েক বলতেও শুরু করলেন। পরিধি বাড়তে লাগল সংগঠনের। অন্য দিকে নতুন ইস্ট লন্ডন মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করার আয়োজন ও তখন শেষ পর্যায়ে, তহবিল সংগ্রহের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছিল। যেহেতু মসজিদের দায়িত্ব ও আমাদেরই উপর ছিল, তাই ঠিক হল একসঙ্গে উভয় কাজের জন্যই তিন দিন ধরে ওয়াজের মাহফিল চলবে, মাওলানা সাঈদী সাহেবকে এবারও দাওয়াত দেওয়া হবে। তিনি তাঁর ওয়াজে ইসলামি আন্দোলনের দাওয়াত দিবেন, আর চাঁদা তোলা হবে মসজিদ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য। আমাদের তখনকার ছোট প্রি-ফেব্রিকেটেড মসজিদটিতে বড়ো জোর শ'চারেক লোকের স্থান সংকুলান হতে পারত। কিন্তু আগের বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এটা মোটামুটি পরিষ্কার ছিল যে এবারের বড়ো মাহফিলের জন্য মসজিদ যথেষ্ট হবে না। তাই আরও একটা সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে গোটা ফিল্ড গেইট ষ্ট্রীট বন্ধ করে দিয়ে খোলা আকাশের নিচে অনুষ্ঠিত হবে মাহফিল। সারা ইংল্যান্ডে প্রথম কিনা জানি না, তবে লন্ডন শহরের এক প্রধান সড়ক বন্ধ করে তিন দিন ধরে জনসভা করাটা পূর্ব লন্ডনে ওটাই যে সর্ব প্রথম ছিল তাতে কোন সন্দেহ বাকি থাকল না। যখন অনুমতি নেওয়ার জন্য কাউন্সিল ও পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে গেলাম, দেখলাম তারা আমাদের প্রস্তাব শুনে বিস্ময়ে হতবাক। যা হোক অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে, মাওলানা সাঈদীর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা আর শ্রোতাদের মধ্যে তাঁর ওয়াজের ফলে কীভাবে মানবতাবোধ ও নাগরিক দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে তার বিবরণ দিয়ে শেষ পর্যন্ত কয়েকটা শর্ত সাপেক্ষ অনুমতি মিলল।

গ্রীষ্মকাল, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দিনের আলো থাকে, তাই খোলা রাজপথে জনসভা করতে যে কোন অসুবিধা হবে না, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। ফিল্ড গেট স্ট্রীটে এখনকার মরিয়ম সেন্টারের সামনে বক্তৃতা মঞ্চ করা হল, প্রথম দিনে সরকারি অনুমতির শর্ত অনুযায়ী জরুরি অবস্থা দেখা দিলে পুলিশ ও এম্বুলেন্স চলাচলের জন্য একপাশে সামান্য পথ রেখে রাস্তার উপর পাতা চাটাইতে শ্রোতাদের বসতে দেওয়া হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেকদুর পর্যন্ত রাস্তা ভরে গেল জনতার সারিতে। দাওয়াতুল ইসলামের আমীর জনাব আব্দুস সালাম সাহেবের সভাপতিত্বে মাহফিল শুরু হল। বিদেশী মেহমানদের মধ্যে ইসলামি আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক মাওলানা এ, কে, এম, ইউসুফ প্রথম বক্তৃতা করলেন। তারপর তাফসীরে কোরআন পেশ করলেন সাঈদী সাহেব। শুধু মুসলমান শ্রোতারাই নয়, ডিউটিরত পুলিশ এবং অমুসলিম পথচারীরা ও অবাক হয়ে তাঁর সুলিলিত কণ্ঠের বক্তৃতা শুনছিলেন। আলোচনা শেষে মাওলানা তাঁর চিরাচরিত নিয়মে বললেন যে, আজ শুধু ভূমিকা রাখলাম, মূল তাফসীর হবে আগামীকাল ও পরশুদিন ইনশাআল্লাহ, নিজেরা তো আসবেনই, আর সাথে করে বন্ধু বান্ধবদেরও নিয়ে আসবেন।

দ্বিতীয় দিন সভা আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে থেকেই জনসমাগম শুরু হল। দেখতে দেখতে সমস্ত ফিল্ড গেট স্ট্রীট ভরে গিয়ে প্লাম্বারস রো (বর্তমান টেক্কও এক্সপ্রেস) পর্যন্ত মানুষে মানুষে ভরে

গেল। চেষ্টা করেও শর্ত অনুযায়ী পাশ দিয়ে সরু এক চিলতে পথ খালি রাখা গেল না। পরিস্থিতি দেখে পুলিশ ও পরিবর্তিত অবস্থা গ্রহণ করতে রাজি হল। আমাদের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী দ্বিতীয় দিন মাওলানা সাঈদীর তাফসীর শুরু হওয়ার আগে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি দাওয়াতুল ইসলামের পরিচিতি ও এক বছরের রিপোর্ট দিয়ে বক্তৃতা করলাম। তারপর সাঈদী সাহেব আরম্ভ করলেন কোরআনের তাফসীর। এক সুরেলা মোহময় ভরাট কণ্ঠে কোরআনে কারিমের আয়াতের মধুময় আবৃতি, ইসলামি কবিদের কবিতার ছত্র, নবী, রাসুল ও আল্লাহর অলিদের জীবনের গল্প দিয়ে দক্ষ চিকিৎসকের মত মানুষের জীবনের পেঁচিয়ে যাওয়া জট গুলো খুলে দিয়ে শ্রোতাদের মনের গহীনে চাপা পড়ে থাকে ঈমানের স্ফুলিঙ্গগুলোকে যেন নতুন করে জাগিয়ে তুললেন। তারপর সকলের চোখে অশ্রুর ঢল নামিয়ে দীর্ঘ মোনাজাতে আল্লাহপ্রেমী মানুষদের সমর্পিত আত্মার বেদনা বিধুর করুণ আর্তিগুলোকে রহমানুর রহীমের দরবারে নিবেদন করলেন। শেষ দিনও হল একই দৃশের পুনরাবৃত্তি।

এই সফর দিয়েই শুভ সূচনা হল বাংলাদেশের বাইরের দুনিয়ায় আল কোরআনের মহান বাণী পৌঁছে দেওয়ার মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর অভিযানের। ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাংলাভাষী মানুষেরা তাঁর ওয়াজের জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতো। ১৯৭৯ থেকে, দু-এক বছর আমরা সাঈদী সাহেবকে যুক্তরাজ্য সফরে আনতে লাগলাম। বিভিন্ন বছরে তাঁর সাথে মাওলানা কামালুদ্দিন জাফরী, মাওলানা লুৎফুর রহমান, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সহ আরও অনেক খ্যাতিমান আলেমরা সফরে এসেছেন। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর ছাড়াও লন্ডনকে কেন্দ্র করে তিনি ইউরোপের অন্যান্য দেশে তাফসীর মাহফিল করেছেন। সাংগঠনিক দায়িত্বের কারণে ইউকের কোনো কোনো শহরে আমাকেও তাঁর সাথে এক সঙ্গেও সফর করতে হয়েছে, যা আমাদের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। প্রথম দু-এক বছর সাঈদী সাহেবকে সংগঠনের অফিস সংলগ্ন কোন কামরা অথবা কোন কর্মীর মেহমান হিসাবে রাখা হত। প্রতিদিনই কর্মী, সমর্থক অথবা তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের বাসায়ে তাঁর খাওয়ার দাওয়াত থাকত। এমনি এক ভক্ত ১৯৮, এসটেপনী ওয়ের আব্দুল মান্নান সাহেবের সাথে মাওলানার ঘনিষ্ঠতা এতো বেড়ে গেল যে, তখন থেকে লন্ডনে মাওলানার থাকার জায়গার জন্য আমাদের আর চিন্তা করতে হল না। পরবর্তী সকল সফরে আব্দুল মান্নান সাহেবই হয়ে গেলেন মাওলানার স্থায়ী মেজবান। সংগঠনে আব্দুল মান্নান বেশ কয়েকজন থাকায় তাঁকে সনাক্ত করা হতো "সাঈদী মান্নান" হিসাবে। সেই থেকে এই নামেই তিনি পরিচিত হয়ে উঠলেন। এরপর কয়েক সফরে মাওলানার ছেলেরাও তাঁর সাথে এসে মান্নান সাহেবের ঘরে অবস্থান করেছিলেন। বিভিন্ন শহর থেকে মাওলানার ভক্তরা তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন সেখানেই।

ব্যক্তিগত জীবনে মাওলানা সাঈদী অত্যন্ত সাফসুতরো পরিপাটি থাকতে পছন্দ করতেন। সফরের শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁকে কখনও কেউ ময়লা অপরিষ্কার কাপড় চোপড়ে দেখেছে এমনটা কেউ বলতে পারবে না। পরিচিত সকলের কাছে তিনি ছিলেন নিতান্ত হাসি-খুশি, বন্ধু-বৎসল, উদারমনা মানুষ। ওয়াজের ভিতর যেমন তেমনি ঘরোয়া আলোচনায় ও তিনি মজাদার গল্প-কথায় হাসাতেন সবাইকে। মাওলানা কামালুদ্দিন জাফরী ও তিনি একত্র হলে তো কে কার চেয়ে বেশি হাসাতে পারে তারা একরকম প্রতিযোগিতাই লেগে যেত। একবার আমার ডাউন হীলিস পার্ক রোডের বাসায় মাওলানা সাঈদী ও মাওলানা জাফরী সাহেবকে রাতের খাবারের দাওয়াত করেছিলাম। সাড়ে সাতটার দিকে খেতে ডাকলে জাফরি সাহেব অনুযোগ করে বললেন, মুঈন ভাই, চার দিকে এখনো দুপুরের মত রোদ, এখন কী করে রাতের খাওয়ার খাব? সাঈদী সাহেব তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়ে বললেন 'কোন অসুবিধা নাই জানালা গুলোর পর্দা টেনে দিলেই রোদ আর দেখা যাবে না।'

প্রায় প্রতি বছর সফর করার ফলে বাংলাদেশের মত বিলেতেও মাওলানা সাঈদী হয়ে উঠলেন এক জনপ্রিয় ওয়ায়েজ। ছোট বড়ো সব শহর থেকেই তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একরকম প্রতিযোগিতা লেগে যেত। আর সেসব মাহফিলে ভেঙে পড়ত শ্রোতাদের মিছিল। সব বয়সের, সকল শ্রেণির মানুষেরা দল বেধে হাজির হত মাওলানা সাঈদীর মুখে কোরআনের হৃদয় স্পর্শী তাফসীর শোনার জন্য। এদের মধ্যে পরহেজগার মুসাল্লিরাও যেমন ছিল, তেমনই ছিল বহু যুবকও মধ্যবয়সী বাঙালি মুসলমানরা, যাদের অন্তরের গহীনে ঈমানের দীপ একটু একটু করে জ্বললেও এতদিনে ভোগবাদী বিলাতের চৌরাস্তায় তা প্রায় হারিয়ে যাওয়ার পথে। দক্ষ চিকিৎসকের মত কোরআনের অমর যাদুর ছোঁয়ায় আবারও তা জ্বালিয়ে তুলতেন মাওলানা সাঈদী। মোহমুগ্ধ এসব মানুষেরা হারানো ঈমান ফিরে পাওয়ার আনন্দে শামিল হতো মাওলানার ভক্তদের দলে। পীর সাহেবদের মত সাঈদী সাহেব যদি মুরিদ করতেন তবে এরা সবাই বিনা দ্বিধায় তাঁর হাতে বায়াত করতো। জনপ্রিয়তার এই প্লাবন এক শ্রেণির মানুষকে ঈর্ষান্বিত করতো নিঃসন্দেহে। কিন্তু মাওলানা সাঈদীর বিরোধিতা করার কোন উছিলা তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। শেষে ১৯৯৯ সালে ওল্ডহ্যামের এক বক্তৃতায় সিলেট বাসীদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার নিদর্শন হিসাবে করা একটা মন্তব্যের অপব্যাখ্যা করে তারা কিছুটা হৈ চৈ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করেছিল। প্রায় দু বছর পর্যন্ত কোনো কোনো শহরে মাওলানা সাঈদীর মাহফিলের জায়গার সামনে প্রতিবাদী হল্লা চিল্লাও কিছু কিছু করেছিল বটে তবে এতে তেমন কোনো ফল হয়নি। উভয় বছরেই সকল শহরে পরিকল্পিত মাহফিল সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের মতই ইংল্যান্ড ও সারা ইউরোপে মাওলানা সাঈদীর আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তার প্রমাণ মিলেছে তাঁর ইন্তেকালের পরেও। আল্লাহর দুশমনরা যুগে যুগে যেমন আল্লাহর প্রিয় নিরপরাধ, মাসুম বান্দাহদের জেল-জুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার বানিয়ে তিলে তিলে মেরেছে, সেই ব্যবহার তারা কোরআনের এই মজলুম পাখির সাথে করেছে বাংলাদেশেও। কিন্তু অত্যাচারীদের নিষেধ-ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে হাজার-লক্ষ মুসলমান ঠিক বাংলাদেশের মতই বিলেত ও ইউরোপের শহরে শহরে মাওলানা সাঈদীর জন্য আয়োজন করেছে গায়েবানা জানাজার আর শোক সভার। 'জয় হয়েছে কোরআনের, জয় হয়েছে সাঈদীর, আর হেরে গেছে জালেমের দল'।

লেখক: বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সমাজ সেবক।

আদর্শ স্থানীয় সফল জীবন গঠনে

আল্লামা সাঈদী

এক অনন্য প্রেরণার বাতিঘর

হামিদ হোসাইন আজাদ

কোটি কোটি মানুষের নয়নমনি, "কোরআনের পাখি" নামে খ্যাত প্রখ্যাত মুফাসসিরে কোরআন, আপোষহীন জননেতা, সত্য সন্ধানী কোটি মানুষের প্রেরণার উৎস আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন গত ১৪ই আগস্ট ২০২৩। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আমরা দেখেছি কীভাবে দেশে বিদেশে, বিশ্বময়, কোটি কোটি মানুষ তাঁর মৃত্যুত শোকে মুহ্যমান হয়েছেন, কেঁদেছেন। অনেকে মুর্চা গিয়েছেন। কেউ কেউ শোকের ভয়াবহতা সইতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। এ হচ্ছে মাওলানার প্রতি সর্বস্তরের মানুষের আকাশচুম্বী ভালোবাসার এক বিরল দৃষ্টান্ত এবং তাঁর নিষ্কলুস চরিত্রের বাস্তব সাক্ষী। তাঁর মাগফিরাতের জন্য দুনিয়া জুড়ে ভাষা, গোত্র ও বর্ণ নির্বশেষে কোটি কোটি মানুষের প্রাণ ভরা দোয়া এবং হাজারো গায়েবানা জানাজা তাঁর প্রতি মহান রব্বের সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। হে আমাদের রব! আপনার তরে নিবেদিত, শুধুমাত্র আপনার প্রতি ঈমানের উপর আপোষহীনভাবে টিকে থ াকার অপরাধে নির্যাতিত আপনার এ প্রিয় বান্দাহটিকে আপনার জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে বরণ করে নিন এবং তাঁর মজলুম সন্তান-সন্ততিদের আপনার নিরাপত্তার চাদরে আচ্ছাদিত করে রাখুন, আমিন।

উস্তাদ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (শহীদ) এর উপর এক পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ লেখার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। মহাসাগরসম একটি জীবনের উপর এক পৃষ্ঠায় হক আদায় করে কিছু লিখা সত্যিই বড় চ্যালেঞ্জিং। তবুও চেষ্টা করছি। কেননা যদি এ মহান জীবনের একটি উদাহরণও কাউকে দ্বীনের পথে আসতে এবং থাকতে প্রেরণা যোগায় আর এর বদৌলতে মহান প্রভু যদি সামান্যটুকুও জাজাহ দেন তবে আমার লিখাটি সার্থক হবে। মূলতঃ এ প্রত্যাশা নিয়েই গভীররাতের পবিত্র সময়ে আকাশ ও জমিনের মাঝখানে প্রায় চল্লিশ হাজার ফুট উপরে বিমানে বসে এ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটি লিখতে প্রয়াসী হলাম।

একজন মানুষকে চিনার জন্য রাসুল (সা.) যে কয়টি মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাঁর সব কটির কষ্টিপাথরে মাওলানাকে যাচাই-বাছাই করার সুযোগ আল্লাহ এ অদমকে দিয়েছিলেন। তাঁকে খুব কাছে থেকে, ভাল অবস্থায়, খারাপ অবস্থায়, সুখের অবস্থায়, দুঃখের অবস্থায়, সহজ ময়দানে, কঠিন ময়দানে, সফরসঙ্গী হিসেবে, খেলার সাথী হিসেবে, বক্তা হিসেবে, শ্রোতা হিসাবে, নেতা হিসেবে, কর্মী হিসেবে, নির্দেশ দাতা হিসেবে, নির্দেশ পালন কারী হিসেবে, পিতা হিসেবে, ভাই হিসেবে, দাতা হিসেবে, গ্রহীতা হিসেবে, হোস্ট হিসেবে , মেহমান হিসেবে, সত্যের সাক্ষী হিসেবে এবং সত্যের মোহাফেজ হিসেবে তাঁকে দেখার ও বুঝার সুযোগ হয়েছিল। আমি অকপটে সাক্ষী দিতে পারি সকল অবস্থায় তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি নিবেদিত এক সন্তুষ্ট চিত্ত বান্দাহ এবং এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

আল্লামা সাঈদীর মধ্যে একজন সফল জান্নাতি মানুষের নিম্নোক্ত সকল বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান ছিল।

১. ঈমানের দিক থেকে তিনি ছিলেন সংশয়মুক্ত এবং সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারীদেরই একজন যাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে ফেরেশতারা নিরাপত্তাপূর্ণ বন্ধুত্বের ওয়াদা করেছে (সুরা হা-মীম-আস-সাজদা ৪১)। তৌহিদের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন ও অকুতোভয়। সংসদ সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদে ঢুকেই দীর্ঘদিনের প্রচলিত তৌহিদ পরিপন্থী প্রথা "মাথা নথ করে সংসদে প্রবেশে" এর নীতি রহিতকরণে তাঁর ঐতিহাসিক সাফল্য এক আল্লাহর উলুহিয়াত প্রতিষ্ঠায় তাঁর দৃঢ় চিত্ততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

২. তিনি নামাজের ব্যাপারে শুধু যত্নবানই ছিলেন না বরং নামাজ কেন্দ্রীক জিন্দেগীর মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাজউদ্দীন হাসপাতালে

জীবনের শেষ মুহূর্তে বন্দি ও অসুস্থ অবস্থায়ও কর্তব্যরত ডাক্তারসহ উপস্থিত সকলের প্রতি নামাজের আহ্বান ও নসিহা তাঁর এ গুণের জীবন্ত সাক্ষী।

৩. তিনি কখনো বেহুদা কথা বলতেন না এবং অকাজে সময় নষ্ট করতেন না।

৪. তিনি সবসময় পূত-পবিত্র থাকতেন এবং সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবনের মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

৫. তিনি সবসময় আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে শালীন জীবন যাপন করতেন এবং অশালীনতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন।

৬. তিনি তাঁর কমিটমেন্ট রক্ষায় সদা সতর্ক থাকতেন, এক্ষেত্রে কোন ত্রুটি বুঝতে পারলে সাথে সাথে তওবা করে আপন ওয়াদা পূরণে সচেষ্ট হতেন।

৭. আমানত সংরক্ষণে তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন।

রাহমানুর রহিম আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে সেসব গুণের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ সার্টিফিকেট দিয়েছেন (সূত্র: সুরা ফোরকান), আল্লামা সাঈদী সেসব গুণের সযত্ন অনুসারী ও সংরক্ষক ছিলেন।

১. এত বড়ো মাপের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোন অহংকার ছিল না। বিনয় ও ভদ্রতা ছিল তাঁর চরিত্রের উজ্জলতম দিক।

২. তিনি কারো সাথে কখনও ঝগড়া এবং অহেতুক বিতর্ক করতেন না। শত্রুর মাঝেও তিনি বন্ধুত্ব খোঁজার চেষ্টা করতেন। জীবনের ইতিলগ্নে তাঁর পাহারায় নিযুক্ত পুলিশের জোয়ানদের ব্যাপারে তাঁর কালজয়ী হাসিমাখা উদার বক্তব্য তাঁরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩. তিনি সুখে-দুঃখে সবসময় সুযোগ পেলেই তাঁর রবের কাছে সেজদায় অবনত হতেন।

৪. জাহান্নামের ভয় সবসময় তাঁর মনে জাগরুক থাকত এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য প্রায়শই আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতেন।

৫. বিলাসী জীবনের সকল সুযোগ হাতের মুঠোয় পাওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে কখনও বিলাসীতায় মত্ত করেননি। তিনি নিজের ক্ষেত্রে সবসময় পরিমিত ব্যয়ে অভ্যস্ত ছিলেন আর অন্যদের, বিশেষতঃ অভাবগ্রস্তদের, কল্যাণে উদারহস্ত ছিলেন।

৬. তিনি মিথ্যাকে ঘৃণা করতেন, কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দেননি। একবার আদালতে নির্বাচন সংক্রান্ত এক মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বিচারককে হতবাক করে নিজের স্বার্থের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে বিচারক অবাক বিস্ময়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন আপনি নিজের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন কেন। জবাবে তিনি বলেন, নিজের বিপক্ষে হলেও আমাকে তো সত্য কথা বলতে হবে।

৭. তিনি নিজের সীমাবদ্ধতা এবং তওবার মর্যাদা সম্পর্কে সদা সচেতন ছিলেন। কেউ তাঁর কোন ভুল ধরে দিলে তাঁর প্রতি তিনি অসাধারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, তাকে কপালে চুমু দিয়ে আদর করতেন এবং সাথে সাথে খুব উঁচু মানের তওবা করতেন। তাঁর সাথে এমন অসাধারণ অভিজ্ঞতা সরাসরি আমারও হয়েছে যা আজও আমাকে প্রেরণা যোগায়।

৮. তিনি বাবা মা'র প্রতি ছিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার মত শ্রদ্ধাশীল আর তাঁর সন্তানদের প্রতি ছিলেন একজন জান্নাতি বাবার মত দয়ালু ও প্রেমময়। স্ত্রী ও পরিবারের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল আদর্শস্থানীয়।

৯. সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর সাহস ছিল অপরাজেয়। শাহাদতের তামান্না নিয়েই তিনি আমৃত্যু সত্যের সংগ্রামে সিংহের মত অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

১০. ধৈর্য ধারণে তিনি এবং তাঁর সাথীরা ছিলেন এ যুগের সেরা উদাহরণ যারা হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন কিন্তু অসত্যের কাছে মাথা নত করেননি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরকালের অনন্ত জীবনে আল্লামা সাঈদী এবং তাঁর ঘনিষ্ট সাথীরা তাঁদের মধ্যেই শীর্ষস্থানীয় একেকজন হবেন। যাদেরকে আল্লাহ এ বলে সংবর্ধনা দিবেন, "হে আমার প্রশান্ত চিত্ত বান্দাহগণ, তোমরা তোমাদের সেই রবের কাছে আস যিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তোমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলে এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সুরা আল-ফজর ৮৯:২৬-২৯)

তরুণ প্রজন্মের যারা রোল মডেল খুঁজতে হন্যে হয়ে ঘুরছে, ইহ এবং পরকালে সফল জীবন গঠনে আল্লামা সাঈদীকে তারা রোল মডেল হিসেবে বেছে নিলে তাঁদের জীবন সার্থক হবে, ইনশাআল্লাহ। আবাল-বৃদ্ধ সকলের জীবনে আল্লামা সাঈদী একটি প্রেরণার বাতিঘর।

লেখক: জেনারেল সেক্রেটারী, মুসলিস কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

ইসলামী জাগরণে মাওলানা সাঈদীর অবদান

শায়খ আবদুল কাইয়ুম

ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ছিলেন বাংলার জমিনে ইসলামের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ। বাংলা ভাষী লাখো কোটি মানুষ দ্বীনের পথে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে বহু নাস্তিক, দ্বীন বিরোধী লোক, দ্বীনদার হয়েছেন। অনেক অমুসলিম ও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য শুনে। উচ্চ শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত, শিক্ষা বঞ্চিত, ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, আবাল বৃদ্ধবণিতা, সকল শ্রেণির ও পেশার মানুষ দ্বীনের আলোকে নিজেদেরকে আলোকিত করেছেন তাঁর বক্তব্য শুনে। অনেক অমুসলিম ইসলাম কবুল করেছেন তাঁর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে।

আমি নিজে দেশের থাকাবস্থায় কয়েকবার তাঁর বক্তব্য শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯৯২ সন থেকে বিলেতে আসা অবধি দু'দশকেরও বেশী সময় ধরে ইস্ট লন্ডন মসজিদের মিম্বারে তাঁকে উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছি। পাশে বসে তাঁর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য শুনে অশ্রুসিক্ত হয়েছি প্রতিবার। রাসুলুল্লাহ (সা.) ঠিকই বলেছেন, “কিছু বক্তব্যের রয়েছে যাদুকরী প্রভাব”। মাওলানা সাঈদী ছিলেন তার বাস্তব উদাহরণ।

তাঁর কর্মময় জীবন থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। তিনি অনবরত জ্ঞান চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। সীমাবদ্ধ সিলেবাস পড়ে কামিল পাশ করে জ্ঞান চর্চা করে থামিয়ে দেননি। যা অনেকেই করে থাকেন। তাঁর বাড়িতে তিনি গড়ে তুলেছিলন বিরাট গ্রন্থাগার। সেখানে তিনি জ্ঞান আহরণ করতেন সময় পেলেই। ফলে, তাঁর প্রথম জীবনের ওয়াজের তুলনায় পরবর্তী জীবনের ওয়াজগুলো হয়েছে আরও তথ্যসমৃদ্ধ এবং দলীলের দিক থেকে আরও সহীহ। এক্ষেত্রে মাওলানা সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী হাফিযাহুল্লাহর সহচার্য্যকেও তিনি সমধিক গুরুত্ব দিতেন। বহু বিষয়ে তিনি জাফরী সাহেবের পরামর্শ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন।

মাওলানা সাঈদী সাহেবের অবদান তাঁর শ্রোতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধা থাকেনি। তাঁর অন্যতম অবদান হচ্ছে, আজগুবি কিসসা কাহিনী ভিত্তিক ওয়াজের ধারার পরিবর্তে কুরআন, হাদীসের সহীহ জ্ঞান ভিত্তিক ধারার প্রবর্তন। যা বাংলাদেশের পুরো ওয়াজের ধারার মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়। আমরা আশা করছি সাদাকা জারিয়া বা ফায়দা দানকারী ইলমের এ খেদমতের প্রতিদান তিনি কবরে শুয়ে পেতে থাকবেন বহুদিন ধরে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সমগ্র খেদমত, ত্যাগ ও কুরবানি কবুল করুন। জান্নাতে তঁাকে উচ্চ মাক্বাম নসীব করুন। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার এবং অগণিত শুভাকাঙ্খীদেরকে ছবর ও শান্তনা দান করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের খেদমতে এগিয়ে আসার তাওফীক দিন। আমিন।

লেখক : ইসলামী স্কলার, ইমাম ও খতিব- ইষ্ট লন্ডন মসজিদ।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) বিশ্বময় আলোড়ন সৃষ্টিকারী আল কোরআনের মুফাসসির

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

১৯৪০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি, পিরোজপুরের এক সাধারণ মুসলিম পরিবারে যে শিশু দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জন্ম নিয়েছিলো, আজ ৮৪ বছর বয়সে ১৪ই আগস্ট ২০২৩ এ কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৩টি বছর তীল তীল করে নির্যাতন, বঞ্চনার বিষাক্ত তীরে ক্ষত বিক্ষত হয়ে অবশেষে সালাম জানিয়ে হাসি মুখে, বেদনার সমুদ্রে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা সৃষ্টি করে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ((রহ.)) শাহাদাতের মৃত্যুহীন জীবনে পদার্পণ করলেন, আর ভয়াল কম্পনে বিশ্বহলো কম্পমান; আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়ে বলেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

“সাবধান, আল্লাহর রাহে যারা জীবন উৎসর্গ করেছে, তাদেরকে তোমরা মৃত ভেবো না, তারা শুধু জীবিতই নয়, বরং আহার করছে শহীদদের জন্যে রাখা জান্নাতের রেজেক। তাদের জন্যে শোকের মাতম করো না, আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে তারা হয়েছে পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত। তোমরা আজও যারা শাহাদাতের মিছিলে অপেক্ষমান, লক্ষ্যেরপানে তোমরা দৃঢ় পদে হও আগুয়ান, শাহাদাতের পথে চিন্তার ও ভয়ের কোন কারণ নেই।” (সুরা আল ইমরান, ৩ : ১৬৯)

সুপ্রিয় পাঠক, আল্লামা সাঈদী ((রহ.)) এর জীবনী লিখতে আমি কলম হাতে নেইনি; সে বিস্তৃত বিষয় লিখার সাধ্য, সামর্থ্য, স্বাস্থ্য ও সময় কোনোটাই আমার নেই। ‘মাওলানা’ আমাকে এতো ভালোবাসতেন, আমার বলা, লিখা, আমার কোরআন পড়া তাঁর এতই পছন্দ যে, তিনি আমার অগোচরে পৃথিবীর মানব মণ্ডলীর নিকট তা পৌঁছে দিয়েছেন। যা আমার মনে হতো সীমার চেয়ে অনেক বেশি; আমি লজ্জা অনুভব করি, অনেক ভাইয়ের মধ্যে হিংসারও উদ্রেক হতো; কিন্তু আমার জন্যে প্রাণ খুলে যেভাবে দোয়া করেছেন, আমি বছরের পর বছর উনার জন্য দোয়াই করে যাচ্ছি সে ভাবে, যে ভাবে আমার মা-বাবার জন্যে দোয়া করি ও করে যাবো আমরণ, ইনশাআল্লাহ।

আজ আমি তাঁর জীবনের ওপর একটি সত্যনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ ও দ্বীনের দায়ীদের জীবন ঘনিষ্ঠ, কিছু বিষয় সামনে রেখে একটি প্রবন্ধ রচনা করতে চাই; ‘ওয়ামা তাওফিকে ইল্লা বিল্লাহ’।

লিখার জন্যে লিখা, বলার জন্যে বলা মুমিনদের মধ্যে কেউ মোবাহ মনে করতে পারে, আমি বৈধই মনে করি না। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন এসকল কর্ম যদি ইবাদাত না হয়, তবে আল্লাহর কঠিন জিজ্ঞাসার আওতায় সকল কিছু হায়াতের অপচয় হিসাবে বিবেচিত হবে। এবিষয়ে উস্তাদ মওদূদী (রহ.) এর উক্তি অনুভূতিকে আমার বেশি নাড়া দেয়, মাওলানা মওদূদী ((রহ.)) বলেন, “আমি নিছক বলার জন্য কিছু বলেনি, বরং না বলার জন্যে আল্লাহকে ভয় করেছি”। আমাদের জীবনের প্রতিটি বুলি ও লিখনীর প্রতিটি আচড়কে পূণ্য ময় করো, হে প্রভু।

জুলুমের শিকার হয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ‘র’ এর ষড়যন্ত্র ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত যুদ্ধাপরাধ মামলায় রাজধানীর কেন্দ্রীয় কারাগারে কড়া পাহারায়, কনডেম সেলে বিশ্বনন্দিত আলেমে দ্বীন, দুনিয়া কাঁপানো মুফাসসিরে কোরআন, তাওহীদি জনতার নয়নমণি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর, বারংবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য, তুখোড় পার্লামেন্টেরিয়ান, দেশ ও জাতীর অহংকার, ‘আল্লামা সাঈদী’কে এক যুগের বেশি সময় ধরে ফাঁসির সেলে, সকল মানবাধিকার হতে বঞ্চিত রেখে আওয়ামী হায়েনারা যে অকথ্য নির্যাতন, সীমাহীন যুলুম করেছে এটি ইতিহাসের এক নির্মম ট্রাজেডী, এক লোমহর্ষক বিশ্বকোষ।

বন্দি জীবনের সীমাহীন যাতনা, কষ্ট ও অপমান, হাতকড়া, পায়ে বেড়ি, শিকল পরা, জীর্ণ ও সাজা প্রাপ্তদের হীন পোশাক পরিহিত, হার্টে পাঁচটি রিং লাগানো, প্রায় অর্ধশত বছরের ডায়বেটিস সহ বহু জটিল রোগে আক্রান্ত, অশতিপর বৃদ্ধ, চলাফেলা করতে অক্ষম, যাতনার পর যাতনার নির্মম আঘাত, প্রিয়জন হারার অশ্রু, নিঃসঙ্গতার হাহাকার কোনো কিছুই তাকে হতাশ করতে পারেনি, ভেঙে দিতে পারেনি তাঁর অদম্য মনোবল, বরং আল্লাহর ওপর তাঁর দৃঢ় ঈমানের ভিতকে আরও করেছে বলিয়ান, মহিয়ান ও গরিয়ান। ইসলামী আন্দোলন ছেড়ে দেওয়া ও আপোষের প্রস্তাবকে

তিনি সেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যে ভাবে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে বাণীয়ে জামায়াত আল্লামা মওদূদী (রহ.) লাহোরের কারাগারের Deth cell এ যখন তাঁর সামনে আসলো 'Mercy petition', বলা হলো, স্বাক্ষর করতে তিনি বলেছিলেন, "মাই জুতিয়াঁকো পোঁছো" "আমার জুতাকে জিজ্ঞেস করো ক্ষমা চাইবে কিনা" জালেমেরা জানে না, এই সাঈদী (রহ.) ফাঁসির মঞ্চ বিজয়ী উস্তাদ মওদূদীর (রহ.) যোগ্য শিষ্য ও ছাত্র।

আমার আল্লামা সাঈদী (রহ.) এর নির্যাতিত, গৌরব দীপ্ত জীবনকে হিংসা করতে ইচ্ছে করে; আমাকে আব্বাসীয় খলিফাদের কারাগারে বন্দি, হাতে ও কোমরে শিকল পরা অবস্থায় ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল (রহ.) কে মনে করিয়ে দেয়। তাঁকে কোড়া মারা হচ্ছিলো, প্রতিটি আঘাতে রক্ত ঝরছিলো। ইমাম বেহুশ হওয়ার পরও কোড়া মারা হয়েছিলো। আল্লামা ইবনে জওযী (রহ.) হাফেজ রত্তীর বর্ণনায় বলেন– 'ইমাম আহম্মদ (রহ.) বন্দি হলো, তখন আলেমদের একটি দল তাঁর কাছে বললো, 'জুলুমের ভয়ে সত্য গোপন করা' অবস্থার প্রেক্ষিতে অনুমতি আছে এটি তো প্রমাণিত; জবাবে ইমাম আহম্মদ (রহ.) সে হাদিস শুনলেন, 'রাসূল (সা.) খাব্বাবকে বলে ছিলেন, তোমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছিলো– তাদের মাথার ওপর করাত চালানো হয়েছে, তাদের হাড্ডি হতে লোহার চিরুনী দিয়ে গোশত তুলে ফেলা হয়েছে, কিন্তু তারা ঈমানের সাথে আপোষ করেনি'। (বুখারি)। আবু আব্বাস বলেন, আমরা এ জবাব শুনে চলে এসেছিলাম।

ইমামা আহম্মদ নিজে বলেছেন, "বন্দি অবস্থায় আমাকে এমন ভাবে মারা হয়েছে যে, সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেছে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছি। যখন জ্ঞান ফিরে এসেছে, তখন কে একজন পানি নিয়ে এসেছে, আমি বললাম না, আমি রোযাদার, রোযা ভাঙবো না" (চার ইমামের জীবন কথা' মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান।)

বাংলাদেশের কিছু আলেমে দ্বীন কীভাবে বলে, 'সাঈদী সাহেব অপরাধ না করলে জেলে কেন থাকবে? এর জবাব কী ইমাম আহম্মদ (রহ.) এর কারা জীবন যথেষ্ট নয়? যিনি 'সতেরো লাখ' হাদিসের মুহাদ্দীস; ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারীর প্রিয় উস্তাদ। এ বিষয়ে রাসূল (সা.) এর হাদিস আমাদেরকে স্পষ্ট ভাবে বলছে–

قالَ رسولُ الله صلّى الله عَليه وَسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء, ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل

নবী (সা.) বলেন: "মানব ইতিহাসে কঠিনতম ঈমানী পরীক্ষা এসেছে নবীদের ওপর, অতঃপর সাহাবীদের ওপর যারা প্রথম যুগের নেককার, এরপর তাদের পরবর্তী এবং পরবতীদের ওপর এ পরীক্ষা চলবে"। (বুখারী)

ইসলামী পুনর্জাগরনের এ অকুতোভয় দায়ী ইলাল্লাহকে ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী তথা কথিত 'war traibunal' তথা যুদ্ধাপরাধ মামলায় 'বিষুরঞ্জন বালী' কে হত্যা ও নারী ধর্ষণ এর সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দিয়েছিলো; এর প্রতিবাদে ১৬০জনের বেশি মানুষ লাল-সবুজের দেশে একদিনে রাজপথে জীবন দিয়েছে, নিহতদের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ২৩০ জনে পৌঁছে। আর পুলিশের হাতে আহত ও গুলিবিদ্ধদের সংখ্যা যে কতো এবং সংঘাতের বিস্তারিত বিবরণী তৎকালীন সময়ের পত্রিকার পাতায় কালো অক্ষরে এখনও রয়েছে এবং থাকবে 'আওয়ামী ও হাসিনা' দুঃশাসনের ঐতিহাসিক দলীল হয়ে।

অভিশপ্ত এ যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল; এর কলঙ্কিত ও ইতর বিচারকবৃন্দ ও তৎকালীন সময়ের অমানুষের সন্তান, প্রধান বিচারপতি 'মিঃ এসকে সিনহা যে হাসিনার লাথি খেয়ে পলাতক হয়ে কানাডায় লুকিয়ে আছে'। এদের নিয়ে একটি বাক্য লিখার ইচ্ছা আমার নেই। নতুন প্রজন্মদের কেউ জানতে চাইলে প্রফেসর তাজ হাসেমী, সাহসী ও নির্যাতিত সাংবাদিক মাহমুদুর রহমান, আওয়ামী আতঙ্ক ডা. পিনাকী ভট্টাচার্য্য প্রমুখদের বক্তব্য, লিখনী ও বিদেশীদের অনেক কিতাব রয়েছে। আমি এ বিষয়ে সাঈদী সাহেবের পক্ষে যিনি আইনী যুদ্ধে দুঃসাহসী ভাবে লড়েছেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক ও বিএনপির সাহসী সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার বক্তব্য হতে বলবো সাঈদী সাহেবের মামলার রায় বিচারের নামে কী অবিচার ও যুলুম ছিলো।

এক: '৭১ এর যুদ্ধের সময়ে নিহত বিষুরঞ্জন বালীকে হত্যার দায়ে

আল্লামা সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, সে মামলায় তার ভাই সুখরঞ্জন বালীকে সরকারি সাক্ষী হিসাবে আদালতে নেওয়া হয়; রহস্য জনক ভাবে মামলার সাক্ষ্য দেওয়ার আগে সুখরঞ্জন বালী 'আমাদেরকে বললো': আমার ভাইয়ের হত্যার সাথে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব কোনোভাবে জড়িত নন; তিনি আমার ভাইকে হত্যা করেননি। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, "আমরা সাক্ষীর বক্তব্য গোপনে Record করে রাখি। সরকার পক্ষ এটি জেনে ফেলে ও পুলিশ সুখরঞ্জন বালীকে আদালত হতে গায়েব করে ফেলে বহুদিন পরে তার সন্ধান পাওয়া যায় সে ভারতের 'কলিকাতায়' কারাগারে"। এখনও সুখরঞ্জন বালী জীবিত আছে পিরোজপুরে তার বাড়িতে। সম্প্রতি তার বক্তব্য মিডিয়া আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

দুই: সাঈদী সাহেবের শাহাদাতের পর ব্যারিস্টার রুমিন ২০১২ এর 'Uk Economist' পত্রিকা সাঈদী সাহেবের বিচারের নামে যে অবিচার হয়েছিলো প্রসঙ্গে 'স্কাইপ কেলেংকারী' কে মিডিয়ার মাধ্যমে জাতীকে পুনঃঅবহিত করেন আমি তাকেও ধন্যবাদ জানাই। ইকোনমিস্টের সে 'Article' সারা পৃথিবীর সংবাদ পত্রের পাতায় লাল অক্ষরে ছাপা হলেও তখনকার বাংলাদেশের অন্ধবধির সাংবাদিকেরা চোখে ঠুলি ও কানে তুলো দিয়েছিলো। আমারদেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদর রহমান সে খবর ছাপার কারণে তিনি অকথ্য নির্যাতন ভোগ করে আজ দেশ ছাড়া। পুরো যুদ্ধাপরাধ ট্রায়ালের ভয়াবহ অনিয়মের প্রমাণ এ আর্টিকেলে রয়েছে, যে কেউ আজ গুগুল চার্জ করে দেখে নিতে পারে। ইকোনমিস্ট পত্রিকা Report করছে, সাঈদী সাহেবের মামলার সাক্ষী গ্রহণ চলছে, যা ২০১৩ এর প্রায় জানুয়ারি পর্যন্ত চলে, এর মধ্যে তিনমাস পূর্বে রায় ইমেইল মারফত লিখিতভাবে চলে আসে ট্রাইবুনালের অতি সম্মানিত! বিচারকদের কাছে। এ ধরনের 'ফরমায়েশি' রায় বাংলাদেশসহ সকল দেশের আইনে ভয়ানক অপরাধ।

আল্লামা সাঈদীর ট্রায়াল যখন চলতেছে তখন ব্রাসেলস প্রবাসী "বাংলাদেশ সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাটিজের" ডিরেক্টর মিঃ জিয়াউদ্দিন পূর্বেই রায় লিখে পাঠিয়ে ছিলেন। Economist হতে Copy: lastly. In the case of Sayeedi an email from Ziauddin to Mr. Nizamul refers to a shared 'google document call'- Sayeedi judgement it was made of October, 14, 2012.

প্রবন্ধকে সংক্ষিপ্ত করার অনুরোধ, অন্যদিকে প্রায় একমাস আমি অনেকটাই শয্যাশয়ী 'আথ্রাইটিসে' আক্রান্ত এ শরীর নিয়ে আমি যখন লিখছি রাত দুইটা, ইংল্যান্ডে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, আমার মন বলছে– "যার জীবন নিয়ে প্রবন্ধ লিখছো, সেই কোরআনের দায়ী হাজারো অসুস্থতা নিয়ে, অশতীপর বৃদ্ধ হয়েও দীর্ঘ তেরোটি বছর 'ডেথ সেলে' নির্ঘুম রাত কীভাবে কাটলো; প্রভু, তাকে কোরআন বুকে জান্নাতি বিছনায় কবরে ঘুমাতে দাও, আমিন।

এবার আমি বলতে চাই, এক অজোগাঁয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯৪০ সালে যার জন্ম, দৈন্যতায় বেড়ে উঠা, শর্ষিনা মাদ্রাসায় কাি-মল পড়া লাখ মৌলভীদের একজন অখ্যাত, অজ্ঞাত দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কীভাবে ইলমে দ্বীন ও আজকের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে এ পাণ্ডিত্য হাসিল করেন, কীভাবে হয়ে উঠেন দুনিয়া কাঁপানো ও সাড়া জাগানো এক মুফাসসিরে কোরআন, তাফসীরুল কোরআনের পথিকৃত। পৃথিবীর অর্ধশত কোটি বাংলাভাষীদের হৃদয় কন্দরে তাঁর কণ্ঠে কোরআনের সুর লহরী মুমিনদের ঘুমন্ত ঈমানকে কীভাবে জগিয়ে দিলো, তারা বলে উঠলো, 'একি সুর, কি যাদু'

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا

"জিনেরা যেমন বলেছিলো, এতো আশ্চর্য্য এক কোরআন"। জ্বিন ৭২:১ ;

আর শতশত উম্মতে মুহাম্মদী (সা.) যারা কুফরীর অন্ধকারে, তাদের হৃদয় সাঈদী সাহেবের কণ্ঠে এ কিতাবের সুর, এর পয়গাম শুনে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলে উঠলো–

تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ

"হে প্রভু! আমাদের ভুল বুঝতে পেরে আমরা তোমার কালেমের ওপর ঈমান আনলাম, সত্যের সাক্ষ্য দানকারীদের মধ্যে আমাদের নাম লিপিবদ্ধ করো"। (মায়েদা ৫:৮৩)

সুপ্রিয়, পাঠক! আল্লামা সাঈদী আল্লাহর আখেরী কিতাব আল কোরআন হাতে দাঁড়ালেন। বুঝতে পেরেছিলেন এ কিতাবটির সামনে দাঁড়াতে পারে এমনকোন কিতাব আকাশে-জমিনে নেই। এটি 'উম্মুল কিতাব' এর প্রতিটি বাক্যের মধ্যে হাজার হাজার কিতাব

ঘুমিয়ে আছে। শুধু এ কিতাবটি ই "লা রাইব ফি" যাতে সন্দেহের ও ভুলের অস্তিত্ব নেই। এর প্রতিটি বর্ণ, শব্দ ও বাক্য সরাসরি আ-ল্লাহ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর শুরু হতে মানব জাতির বিশুদ্ধ ইতিহাস, জীবন যাপনের যতো দিক বিভাগ- পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, সন্ধিনীতি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে "তির্বইয়ানান লেকুল্লে শায়াইন"।

বিস্তারিত গাইড এখানে বর্ণিত আছে। দুঃখজনক বিষয় হলো ১৮৩১ সালে আব্দুল আজিজ মোহাদ্দিসে দেহলভীর (রহ.) নির্দেশ-না ও ফত্ওয়ার মাধ্যমে কোরআনী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার যে জিহাদ আন্দোলন সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভীর নেতৃত্বে ১৮২৩ সাল হতে শুরু হয়েছিলোন '৩১ সালে বালাকোটে ইংরেজ ও শিখদের যৌথ বাহিনীর হাতে সাইয়্যেদ আহমদ (রহ.) ও শতশত আলে-মর ও মুজাহীদদের শাহাদাতের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি হয়। এরপর একশত বছর পর্যন্ত আল কোরআনকে বন্দি করা হলো, স্বাধীন ভাবে কোরআনের দাওয়াত ও কোরআন প্রতিষ্ঠার আওয়াজ বৃটিশ ভারতে অসম্ভব হয়ে পড়লো। আলেমগণ উপায়হীন হয়ে কোরআন তিলওয়াত ও সাওয়াব হাসিল করা, মাটির নিচে ও হাশর মাঠের, জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে ব্যস্ত হলো, যিকির এর হালকা ও মুরীদ হওয়ার বায়াত শুরু করলে। 'জিহাদ ও একামতে দ্বীনের' আওয়াজ ভুলেই গেলো।

বৃটিশ শাসন শেষ হওয়ার কয়েক বছর পূর্বে ১৯৪১ সালে যে নতুন ইসলামী আন্দোলন 'জামায়াতে ইসলামী' নামে মাওলানা মওদূদী (রহ.) শুরু করলেন এ ঘোষণা দিয়ে, "১৮৩১ সালে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলনের ঝাণ্ডা বালাকোটে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিলো, আমি সে ঝাণ্ডা নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম"।

একাফেলায় শরীক হতে লাগলো আলেম, দায়ী, ইংরেজি শিক্ষিত ও গণমানুষ। এটি ছিলো সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভীর (রহ.) জিহাদ আন্দোলনের পুনর্জাগরণ। এর কর্মীদের দাওয়াত নবীদেরই দাওয়াত।

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ

"সাবধান, সৃষ্টি যার বিধান চলবে তার"। (সুরা আরাফ : ৫৪)

এই বিপ্লবী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত না হলে আল্লামা সাঈদী (রহ.) এর মাধ্যে যে সাহস, ত্যাগের যে মহীমা, কথা বলার অসাধারণ শিল্প, কোরআনকে কোরআনের আয়াতে ব্যাখ্যা দানের যোগ্যতা, শৃঙ্খলাবোধ, অসাধারণ বিনয় ও শিষ্টাচার, অর্থ বিত্ত পদপদবীর প্রতি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী নির্লোভতার এ বিকাশ, এই ভাবে হতো কিনা যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যেখানে তিনি বই লিখে জবাব দিয়েছেন "আমি কেন জামায়তে ইসলামী করি" লাখো মানুষ সামনে নিয়ে বলতেন "লোকেরা কি দেখে না আমি কি তাফ-সীর সাথে রাখি"? "তারা কি জানে না, আমি কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত?"

কোন সম্ভাবনাময় বটের বিচি ৮০ বছরও পথরের উপর অংকুরিত হবে না; যদি মাটি, আলো, পানির পরশ না পায়। আল্লামা সাঈদী (রহ.) এর মধ্যে যোগ্যতার যে অপার সম্ভাবনা বিকশিত হয়েছি-লো তা জামায়াতে ইসলামীর মতো এক বিপ্লবী সংগঠনের তালিম, তারবিয়াত, পরিবেশ ও সান্নিধ্যের কারণে যে হয়েছিলো, তিনি নিজেই সাক্ষী।

কোরআনুল কারীমের তাফসীরকে এতো শৈল্পিক ভাবে, জনগণের বোধগম্যকরে, জীবন ঘনিষ্টতায় আপন করে। তিনি বলতেন যা

মানব হৃদয়কে স্পশ করতো। এতাদন ধরে ওয়াজ মাহাফলের কিচ্ছা-কাহিনী, বিলাপের সুর, মসনবীর শেয়র, চোখ বন্ধকরে, 'ইল্লাল্লাহর' যিকির, অন্যদের গালিগুলুজ, ফত্ওয়া বাজী, বেদা-ললিক, ভিত্তিহীন কথা, আঞ্চলিক ভাষার উৎকট বক্তব্য ও বাংলা ভাষার সীমাহীন বিকৃতি, অনেকের অশুদ্ধ তিলাওয়াত, বিষয়বস্তু ও লক্ষ্যহীন কথার ফুলজুড়ি। হয়তো সামান্য ব্যতিক্রম ছিলো, এ ধারা চলছিলো যুগ যুগ ধরে, আল্লামা সাঈদী (রহ.) আল্লাহর কোরআন সামনে খোলা, গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর Notes, কোরআন, হাদিস ও তথ্য উপাত্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, Study করে যা লিখেছেন তাও সামনে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে, খুতবা, হামদ ও দরুদ পড়ে অপূর্ব সুরে, দরাজ কণ্ঠে কোরআন তিলওয়াত লাখ মানুষের মানবদরিয়া, সুরের মূচ্ছনায় সবকিছু ভুলে এভাবে আন্দোলিত হতো, তা ভাষায় বর্ণনা করা সুকঠিন, তাঁর ভাষাশৈলী, বাচনভঙ্গী শব্দচয়ন, বাক্যের গাঁথুনী, উপমা প্রদান, উচ্চারণে বলিষ্ঠতা, কণ্ঠের মিষ্টতা, সুরের উঠানামা, অসাধারণ বাগ্মীতা এক বিস্ময় ও যাদুময়।

قَالَ قَالَ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

রাসুল (সা.) যেমন বলে, "অনেক আলোচনার মধ্যে রয়েছে যাদুর প্রভাব"।

তাঁর আওয়াজ এর বলিষ্ঠতা যেন কামানের গর্জন; সৈনিকদের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কমান্ড; যা চলে আসা ওয়াজ ও নসিহত বাহ-াস-মোনাজেরা ও শেয়র আশয়ারের বিদায়ের শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে দিলো।

এগিয়ে এলো হাজারো সাঈদী,'তাঁরই সুরে গাইছে তারা আল কোরআনের সুর'। তাদের জন্যে রইলো একরাশ শুভেচ্ছা। 'তোমরা তাফসীর শিল্প রপ্ত করো, কোরান তিলাওয়াত বিশুদ্ধ ও সুর যুক্ত করো, নির্লোভ ও সাহসী হও, আল্লাহর সাহায্য চাও'। "দাদে হক্করা কাবেলিয়াত শর্ত নিস্ত; বলকে শর্তে কাবেলিয়াত দাদেউস্ত"। কব্বিলে: 'আল্লাহর দয়া পাওয়ার জন্য যোগ্য হওয়া শর্ত নয়; তবে যোগ্য হওয়ার জন্য প্রভুর দয়া শর্ত।'

পরিশেষে বলতে চাই, একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখার পর কেউ যদি আমাকে বলে আল্লামা সাঈদী (রহ.) কে এক বাক্যে পরিচয় দিন; আমি মাওলানার অতি ঘনিষ্ঠদের একজন, তার বুে-কর এক পাঁজর বলতে পারেন; "আমার নিকট তিনি একবিংশ শতাব্দির এক সার্থক দায়ী ইলা-ল্লাহ"। সকল নবীগণ নিজ কওে-মর দায়ী ছিলেন। মুহাম্মদ (সা.) এর দাওয়াতের 'জমান ও মাকান' নেই। লাখ নবীর সকল যোগ্যতা, মোজেজাত, বিস্তৃতির যোগফে-লর চেয়েও তিনি বড়, মহান ও সীমাহীন। আল্লাহ তায়ালাই তাঁর সীমার খবর জানেন। তিনিও দায়ী ইল্লাল্লাহ।

আরাফাতের মাঠে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার নরনারীকে তিনি বলেন:

يايُّهَا اَلنَّاسِ اَلْاَهَلْ بَلَّغْتُ- قَالُوْا نَعَمْ- نَشْهَدُوْا أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتُ
الرِّسَالَةَ – قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ- ثَلَاثَ مَرَّةً- قَالَ ص. فَلْيُبَلِّغِ
الشَّاهِدُ الْغَائِبَ- اَلْوِدَاعْ- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (مسلم)

"হে আরাফাতের মানবমণ্ডলী! আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দিয়েছি? সকলে বললো, "হ্যাঁ", আপনি আমাদের নিকট আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন? রাসূল (সা.) আকাশে আঙ্গু-লি উঁচু করে বলেন, 'হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন', তিন বার বলেন। 'হে উপস্থিতগণ, তোমরা আমার অনুপস্থিত উম্মতের নিকট আমার পয়গাম পৌঁছে দেবে, বিদায়।'

এ 'দাওয়াত' নবীজি (সা.) উম্মতের নিকট আমানত হিসেবে রেখে বক্তব্য শেষ করে ছিলেন।

আজ, আমরা সকলে এ দাওয়াতের আমানত বহন করতে হবে। একটি কথা জানা থাকলে তাও পৌঁছে দিতে হবে। এ দাওয়াতই দ্বীনকে পৃথিবীর প্রতিটি কোনে, প্রতিটি জনপদে পৌঁছাবে।

আসুন আমরা আমাদের জবান, কলম ও আমলের এবং মিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাই, দাওয়াতি সংগঠনে সম্পৃক্ত হই। একবিংশ শতাব্দির যোগ্য দায়ী ইলাল্লাহর যোগ্যতা অর্জনে সাধনা করি। আল্লাহর আখেরী কিতাবকে সকল চ্যালেঞ্জের সামনে পেশ করার দুরন্ত সাহসে বলিয়ান হই।

হে প্রভু, তোমার যে বান্দা অকথ্য নির্যাতন, বঞ্চনা ও অত্যাচার বরদাশত করে তোমার কালাম মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন, কারাগারের মৃত্যু সেলে বসে বসে বড়ো বড়ো কিতাব লিখেছেন।

তুমি তার নেক আমল সমুহ কবুল করো, তাকে মায়া করো, সকল নির্যাতন ও কষ্টকে তার নাজাতের উসিলা বানাও, আমিন।

লেখক: প্রখ্যাত স্কলার, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসির

সুখরঞ্জন বালি ও মাওলানা সাঈদী

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক

১৯৭৯ সালে আমি যখন লন্ডনে ব্যারিস্টারি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, আল্লামা সাঈদী আসেন এক ওয়াজ মাহফিলে। ওই মাহফিলেই তার সাথে প্রথম দেখা। মাহফিলের উদ্যোক্তা ছিল দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে অ্যান্ড আয়ার। তখন আল্লামা সাঈদীকে আমার বাসায় দাওয়াত করেছিলাম। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

মাহফিলে প্রথমবারের মতো দেখলাম, কীভাবে তিনি মানুষকে মুহূর্তের মধ্যেই হাসাচ্ছেন ও কাঁদাচ্ছেন। তার সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাফসীরের বয়ান দলমত নির্বিশেষে সবাইকে আকর্ষণ করেছিল। এরপর যতবার এসেছেন আল্লামা সাঈদীর তাফসীর মিস করিনি। প্রতিবারই তার সাথে সাক্ষাৎ ও কথা বলার সুযোগ হয়। আমি আধুনিক শিক্ষিত এবং তিনি আলেমে দ্বীন। কিন্তু তারপরও আমাদের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক ছিল। আমাদের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে।

স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আমি দেশে ফিরে যাই ১৯৮৫ সালে। এরপর থেকে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। আরও কাছাকাছি আসি ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সুধাংশু শেখর হালদারকে পরাজিত করে তিনি নির্বাচিত হন। ভোটের ব্যবধান খুব বেশি ছিল না। সুধাংশু শেখর হালদার সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ছিলেন। তিনি ভোটের ফলাফল নিয়ে মামলা করেন। আল্লামা সাঈদীর পক্ষে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগে ওই মামলা লড়েছিলাম। তখন তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে।

সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তার মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে। ২০১০ সালের ২৯ জুন আল্লামা সাঈদীকে গ্রেফতার করা হয়। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন জনৈক ব্যক্তি। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের আইন তৈরি হয় ব্রিটিশ আমলে, ১৮৯০ সালে। ওই আইনে দায়ের করা মামলায় জামায়াতের তৎকালীন আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদকেও গ্রেফতার করা হয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে গ্রেফতার করে জামিন দেওয়া হয়নি। আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ২০টি অভিযোগ এনে ২ অক্টোবর ২০১১ সালে চার্জ গঠন করা হয়। অর্থাৎ ভিন্ন একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার করে আটক রেখে ১৬ মাস পর চার্জ গঠন করা হয় ট্রাইব্যুনালে। তখন আমি নিউইয়র্কে। ঢাকায় এসে শুনলাম, চার্জ গঠনের দিন ট্রাইব্যুনালে তিনি সুরা ইবরাহিমের ৪৬ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোকে মিথ্যা উল্লেখ করে ট্রাইব্যুনালের সামনে বক্তব্য রাখেন। সুরা ইবরাহিমের ৪৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "তারা তাদের সব রকমের চক্রান্ত করে দেখেছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি চক্রান্তের জবাব আল্লাহর কাছে ছিল। যদিও তাদের চক্রান্তগুলো এমন পর্যায়ের ছিল, যাতে পাহাড় টলে যেত"। আশ্চর্যের বিষয়, আমিও তখন সুরা ইবরাহিমের এই ৪৬ নম্বর আয়াত অধ্যয়ন করছিলাম। এর আগে সুরা ইবরাহিম অনেকবার অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু ইতঃপূর্বে ওই আয়াতের এ মর্মার্থ বুঝতে পরিনি।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা খুবই জরুরি। নুরেমবার্গ, জাপানের টোকিও, প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া, রুয়ান্ডা, সিয়েরা লিওন, লেবানন, কম্বোডিয়াসহ আরও অনেক দেশে যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের ট্রায়াল হয়েছে। কিন্তু এসব দেশে বা দুনিয়ার ইতিহাসে কোথায়ও এমন নজির নেই যে, ভিন্ন একটি মামলায় আটকের ১৬ মাস পর অভিযোগ আনা হয়। সব জায়গায় আগে অভিযোগ দাখিল করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করে ট্রাইব্যুনাল। আল্লামা সাঈদীসহ অন্যদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা নজিরবিহীন।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যিনি আজীবন ওয়াজ মাহফিলে তাফসীরের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করেছেন তাকে গ্রেফতার করা হয় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগে। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১

সালে আমি হেগে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে যাই। আমার সাথে ছিলেন বিলেতের আইনজীবী টবি ক্যাডমেন। ওই দিন ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর বড়ো একটি মিছিল হয়েছিল। মিছিলের পর সরকার নাশকতার অভিযোগে মামলা দায়ের করে জামায়াত নেতাকর্মীদের নামে। ওই মামলায় আমাকেও অভিযুক্ত করা হয়। বলা হয়, আমি উপস্থিত ছিলাম এবং নাশকতায় জড়িত ছিলাম। সরকারের মামলার ভাষ্য অনুযায়ী, হেগে অবস্থান করেও যেন ঢাকায় নাশকতায় অংশ নেওয়া যায়।

হেগ থেকে লন্ডনে আসি। এখান থেকে আমেরিকায় যাওয়ার কথা। আমার বন্ধুবান্ধব সবাই একবাক্যে বললেন, আর দেশে যাওয়া সমীচীন হবে না। গেলেই আমি গ্রেফতার হবো। ওই সময়ে আমার আমেরিকা যাওয়ার কথা। ওখানে স্টেট ডিপার্টমেন্ট, কংগ্রেস ও সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন সংস্থার সাথে আমার ইতঃপূর্বেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। সুতরাং পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আমেরিকায় চলে গেলাম।

ওই সময়ে জামায়াত নেতাদের যুদ্ধাপরাধ মামলায় আমাদেরকে আইনি সহযোগিতা দেওয়ার জন্য বিলাতের তিনজন যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী আইনে বিশেষজ্ঞ একটি টিম আমরা নিযুক্ত করেছিলাম। তারা হলেন, স্টিভেন কে কিউসি (বর্তমানে কেসি), জন কেমেগ ও টবি ক্যাডমেন। তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমার দেশে যাওয়া ঠিক হবে না। ইতোমধ্যে আমি আমেরিকায় চলে গিয়েছি। আমি নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে ট্রেনে পৌঁছলাম। তারা আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন। ওয়াশিংটন ডিসির ট্রেন স্টেশনে পৌঁছার পরই টবি ক্যাডমেন টেলিফোনে আমাকে জানালেন, 'আমাদের স্পষ্ট অ্যাডভাইস হচ্ছে, আপনি বাংলাদেশে যাবেন না'।

এ দিকে ঢাকা থেকে খবর আসছিল, ১৯ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় সরকার দু'টি মামলা দায়ের করেছে। একটি পেনাল কোডের, অন্যটি দ্রুত বিচার আইনে। শেষ পর্যন্ত সরকার আমার বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনে অভিযোগ না আনার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন আমি আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, যা হওয়ার হবে, আমি দেশে যাব। ওই সময় লন্ডনে অবস্থানকারী আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম, মক্কা ও মদিনায় অবস্থানরত আমাদের সমর্থকদের যেন অনুরোধ করা হয়, পবিত্র স্থানগুলোতে দোয়া করতে। উল্টো তারাও খবর পাঠালেন, আমি যেন বাংলাদেশে না যাই।

যাই হোক, আল্লাহর ওপর ভরসা করে অক্টোবর মাসে নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় ফিরি। জুনিয়াররা জামিনের আবেদন প্রস্তুত রেখেছিলেন। ২০ ঘণ্টা জার্নি করে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি হাইকোর্টে গিয়ে অন্তর্বর্তী জামিন চাইলাম। ব্যারিস্টার রফিক-উল হক আমার আইনজীবী ছিলেন। তখনো বিচার বিভাগ অনেকটা স্বাধীন ছিল। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি হাস্যরসে আমাকে বললেন, মি. রাজ্জাক, আপনি কি ম্যাজিশিয়ান নাকি, একই সাথে ঢাকায় এবং হেগে অবস্থান করতে পারেন!

এর কিছুদিন পরই ট্রাইব্যুনালে গেলাম। ওই ঘটনা যখন ঘটে তখনো ট্রাইব্যুনালে যাওয়া শুরু করিনি। ট্রাইব্যুনালে অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলামসহ জুনিয়াররা যাতায়াত করতেন। ট্রাইব্যুনালের প্রথম দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার সাথে বিএনপির সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদীনসহ আরও অনেকে ছিলেন। পরে আল্লামা সাঈদীর মামলায় শুনানিতে অংশ নেওয়ার জন্য সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সাহেবও একাধিকবার ট্রাইব্যুনালে গেছেন। এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উল্লেখ করতে চাই, আমরা যদি আল্লামা সাঈদীসহ অন্য নেতাদের ডিফেন্সের দায়িত্ব না নিতাম তাহলে বিএনপির সিনিয়র আইনজীবী কাউকেই আমরা সাথে পেতাম না। কারণ, বিষয়টি ছিল খুবই স্পর্শকাতর। আমাদের একটি শক্তিশালী ডিফেন্স টিম গঠন করার পরই আমরা বিএনপির আইনজীবী নেতাদের সমর্থন পাই। বলা দরকার, তাদের অনেকেই বিশেষ করে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সাহেব বেগম জিয়ার সম্মতিক্রমেই ওই মামলায় অংশ নেন।

আমি ব্রিটেনের উচ্চ আদালত, অর্থাৎ হাইকোর্ট, কোর্ট অব আপিল এবং ওল্ড বেইলিতে অনেক মামলা পরিচালনা করেছি। কিন্তু বাংলাদেশে জামায়াতের শীর্ষ ১০ নেতাকে ডিফেন্স করার যে সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, এটিকে আমি পেশাগত জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা মনে করি। এটি সত্য যে, জামায়াত নেতারা সবাই রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা কেউ যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন না। পাকিস্তানের ঐক্যের জন্য কাজ করা ১৯৭২ সালের কোলাবরেটার্স অর্ডিন্যান্সের অধীনে অপরাধ হতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই তা মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞায় পড়ে না। একজন আইনজীবী হিসেবে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, দেশে বিচার বিভাগ স্বাধীন হলে মাওলানা সাঈদীসহ অন্য সব নেতা বেকসুর খালাস পেতেন।

এখন মনে হচ্ছে, আমার সব বন্ধুবান্ধবের উপদেশ উপেক্ষা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, আল্লামা সাঈদীসহ অন্যান্য নেতার মামলায় ডিফেন্স টিমের চিফ হিসেবে ভূমিকা রাখার জন্য।

আজকের এই আলোচনা আল্লামা সাঈদীকে স্মরণে। তাই তার মামলার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বলা প্রয়োজন। আগেই বলেছি, তার বিরুদ্ধে প্রথমে ২০টি চার্জ এনেছিল প্রসিকিউশন। ট্রাইব্যুনালের রায়ে আটটি চার্জে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত রায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ওই রায়ের পর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে গোটাদেশের সাধারণ মানুষ। দেশব্যাপী বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে শতাধিক মানুষ নিহত হন।

জনৈক বিসা বালী ও ইব্রাহিম কুট্টি হত্যার অভিযোগে তাকে ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়। বিসা বালীর চার্জে সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী ছিলেন তার ভাই সুখরঞ্জন বালী। সুখরঞ্জন বালীর একটি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রসিকিউশন তৈরি করেছিল। মামলা চলাকালীন সময়ে সুখরঞ্জন বালীর একটি ভিডিও স্টেটমেন্ট নিয়ে আসেন আল্লামা সাঈদীর যোগ্য সন্তান মাসুদ সাঈদী। এতে সুখরঞ্জন বালী মিথ্যা

সাক্ষী দিতে অস্বীকৃতি জানান। আমরা সেই ভিডিও ট্রাইব্যুনালে দিলাম। ভিডিও স্টেটমেন্ট অনুযায়ী প্রসিকিউশনের অভিযোগ পুরোপুরি অসত্য। প্রধান সাক্ষী সুখরঞ্জন বালী ডিফেন্স উইটনেস হতে চান। ট্রাইব্যুনাল সে দিন সুখরঞ্জন বালীকে ডিফেন্স উইটনেস হিসেবে সাক্ষ্য দিতে অনুমতি দেয়নি। বলা হয়, আগে আবেদন করতে হবে। তারপর তারা বিবেচনা করবেন। সে দিনই আমরা আবেদন করলাম। পরে (৫ নভেম্বর ২০১২) সুখরঞ্জন বালীকে ডিফেন্স টিমের একজন আইনজীবীর গাড়িতে করে ট্রাইব্যুনালে নিয়ে আসা হচ্ছিল, আল্লামা সাঈদীর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। ট্রাইব্যুনালে প্রবেশপথে সাদা পোশাকধারীরা আইনজীবীর গাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় সুখরঞ্জন বালীকে। পরে তাকে পাওয়া যায় ভারতের একটি কারাগারে। আমার জানামতে, দুনিয়ার ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কোনো দিন ঘটেনি। সুখরঞ্জন বালী বাংলাদেশের নাগরিক। অপহৃত হলেন ঢাকার যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল চত্বর থেকে। কেমন করে তিনি ভারতের কারাগারে গেলেন, সেটি বিস্ময়কর। রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান সাক্ষী যদি ডিফেন্সের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসেন তাহলে মামলার উদ্দেশ্য উন্মোচিত হয়ে যায়। এই ভয়ে সুখরঞ্জনকে আর সে সুযোগ দেওয়া হয়নি।

এবার আসা যাক, ইব্রাহিম কুট্টি হত্যার ঘটনায়। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে ইব্রাহিম কুট্টির স্ত্রী একটি মামলা করেছিলেন। সেই মামলায় তখনই পুলিশ তদন্ত করে চার্জশিট দিয়েছিল। মামলাটির এফআইআর ও চার্জশিটে কোথায়ও আল্লামা সাঈদীর বিষয়ে আকারে ইঙ্গিতেও একটি শব্দ নেই। পিরোজপুর তখন বরিশাল জেলার একটি মহকুমা ছিল। বরিশাল জেলা আদালত থেকে পুরনো এই মামলার সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করলেন আল্লামা সাঈদীর ছেলে মাসুদ সাঈদী। আদালত থেকে সংগৃহীত সার্টিফাইড কপি হলো একটি অকাট্য দলিল। সেটি ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইব্রাহিম কুট্টি হত্যা মামলায় আল্লামা সাঈদীকে দোষী সাব্যস্ত করে আল্লামা সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কোন সাক্ষ্য প্রমাণ বা দলিলের ভিত্তিতে আদালত আল্লামা সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দেন তা বোঝার ক্ষমতা একজন আইনজীবী হিসেবে আমার নেই।

অবশ্য স্কাইপি কেলেঙ্কারির মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছিল, বিচারকার্য চলছিল বাংলাদেশের মাটিতে আর রায় লেখা হচ্ছিল ইউরোপের ব্রাসেলসে। স্কাইপি কেলেঙ্কারি জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার পর দেশ-বিদেশে ওই বিচারের সামান্যতম যে গ্রহণযোগ্যতা ছিল তাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। দ্য ইকোনমিস্ট এ বিষয়ে দু'টি রিপোর্ট প্রকাশ করে। দ্য ইকোনমিস্ট আটলান্টিকের উভয়পাড়ের দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ও সমাদৃত একটি পত্রিকা। বাংলাদেশে ও লন্ডনে ইকোনমিস্ট স্কাইপি স্ক্যান্ডাল নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশের পর ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান নিজামুল হক নাসিম পদত্যাগ করেন। আসলে তাকে সরিয়ে দিতে সরকার বাধ্য হয়। তার জায়গায় মাননীয় বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবিরকে নিয়োগ দেয়া হয়। এই পরিবর্তনের পর তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল আল্লামা সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

আরও একটি কেলেঙ্কারি হলো, ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি ভবনে (সেফ হাউজ) সাক্ষীদের এনে সাক্ষ্যে কী কী বলতে হবে তা শেখানো হতো বলে অভিযোগ আছে। কিন্তু অনেক সাক্ষী শেখানো বক্তব্য আদালতে বলতে নারাজ ছিলেন। তাই রাষ্ট্রপক্ষ ট্রাইব্যুনালে একটি তালিকাসহ আবেদন করে বলে, অমুক অমুক সাক্ষীকে পাওয়া যাচ্ছে না। আদালত যেন পুলিশের কাছে দেওয়া তাদের সাক্ষ্যকেই সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। আমরা এর বিরোধীতা করি। ইতোমধ্যে মাসুদ সাঈদী সেফ হাউজের সব কাগজপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। তার বিবরণ দু'টি জাতীয় দৈনিক প্রকাশ করে। সেই ডকুমেন্টস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণ হয় যে, সরকার কথিত নিখোঁজ সাক্ষীরা যাত্রাবাড়ীর সেই ভবনেই অবস্থান করছিলেন এবং তাদের কোর্টে আসতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু তারপরও মাননীয় ট্রাইব্যুনাল অনেক সাক্ষীকে কোর্টে উপস্থাপন ছাড়াই পুলিশের জমা দেওয়া দলিল তাদের সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। এটি ছিল ন্যায়বিচার পরিপন্থী।

সেই ঘটনা নিয়ে ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা আবেদন তিনজন মাননীয় বিচারপতি মিলেই শুনলেন। কিন্তু আদেশ দেওয়ার সময় মাননীয় বিচারক এ কে এম জহির অনুপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত তিনি বাকি দু'জনের সাথে একমত হতে পারেননি। তার অনুপস্থিতিতে দু'জনে আদেশ দিলেন। পরে বিচারপতি এ কে এম জহির আর ট্রাইব্যুনালেই থাকতে পারেননি। তিনি পদত্যাগ করেন।

১৯৯২ সালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত গণ-আদালতের সাথে যে বিচারক সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উদ্যোগে গঠিত সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী টিমের সদস্য ছিলেন। সুতরাং একজন তদন্তকারী ব্যক্তি বিচারক হতে পারেন না। এ বিষয়টি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের শুরুর দিকে একটি রিক্যুয়েজাল পিটিশন দেওয়া হয়েছিল। রিক্যুয়েজাল পিটিশন হচ্ছে, এ ধরনের ক্ষেত্রে বিচারক নিজেই নিজেকে বিচারকার্য থেকে প্রত্যাহার করে নেবেন। ওই পিটিশন মাননীয় বিচারক এ কে এম জহির ও এ টি এম ফজলে কবীর শুনানি করলেন। তারা একটি ভালো রায় দিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন, রিক্যুয়েজাল করবেন কি না, সেটি ওই বিচারকের এখতিয়ার। কিন্তু মাননীয় বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম জানিয়ে দিলেন, তিনি রিক্যুয়েজাল করবেন না। এ রকম ঘটনাও কোনো দুনিয়ার বিচারের ইতিহাসে বিরল।

আল্লামা সাঈদী ট্রাইব্যুনালে এলে প্রায়ই আমার হাত ধরে বলতেন ব্যারিস্টার ভাই, আল্লাহর দ্বীনের জন্য শহীদ হওয়া বড়ো কামনা। কিন্তু তাই বলে কি এসব অভিযোগে! আমার বিরুদ্ধে নারী ধর্ষণের অভিযোগ! মানুষ হত্যার অভিযোগ! তিনি আরও বলতেন, জীবনের একটিমাত্র আশা-জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে মানুষের ঘরে ঘরে কুরআনের বাণী পৌঁছাতে চাই। তার সে আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ হয়নি। কিন্তু, তথ্য প্রযুক্তির এই আধুনিক যুগে মানুষ তার মুখে তাফসীর যুগ যুগ ধরে শুনতে থাকবে। এটি পরিষ্কার, জীবিত সাঈদীর চেয়ে মৃত সাঈদী কম শক্তিশালী নন।

লেখক: বিশিষ্ট আইনজীবী, লেখক ও রাজনীতিবিদ

পাশ্চাত্যে আল্লামা সাঈদীর অবদান

মামুন আল আযামী

আল্লামা সাঈদী আমার মরহুম পিতা ও নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের ঘনিষ্ঠ সাথী ছিলেন। সেই হিসাবে আমি তাকে চাচা সম্বোধন করতাম। তিনিও আমাকে এবং আমার পরিবারকে খুব স্নেহ করতেন। আমার স্ত্রী ক্যান্সারের রোগী থাকাকালে বড়ো বড়ো মাহফিলে তাঁর জন্য দোয়া করেছেন।

লন্ডনে উনি ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছর আসতেন। ইস্ট লন্ডন মসজিদের পেছনে ফিল্ড গেইট স্ট্রিট সরকারিভাবে বন্ধ করে উনার তাফসীর মাহফিল হতো। পাশ্চাত্যে সর্ববৃহৎ মাহফিল গুলো সাঈদী চাচার এক ঐতিহাসিক অবদান আল্লাহর মেহেরবানীতে। বাংলাদেশী দোকানগুলোতে গানের বদলে উনার তাফসীর বাজতো দৈনিক। আমেরিকার ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকার সম্মেলনে উনি ইংরেজিতে খুব প্রশংসনীয় বক্তব্য রাখেন। এই সংগঠন তাকে 'আল্লামা' খেতাব দেয়।

আল্লাহর মেহেরবানীতে পাশ্চাত্যে আল্লামা সাঈদীর ৫ টি মৌলিক অবদান রেখেছেন বলে আমি দেখেছি–

১. কোরআন তাফসীরের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি।
২. মদের লাভজনক ব্যবসা থেকে বহুসংখ্যক বাংলাদেশীর পরিবর্তন।
৩. নামাজে উদাসিন মুসলমানদের মধ্যে নামাজের প্রতি সচেতনতা।
৪. সুদ হারাম ও পরিত্যাজ্য হওয়ার চেতনা সৃষ্টি ও সুদ ত্যাগ।
৫. মহিলাদের পর্দার সচেতনতা সৃষ্টি এবং আমল বৃদ্ধি।

লেখক: তারবিয়াত সেক্রেটারী, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন ইসলামিক স্কলার, প্রশিক্ষক ও চিন্তাবিদ।

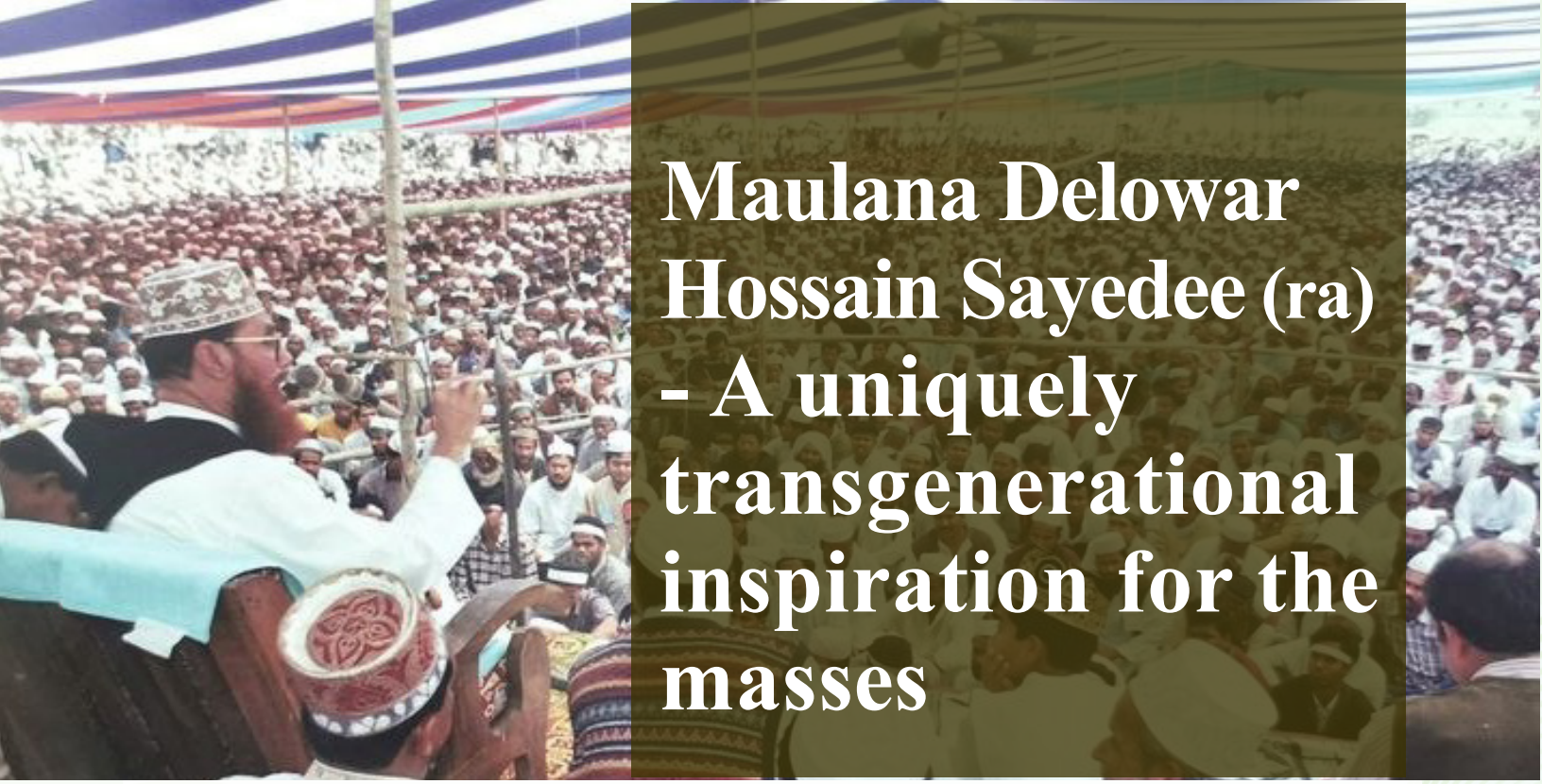

Maulana Delowar Hossain Sayedee (ra) - A uniquely transgenerational inspiration for the masses

Muhammad Habibur Rahman

From time to time, the Muslim Ummah receives the sad news of the passing of its shining stars. Such lose is so profound and it's feeling is so deep that its mournful consequence remains worldwide and intense. This is only natural for the honourable individuals, who have been gifted by Allah with a life of purpose and dedication and their impact is so deep and widespread. Their legacy continues and inspires generations to come.

Maulana Delawar Hossain Sayedee, whom we lovingly and respectfully refer to as 'Sayedee shaheb' was one such exceptional star. Following his recent passing, the Muslim world, especially Bangladeshi Muslims mourned and performed Janazah in absentia, all over the world. Sayedee shaheb was not just a scholar and a prolific orator. He was much more. In fact, in my view, for his time he was unique and his appeal was transgenerational. His style of oration, his use of language, his message and even his look with that signature hat - were all new and different. In that respect he was a trend setter. It will not be unreasonable to say that no one in this field other than Sayedee shaheb, is known by every Bangladeshi at home and abroad and from several generations, and whose words and works have impacted so widely then and since. No doubt others would have tried to replicate him but he was so good that no one came close. Although I remember once being on stage in Dhaka and looking down at the audience I was surprised to notice Maulana Sayedee sitting in the front row. In fact, it was someone else who emulated every exterior feature of Sayedee shaheb - from the tupi, to the moustache and beard and his attire. This eloquence and impressive scholarship and oration are just one side of Sayedee shaheb. The other equally impressive aspect is his courage and istiqamah on Islamic principles and values which he remained unhesitant and boldly **articulated** at the highest level including in the **Parliament**. One of the historic incidences which he so graphically related often was the battle of badr and how two youth (Muaaz and Mwaiz) roared like lions and jumped into the battlefield, had their limbs cut off before they had killed Islam's arch enemy Abu Jahal. Just like those youth, when it came to the truth and the service of Allah, Sayedee shaheb was the 'lion that roared' fearlessly.

My interaction and occasions of meeting with this servant of Allah was not numerous but his impact on my life was profound. This is unusual because Sayedee shaheb is of an older generation and I departed from Bangladesh at a tender age. I came to the UK with my parents in 1975 aged 11. At the time I had been attending class six in secondary school. My upbringing in Bangladesh was typical and as such I had not heard of either Maulana Sayedee or Islamic activism.

I, together with thousands of other London based

Bangladeshi Muslims, first came across Sayedee Shaheb in 1978. Something big was happening. East London Mosque had organised a waaz mahfil on the street. This was both unique and a necessity. It had never been done before and ELM at the time was just a porta cabin with limited capacity. This was my first waaz mahfil in the UK and I found myself there with both my brothers with the tape recorder in hand. We were not the only ones. There seemed to be thousands of people and all just as

eager. Maulana Sayedee must have been a big figure in Bangladesh to draw such a crowd. Although it was such a long time ago, it seems like yesterday and I remember, the audience being mesmerized by his oration. Thus, a love story (halal) began between the Islam loving Bangladeshis, East London Mosque and Sayedee shab, that was to last for decades and have a transformative impact on the whole community.

Islamic education in Bangladesh, during my childhood and perhaps even today is poor. The morning maktabs may prepare you for the rituals and reciting the Qur'an. Everything else is at best cultural. There is no attempt in teaching Islam as a way of life or what Allah wants from His servants. As a result understanding of the sha'riah was absent and many practices were upside down. For example, I remember our mothers and aunts, when travelling would wear a burka that resembles a knight's armour made of cloth. My middle aged fufu, whenever she came to or left our bari, would wear one of these burka, together with socks and gloves, and after boarding the rickshaw would also cover with an umbrella.

On the other hand, young ladies wore shelwar kamiz and threw an urna (thin shawl) over their head, which slipped and remained down most of the time. The situation with the Bangladeshi Muslims in East London and elsewhere in the UK was no different. Among men, smoking and Indian cinema for pass time was common, whilst going to the mosque was for prayer only and mass only on occasions. Unlike today's thousands of brothers and sisters flocking to ELM/LMC and visible and prevalent hijab and niqab clad sisters in East London, most sisters then had their slippery urna on their heads. Although this transformation did not come about from Sayedee Shaheb's single handed effort but his contribution was no less than any other contributory factor.

The audio cassette that we recorded on in that first open-air event in 1978, together with many other audio cassettes with Sayedee shaheb's waaz became a major part of my life and I suspect, part of the lives of countless others. There was something different about his speeches. Yes, they were educational but they were also relevant to the lives of people and surprisingly they were also enjoyable. People were happy to listen to or watch a Maulana Sayedee tape

or video instead of a music tape or movie video. In 1980, we went to Bangladesh on holiday and we took our cassette player, and Sayedee shaheb's tapes. I remember our older cousin getting hooked to the Sayedee shaheb speeches as he spent hours listening repeatedly to the tapes.

Sayedee shaheb had an international appeal. It wasn't limited only to countries with large concentrations of Bangladeshis who were well established with big mosques. I was astounded as I was on a short holiday to Palma de Mallorca with my family and while I was walking past a building site, I could hear Sayedee Shaheb's waaz being played.

The start of Sayedee shaheb's visits to the UK coincided with my involvement in Young Muslim Organisation (YMOUK) and the East London Mosque. Whilst my Bangla was not great, he made his Bangla seem easy. His delivery was masterful. He weaved his narration so skilfully that the listener was drawn in. The flow was seamless and the tone soothing. His narrations of stories were so vivid and so relevant to the topic. It was impossible not to follow him with absolute attention throughout the whole journey of his speech. What was amazing was that during that speech he made you laugh and cry many times over and the effect of his delivery was such that you would go through the same emotion if you were to hear the same speech over and over. His message resonated with everyone as he made sure to included something for every category of the audience. People not only flocked to his live programmes, but up and down the country, in homes, in factories and in shops, people were listening to his talks. His appeal was transgenerational as was proven by the longevity of his unparalleled contribution to the Islamic education of many generations of Muslims across the globe.

I had the pleasure of attending many of his talks in East London Mosque and in YMO programmes. Once, in a YMO conference, I was asked to translate his talk in English. As usual his talk was comprehensive and full of passion and I tried my best to capture that. On his way out he came up to me and said, 'well done, you managed to translate everything I said'. Needless to say I was elated but I am sure he said it to motivate me.

YMO/IFE played a crucial role in presenting Sayedee shaheb to the community - not only in the UK but across Europe. Once Sayedee shaheb was due to deliver a talk in Stockholm, Sweden. For some reason he was unable to attend and the organisation decided to send me and one other brother to go and explain the situation in person. Of course we were terrified but the brothers in Sweden were so understanding and really appreciated the fact that we travelled there to explain. That was a good decision by the organisation that forged a lasting relationship with them.

On one occasion I was in a TV programme where there were at least two other people who were being derogatory about Sayedee shaheb. In my defence of Sayedee shaheb I highlighted the tremendous impact he has had on the countless lives of young people like me, who because of his encouragement and inspirational talks went on to reshape our lives and many others around us. Sayedee shaheb, I said, far from being a threat, has been and is a force for good.

I was the Secretary of the ELMT during the planning and development of the London Muslim Centre. I had seen him as a boy in the programme in 1978 help raise funds to build the East London Mosque. We bought bricks at a cost of £1 for the Mosque. Two decades later, we repeated this strategy for LMC and people donated £100 per brick on which we wrote their names and raised a substantial amount. Sayedee shaheb was also involved in raising funds for LMC and attended the opening in 2004.

It is impossible to enumerate the impact of Sayedee shaheb on the lives of Bangladeshi Muslims. What is however glaringly obvious is that 'Sayedee' is a household name for generations of Bangladeshi Muslims and those communities have transformed beyond recognition in their love of Allah and Rasool, in their relationship with the Qur'an and their adherence to Islam.

May Allah swt enter Allama Delawar Hossain Sayedee – our beloved 'Sayedee shaheb' in Jannatul Firdous Al A'la.

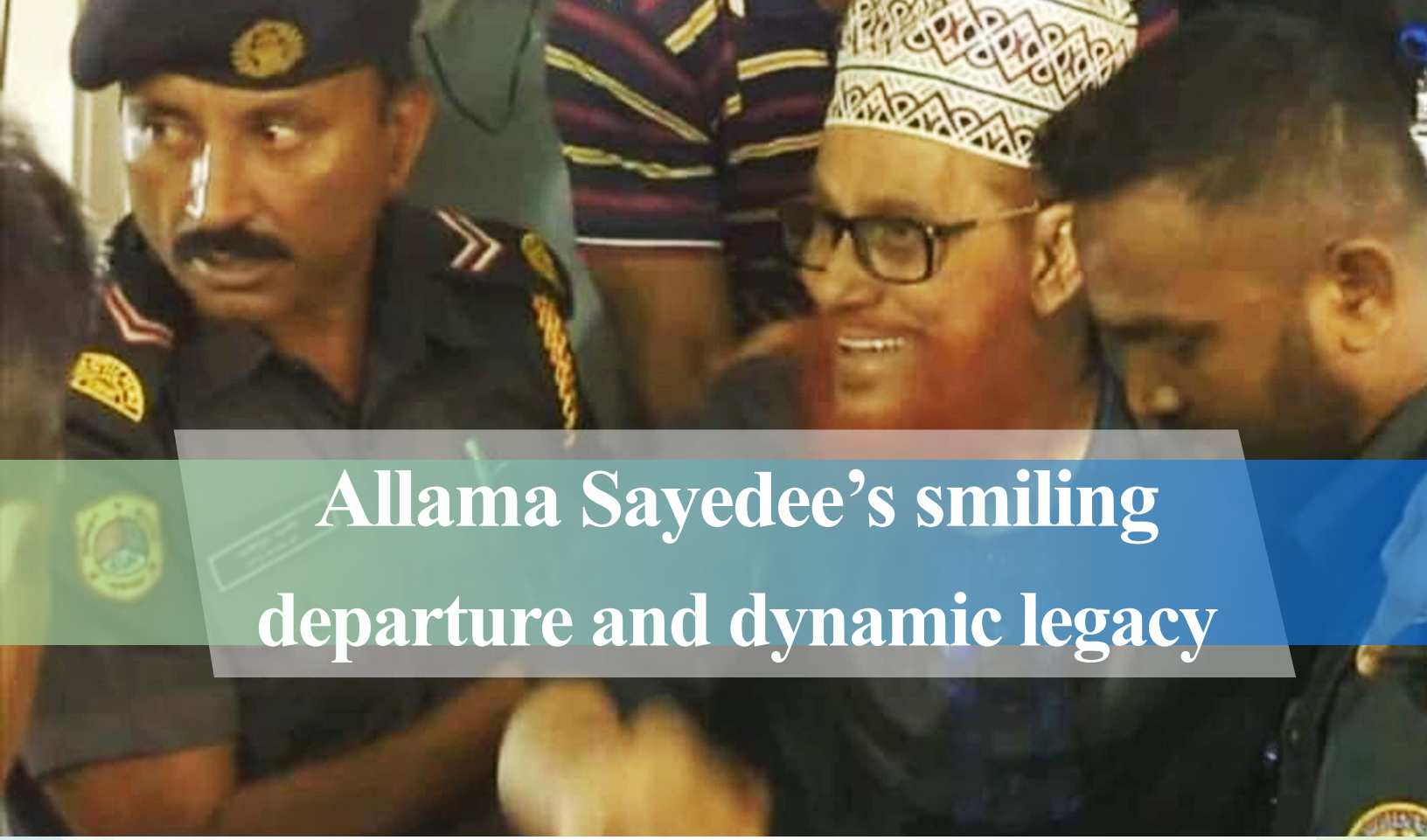

Allama Sayedee's smiling departure and dynamic legacy

Ajmal Masroor

Allama Delwar Hussain Sayeedi passed away , August 14, 2023 at 8.30pm Bangladesh local time. He was sentenced to life imprisonment for a crime he never committed. While serving his sentence he suffered a heart attack in his prison cell but his family was not even informed, he was not treated immediately and when things became acute he was only taken to a local prison hospital the next day. He was then transferred to a more specialist hospital for further treatment as things deteriorated. The consultant in charge of his care initially reported that his condition was stable and didn't need further treatment, however, the very same evening he was pronounced dead. His family were denied access to him, they were not allowed to be with him in the last hours of his life. Sadly, we will never find out the truth of what exactly happened in this world but on the day of judgement the ultimate truth with be unveiled. What is true for sure is that millions of Bangladeshis all around the world would be mourning his death. The world has lost one the greatest advocates of Islam of our time.

You may be wondering who is this man? The non-Bangladeshi communities may not have heard his name or even listened to his lectures. Let me introduce him briefly.

He was born and educated in Bangladesh and over the last fifty years dominated the Islamic lecture circuit, delivering the message of the Qur'an in the most lucid and practical manner possible. He was the most eloquent speaker, one of the greatest Bangla language orators, and by far the most influential Islamic scholar in the history of Bangladesh. Thousand of Islamic scholars of our time grew from his words of inspiration and most mimic his style of religious oratory.

His yearly exegesis of the Qur'an would be attended by millions. At one time no single open field in Bangladesh could ever accommodate his full audience. People would come from all parts of the country, despite adverse weather at times, sit on the ground for hours and listen to his masterful oratory. He delivered the message of the Qur'an to all people of all ages, socioeconomic backgrounds, educational status and knowledge levels. He made the understanding of the Qur'an fashionable at a time when it was claimed to be the sole monopo-

ly of the Muslim clerics. He brought Qur'an to the attention of the Muslims, helped them to relate to it as a book of guidance instead of just a book of recital. He made Qur'an alive and accessible for the ordinary. He was known and affectionately called as "the Qur'an bird" - in other words, he preached the Qur'an like a bird flying freely from one end of the earth to the other with eloquence, most beautiful melody and lucid language.

He was very popular among people. In cars, cafés, restaurants, people's houses and even in mobile devices, you could hear his lectures being played out loudly. He impacted thousands of people who were leading unethical life, indulging in destructive behaviour and involved in many anti social activities. Thousands of people embraced Islam at his hand. Even after the current repressive government's ban on any mention of his name in any public spaces, he is still the most listened to and followed religious scholar in Bangladesh. He paid the ultimate price for his belief, he was locked up just like Prophet was locked up. He died while incarcerated like many of the greatest people on this earth died.

He was falsely accused and convicted of murder of a Hindu gentleman in 1971's liberation war but the star eye witness, the brother of the victim, testified that Sayeedi had nothing to do with his brother's murder. When he attempted to come to the court to give his eye witness account, he was abducted from the steps of the court and forcibly disappeared. Many years later he has been found but by then it was too late. He has been threatened and given orders to remain silent. Allama Sayeedi was already serving a life imprisonment sentence and he could do nothing to change this. However, when he heard the death of Sayeedi, he has personally turned up to the hospital where his body was kept and at the hospital ground gave a live interview watched by millions of the fact that Sayeedi did not murder his brother. He went further and said that when Sayeedi was the local elected MP for two terms, his area was "as safe as a mother's lap". This is a Bangla idiom, depicting the safety offered by a mother to her children. People of his constituency felt so safe when he was their MP. Those who locked up Sayeedi under false accusation May God deal with them in the most befitting way in this world and the next.

He was extremely courageous, did not shy away from speaking his mind, holding authority to account in public for corruption, unlawful behaviour, abuse of power and squandering of public funds. He was robust with his moral compass and powerfully advocated it to the wider public. He made the public understand that separating Islam from public life was an anathema to Islam. He was witty, humorous and extremely intelligent scholar, who articulated Islam in the simplest possible language without compromising or diluting the message. He was the scholar of the masses and will remain in the hearts and minds of millions in the same esteem and love. May God preserve his legacy.

My personal experience of Allama Sayeedi goes deeper than a distant member of the audience. When I was very young I remember he often frequented my father's house in London. He was always joking and being playful with me. In 1977 outside, at the back street of the East London Mosque, there was an open air event with Sayeedi to fundraise for the East London Mosque, which at that time was only a porter cabin. I was one of those young post-

er boys who paraded on the stage and read various religious texts in front of the community and dignitaries including Allama Sayeedi. In later years when I studied in Bangladesh I attended his lectures

and even performed on the stage in front of hundreds of thousands of people. When I returned to the UK and he would come to the UK for lecture tours, I would often accompany him to various places of importance. Once while he was in the UK and delivering a lecture at the East London Mosque, upon seeing my absence, he called my name is public and told the organisers to call me.

My father loved him dearly, listened to his lectures all the time and I too grew a deep level respect for him. I did not agree with everything he said, naturally, we lived in two different context, his views and my views did not always align but that did not take away the fact that I loved his oratory and his words

roused in my inner self a deep love and affection for the Qur'an. It was this inspiration that led me to my own journey into the Qur'an and the knowledge gained from those years that I still use when teaching the Qur'an to others. I have learned to simplify the Qur'an from his lectures.

His real crime in Bangladesh was he was a sore thumb to the anarchy of the government, he became an obstacle to their shameless corruption and he was the rabble rousers who would have swayed public opinion and lead a revolution to clean up Bangladesh from years of endemic corruption, cycles of cronyism, cancer of nepotism and economic and political slavery of India. He needed to be silenced. He was arrested and using trumped up charges in a kangaroo court was indicted.

Allama Sayeedi stood for justice, fairness and rule of law to prevail in Bangladesh. He stood against corruption, nepotism and cronyism. He paid the ultimate price for his principles. He lived for the true freedom of his people and he lost his freedom in the process, he paid the ultimate price for his principles - died under incarceration. The most important consolation for a believer is that there will be the day of judgment where ultimate justice will be served. No politician, power or court will escape the ultimate justice.

Allam Sayeedi's funeral procession, the mourning of millions of people around the world and the tears of sadness that followed by heartfelt prayers for his eternal success are all indications of how much he was loved by his people. Today at various cities around Bangladesh and in various countries around the world, simultaneously, his funeral prayer took place. People lovingly and reverentially call Delwar Hussain Sayeedi "Allama" - a term saved only for those who are regarded by scholars as truly at the pinnacle of knowledge. Allama Sayeedi will forever be remembered as a martyr. May Allah have mercy on the soul of Allama Delwar Hussain Sayeedi, forgive him and grant him the highest of paradise with prophets, martyrs and honest people.

দা'ঈ জীবনের অনুপম প্রেরণা

শহীদ আল্লামা
দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.)

মুহাম্মদ আবুল হুসাইন খান

বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ সা.। লাক্বাদ কানা ফী ক্বাসাসিহিম... (সুরা ইউসুফ: ১১১)। অর্থাৎ "তাঁদের জীবনেতিহাস বর্ণনায় বুদ্ধিমানদের জন্য যথেষ্ট শিক্ষা রয়েছে"। 'বৃটেনের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী দা'ওয়াহ সংগঠন এম.সি.এ কর্তৃক প্রকাশিত নিয়মিত ম্যাগাজিন 'আলোর পথ' শহীদ সাঈদীর ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণে একটি বিশেষ সংখ্যা ছাপার উদ্যোগ নিয়েছে জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এতে লিখা দিতে মাওলানা ইউনুস ভাই আমাকে বার বার তাকিদ দিচ্ছেন, তাঁর অনুরোধ রক্ষার্থে আজকের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। যে সাঈদী সাহেব (রাহি.) ৫০টি বছর একাধারে গোটা দেশ এমনকি বিশ্বব্যাপী সরকার ও ইসলাম বিরোধী মহলের পর্বতসম বাধা ও প্রতিকূলতা মাড়িয়ে আল-কুরআনের তাফসীর করে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। যাঁর সমগ্র জীবনই দাঈ ইলাল্লাহ হিসেবে পরিব্যাপ্ত, তাঁর জীবনেতিহাস দু'চার পাতায় লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। তাই উপরিউক্ত আয়াতের আলোকে স্মৃতি সাগরের এলবাম থেকে সামান্য কিছু স্মৃতি সবার জন্য তুলে ধরলাম।

ব্যক্তিগত গুণরাজি: শহীদ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একটি নাম, একটি ইতিহাস একটি জীবন ও একটি শহিদি মরণ। বাংলার ইতিহাসে সাঈদী সাহেব একজনই, সাঈদী সাহেবের উপমা তিনি নিজেই। একই সাথে তিনি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুরআনের মুফাসসির। বাংলার জমিনে দ্বীন ক্বায়েমের সংগ্রামের এক অকুতোভয় সৈনিক। ইতিহাস স্রষ্টা এক অনুপম দুঃসাহসী দাঈ তিনি, যাঁকে আল্লাহ বাংলাভাষীদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে বাংলার জমিনে পাঠিয়েছিলেন, তাই মুসলিম ছাড়াও অগণিত অমুসলিম তাঁর হৃদয়গ্রাহী তাফসীর শুনে সুপথে এসেছেন। দেশ-বিদেশে অসংখ্য মহিলা স্বামী-সন্তানসহ দ্বীনের সন্ধান পেয়েছেন। যাকে নির্দ্বিধায় একজন মকবুল 'দাঈ ইলাল্লাহ' বলা যায়। ব্যক্তি সাঈদীর চেয়ে মুফাসসির সাঈদীই বিশ্বে সুপরিচিত নাম। তাঁর মধ্যে যেসব মানবিক গুণরাজির সমাহার কাছে থেকে দেখেছি:

- তিনি ছিলেন দ্বীনের একজন নিঃস্বার্থ, আপসহীন ও নিরহংকার দাঈ এবং ব্যবহারে অতি অমায়িক।
- হাস্যোজ্জল আলোকিত চেহারার সুদর্শন একজন মানুষ ছিলেন তিনি, মলিন চেহারায় কখনো দেখিনি।
- পোশাক-পরিচ্ছদসহ সুন্দর পরিপাটি থাকতে ভালোবাসতেন, চুল ও দাড়ি চিরুনী করতেন হামেশা।
- ওয়াজে এবং বাস্তবে নামাজ ছিল তাঁর অগ্রাধিকার, তাছাড়া শেষ রাতে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে থাকতেন।
- তাঁর ওয়াজ বা তাফসীর পুরাতন হয়নি, যত শুনি তত ভালো লাগে, এমনকি আজও সময় করে শুনি।
- ভোজন বিলাসী ছিলেন না, বরং খাবার-দাবারে খুবই হিসেবী, তবে সঙ্গীদের খাওয়াতেন মহব্বত করে।
- দুনিয়াবী লোভ-লালসা তাঁর চরিত্রে ছিল না, ছিলেন একনিষ্ট-মুখলিস তথা ইখলাসের মূর্ত প্রতিক।
- স্বার্থ হাসিলে কোন মুরিদ/শিষ্য তৈরি করেননি, নিয়মিত বিলেতে আসলেও পয়সার পেছনে ছুটেননি।
- যেকোনো দল-মতের আলেমদের সম্মান করতেন, সম্মানজনক শব্দ চয়ন করে তাঁদের সম্বোধন করতেন।

তাফসীর মাহফিল শুরুর ইতিহাস: মুসলিম মিল্লাতের প্রেরণার বাতিঘর শহীদ সাঈদীর প্রথম আল-কুরআনের তাফসীর ১৯৭২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি নিজ জেলা পিরোজপুর থেকে শুরু হয়। তখন থেকে প্রায় প্রতিটি জেলা সদর সহ দেশের আনাচে-কানাচে রাত-দিন আল্লাহর কিতাবের স্বচ্ছ আলো ছড়িয়ে দিতে চষে বেড়িয়েছেন তিনি। তার মধ্যে যেসব শহরে প্রতি বছর একাধিক দিবস ব্যাপী

মাহফিল করতেন, তার মধ্যে ৫দিন করে চট্টগ্রামে ২৮ বছর, সিলেটে ৩ দিন করে ৩০ বছর, পাবনা ২দিন করে ২৮ বছর, খুলনায় দিনব্যাপী ৪০ বছর, তাছাড়া বগুড়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী, রংপুর, ঝিনাইদহ, দিনাজপুরসহ টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্তগ্রীষ্মকালীন সময়ে সর্বত্র তিনি ওয়াজ ও তাফসীর মাহফিল করেছেন। আবার শীতের মৌসুম শুরু হতেই জনতার হৃদয়ের কণ্ঠ বিশ্বনন্দিত মুফাসসির অতিথি পাখির মত ডানাহীন কুরআনের এ পাখি আরব জাহান সহ ইউরোপ-আমেরিকা সফরে উড়ে যেতেন। এভাবেই আল-কুরআনের দাওয়াতের আলো ছড়িয়ে দিতে জনগণ নন্দিত এ মুফাসসিরের অহর্নিশি ব্যস্ততার কথা সমকালীন সরকারসমূহ ও দেশবাসীর অজানা নয়।

তাফসীর মাহফিলে বাধা দানের ইতিহাস: আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) ইয়াতিম সন্তান হিসেবে তাঁর বংশ এবং সমাজের কাছে খুবই বিশ্বস্থ ও সম্মানিত ছিলেন, সমাজপতিরা পর্যন্ত তাঁকে খুবই স্নেহ করত। কিন্তু প্রথম যেদিন মক্কার সাফা পর্বতে উঠে তাঁর আপনজনদের কাছে তিনি এক ইলাহের দাওয়াত পেশ করলেন, সেদিন থেকেই হঠাৎ করে পৌত্তলিক মক্কাবাসী তাঁর বিরুদ্ধে লেগে গেল। আপন চাচা আবু লাহাব ও চাচী উম্মে জামীল বলে উঠল "আর কোন কাজ পাওনি, এ কাজের জন্য আমাদের কাকডাকা ভোরে ডেকে এনেছ। তোমার মুখে থুথু দেই, আমাদের মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে তুমি লেগেছ! তাহলে তোমার রেহাই নেই"। আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর উপর লা'নত করে পুরো 'সুরা লাহাব' নাজিল করলেন। একবার নবী (সা.) দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা নগরীর বড়ো শপিং সেন্টার 'উকাজ বাজারে' গিয়ে লোকদের কাছে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন কুরাইশরা প্রচণ্ড বাধা দিল, যার ইতিহাস আল্লাহ আমাদের শিক্ষার জন্য সুরা হামীম আস-সাজদার ২৬ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। এভাবে কুরআন শুনলেই আবু জাহেলদের উত্তরসুরীরা যেখানেই থাকুক তারা আদা-জল খেয়ে কুরআনের বিরুদ্ধে লেগে যায়।

একবার ১৯৮৯ সালে সিলেটের তাফসীর মাহফিলে ঢাকা থেকে আসার পথে স্থানীয় প্রশাসন তাঁকে সিলেট বিমান বন্দর থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল। তখনকার তাঁর দুঃসাহসী ভূমিকার কথা আমাদের এখনো প্রেরণা যোগায়। শাহজালালের মাজার জিয়ারতের ব্যানার লাগিয়ে লাইটেস যোগে এশার পূর্বেই ঢাকা থেকে সিলেট মাহফিলে এসে তিনি হাজির। মাহফিলে আঁচমকা তাঁর উপস্থিতি স্থানীয় প্রশাসনসহ সিলেটবাসীকে হতবাক করে দিয়েছিল এবং অনেক রাত পর্যন্ত আলীয়া ময়দানে তাফসীরও চলেছিল। সেই দুঃসাহসী নেতা হলেন জনতার প্রিয় 'সাঈদী'।

এ বাধা কেবল সাঈদী সাহেবের বেলায় হয়নি, বরং আমাদের প্রিয় নবী (সা.) সহ সকল নবী এবং দ্বীনের দাঈদের বেলায় সর্বকালে হয়েছে। ইতিহাসের এ তিক্ত সত্য বিরোধীতা নবরূপে যুগে যুগে রিপিট হয়েছে। অসংখ্য নবীকে খুন করা, করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা, দেশান্তরিত করা, মিথ্যা কেইস দিয়ে বন্দি করা হয়েছে। দ্বীন এবং রবের একত্ববাদের কথা যখনই কেউ উচ্চারণ করেছে, বাধার স্টীমরোলার তার উপরই তারা চালিয়েছে। এটিই সত্য-সঠিক দ্বীনের আলামত। যার মিল আমাদের প্রিয় নবী (সা.)'র জীবনের সাথে রয়েছে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ও পরিণতি: আমাদের একান্ত প্রিয় শহীদ সাঈদী সাহেবের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বরং নবী (সা.)-এর জীবনে যেভাবে বাধা এসেছিল, সে বাধার পুনরাবৃত্তি হতে আমরা দেখেছি। সাঈদী সাহেবও তাঁর সমাজের কাছে স্বীকৃত খুবই প্রিয় একজন ভাল মানুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি যখনই কুরআনের তাফসীর অতি সহজভাবে পেশ করা শুরু করলেন এবং মাহফিলে আগতরা কুরআনকে অর্থসহ বুঝা শুরু করেছে এবং তিনিও ইসলাম প্রতিষ্ঠার দল জামায়াতের সদস্য হয়ে গেলেন, তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল প্রকাশ্যে তৎকালীন সরকার ও ইসলাম বিদ্বেষীদের বাধা। এ বাধার বেগ প্রচণ্ড আকার ধারণ করল এরশাদ সাহেবের আমল থেকেই। তখন থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে কটুক্তি, গালাগাল, রাজাকার, ধর্ম ব্যবসায়ী, স্বাধীনতা বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি অশ্রাব্য শব্দ ব্যবহার শুরু হয়ে গেল।

অবশেষে আওয়ামী সরকার ২০১০ সালে তাঁকে এরেষ্ট করে এবং 'যুদ্ধাপরাধী' ট্যাগ লাগিয়ে নাটকীয় কেস সাজিয়ে তাঁকে ফাঁসি দেবে, নাকি দেশ থেকে বহিষ্কার করবে নাকি আজীবন বন্দি করে রাখবে দিশা পাচ্ছিল না। ধর্ম নিরপেক্ষ এ সরকার তখন ৩জন বিচারপতির নেতৃত্বে আপিলেট ডিভিশন গঠন করে। বিচারপতিরা ঐক্যমতের রায় দিতে ব্যর্থ হয়েছে, বরং ৩ জন আলাদা আলাদা ৩টি রায় কোর্ট থেকে ঘোষণা করেছে। প্রথম জন তাঁকে 'বেখসুর খালাস' বলে রায় দিলেন, দ্বিতীয় জন দিলেন মৃত্যুদণ্ড, এবং তৃতীয় জনের রায় ছিল আমৃত্যু কারাবাস। তিনি আসামী হিসেবে কোর্টে বিচারপতিদের সামনে সেদিন যে ঐতিহাসিক বক্তব্য রেখেছিলেন তার সার সংক্ষেপ ছিল এভাবে, "সম্মানিত আদালত! আজকের এ বিচার পর্বটি দু'পর্যায়ে সমাপ্ত হবে, আজকের এ নাটকটি তার প্রথম পর্ব অর্থাৎ আপনারা আজ বিচারকের আসনে, আর আমি হচ্ছি আসামি। আরো একটি পর্ব হচ্ছে আখেরাতের আদালত, যেখানে সেদিন আল্লাহ হবেন একমাত্র বিচারপতি, আমি হবো বাদী আর আপনারা হবেন আমার জায়গায় সেদিনকার আসামি এবং আমার স্বাক্ষী হবে আজকের শুকরঞ্জন বালী। কাজেই সেদিনের ভয়ে আজ ন্যায় বিচার করতে আমি আপনাদের আবেদন জানাব। কেননা ন্যায়বিচারকারী বিচারকদের কেয়ামতে অনেক সম্মানজনক মর্যাদা দেওয়া হবে"। কিন্তু তাঁর এ আবেদনে তারা আদৌ কর্ণপাত করেনি। ঐক্যমতের রায় না হওয়ার কারণে শেষপর্যন্ত তাঁকে আমৃত্যু কারাবাসে যেতে বাধ্য করা হলো। বিচারকরা বেলজিয়াম বসে 'স্কাইপ' কেলেংকারির মাধ্যমে সে রায় তৈরি করেছিল, যা দুনিয়াবাসী সেদিন প্রত্যক্ষ করেছে। ইসলাম বিদ্বেষী এ সরকার নিজেদের হীন স্বার্থে এভাবে দেশের বিচার বিভাগকে কলুষিত করে চলেছে।

প্রিয় নবী (সা.) শে'বে আবু তালেব নামের জেলে ৮জন মহিলা ও শিশুসহ ৫২ জন সঙ্গীসহ বন্দি ছিলেন প্রায় ৩ বছর। কুরাইশ পৌত্তলিক নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে অমানবিক আচরণ করেছে, এমনকি তাঁর খাবার এবং পানীয় সরবরাহ একদম বন্ধ করে দিয়েছিল। যার প্রমাণ আমরা ইতিহাসের পাতায় পড়েছি, সমান পরিণতির ইতিহাস নবী ইউসুফ (আ.)-এর জীবনেও আমরা পেয়েছি।

তাছাড়া সুরা আনফালের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহও কুরাইশ কাফেরদের সংসদীয় সম্মিলিত সিদ্ধান্তের কথা বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) যেমন বিনা অপরাধে জেলে বন্দি ছিলেন, তেমনি শহীদ সাঈদীও বিনা অপরাধে জেলে ১৩টি বছর বন্দি ছিলেন। চোর-ডাকাতদের মত তাঁকে রিমান্ডে নিয়ে তাঁর উপর কত নিপীড়ন করা হয়েছে। যার অনেক খবর আমরা বাইর থেকে আদৌ পাইনি, এমনকি তাঁর পরিবারও না। তিনি ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কাউকে তাঁর কোন কষ্টের কথা বলেননি, আল্লাহই এ কঠিন সবরের বদলা দেবেন। আসলে বিশ্বব্যাপী কুরআনের দাওয়াতই তাঁর কাল হয়েছে।

ক্ষণজন্মা মুফাসসির: ইতিহাসের ক্ষণজন্মা এক মুফাসসিরে কুরআন তিনি, তাঁর মত দরস/তাফসীর পেশ করতে জীবনে আর কাউকে শুনিনি। তাই বিজ্ঞ তাফসীরকারক হিসেবে তাঁর মধ্যে যেসব গুণাবলি সবার জন্য শিক্ষণীয়:

- কুরআনের আয়াত দিয়ে কুরআনের তাফসীর তাঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল, যা তাফসীরের সর্বোত্তম তরীক্বা।
- তাঁর মত সুন্দর সাবলীল তাফসীর উপস্থাপনার প্রশংসা সর্বস্তরের আলেমের মুখে এখনও শুনা যায়।
- আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অনুপম সুরের কুরআন তিলাওয়াত, বুঝা যেত এখনই যেন তা নাজিল হচ্ছে।
- তাঁর ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দ চয়ন, বাচনভঙ্গী, সুললিত কণ্ঠ এবং যৌক্তিক উদাহরণের বিকল্প ছিল না।
- আল-কুরআন যে উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছিল, সে ভাবের আদান-প্রদান তাঁর উপস্থাপনায় পাওয়া যেত।
- কুরআন বুঝার জন্য যে বাস্তব ময়দান প্রয়োজন ছিল, সে ময়দানের নেতা হওয়ায় মানুষ সহজে কুরআন বুঝতে পারত এবং কথায়-কাজে মিল দেখে মানুষ ইসলামী আন্দোলনে নির্দ্বিধায় শরীক হত।
- লক্ষ লক্ষ শ্রোতার মনঃজগত স্পর্শ করতে জানতেন, তাই শ্রোতারা চুম্বকের মত আটকে যেত মাহফিলে।
- তাঁর সুর ধরে অসংখ্য মুফাসসির আল্লাহ তা'আলা বাংলার জমিনে সৃষ্টি করেছেন-আলহামদুলিল্লাহ।
- সিলেটের জমিনে তাঁর কণ্ঠ অনুসরণে সুন্দর ওয়াজ করতেন মাওলানা আবু তাইয়েব সৎপুরী (রাহি.)
- নবী ইব্রাহীমের মত এক ব্যক্তি এক উম্মত, এক সংগঠন, এক দাঈ, বিশ্ব মুসলিমের প্রিয় 'সাঈদী'।
- বাংলাদেশী অধ্যুষিত পৃথিবীর সকল প্রবাসী ভূখণ্ডে ছিল তাঁর বিচরণ 'আন্তর্জাতিক মুফাসসির' হিসেবে।
- তাঁর মত বেপরোয়া, হকের ব্যাপারে বজ্রকঠোর ও তাওয়াক্কুলকারী শ্রেষ্ঠ দাঈ দ্বিতীয়জন পাওয়া দুষ্কর।
- তাঁর গ্রেফতার ও তাফসীর মাহফিলে সরকার ও ইসলাম বিরুধীদের প্রচণ্ড বাধা এ কথার বাস্তব স্বাক্ষী।
- কিন্তু তিনি এতে দমে যাননি, বরং যত বাধা এসেছে তাঁর কাজের তীব্রতা আরো গতি সঞ্চার করেছে।

তাঁর তাফসীরের বিষয়বস্তুর সারমর্ম ছিল

- আল-কুরআন কি, কেন এবং মানবতার হেদায়েতই ছিল কুরআন পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য।
- তিনি সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে কুরআনের তাফসীর পেশ করতেন।
- তাঁর জ্ঞানগর্ব তাফসীরের আকর্ষণে কলেজ-ভার্সিটির ছাত্ররা বেশি আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে ইসলাম শিখেছে।
- আল-কুরআন যে বুঝে বুঝে পড়ে তাঁর উপর আমল করা লাগবে এটা অনেকেরই জানা ছিল না।
- মনে করা হত কুরআন তো কেবল তাবিজ, খতম ও তিলাওয়াতের এবং ছওয়াব হাসিলের কিতাব অথচ ইসলাম যে কুরআনের আলোকে একমাত্র সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা তা তিনিই প্রথমে মানুষকে শিখিয়েছেন।
- তাঁর তাফসীর থেকেই মানুষ আল্লাহকে ভয় করা ও আখেরাতে জবাবদিহির কথা জানতে পেরেছে।
- মানুষকে ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের কথা বুঝাতে ও ইসলামী দলে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি অর্থাৎ ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমর নীতি, নারীনীতি-ফতোয়া নীতি, শিক্ষানীতি, কৃষিনীতি, শিল্পনীতি অর্থাৎ পরিবার থেকে সংসদ পর্যন্ত ইসলাম চলতে পারে এ ধারণার রূপকার ছিলেন তিনি।

তাঁর কিছু দোয়া এমন ছিল

- মাহফিলের শুরুতে দুয়া করতেন 'হে আল্লাহ তা'আলা! এমন কথা আমার জবান থকে বের করে দিও, যা মানুষের দিলে আছর করে'–এ কথা বলে একটি সংক্ষিপ্ত দোয়া দিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতেন।
- মাটির নীচের সকল মুমিন-মুমিনাতদের মাগফিরাত চেয়ে ও জাতির কল্যাণ কামনা করে শুরু করতেন।
- মাহফিলে অভ্যাসগত মেহমানবৃন্দকে উপযুক্ত সুন্দর বিশেষণে সম্বোধন করতে আদৌ ভুল করতেন না।
- ইলেকশনের আগে এ দোয়া করতেন, 'আল্লাহ তুমি আমাকে মুশরিকের সামনে বেইজ্জত করো না'।
- তিনি দোয়া করতেন সবার পিতা-মাতাসহ মুসলিম মিল্লাতের সবার জন্য, এমনকি পুলিশদের জন্যও।
- হামেশা মাহফিলে কান্না করে শাহাদতের মৃত্যু কামনা করতেন, 'শাহাদতের মৃত্যু পিপড়ার কামড়ের চেয়েও কম ব্যথার' বলে শহীদ হতে গলা ছেড়ে দোয়া করতেন, বদর-ওহুদের শহীদদের নাম ধরে ধরে মর্যাদা বর্ণনা করে বয়ান করতেন যেকোনো মাহফিলে, যার স্বাক্ষী মাহফিলের ক্যাসেট সমূহ।

বিশ্ব সফর

সাঈদী সাহেবের বিদেশ সফরের অন্ত নেই। গালফ এবং আমিরাত ছাড়াও এমন কম আরব দেশ আছে, যেখানে তাঁর গমনাগমন বা মাহফিল হয়নি। তাছাড়া ইউরোপ-আমেরিকা কতবার সফর করেছেন, তার সঠিক খবর পাওয়া কঠিন। অনেক তাহকীকের

পর যা পেয়েছি তা হলো, ১৯৭৯ সালের আগস্টে প্রথমে লন্ডনে এসেছেন এবং কনকনে শীতে বিভিন্ন স্থানে মাহফিল করেছেন। কোন কোন সময় সংগঠনের ভাইদের বাসা ছাড়াও অন্যান্য স্থানে অস্থায়ীভাবে থাকলেও হাজী আব্দুল হান্নান সাহেবের বাড়িতে মোটামুটি স্থায়ীভাবে থেকেছেন। সংগঠনের ভাইয়েরা ছাড়াও তাঁর ভক্তদের মাঝে যারা রাত-দিন তাঁর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের উল্লেখযোগ্য হলেন, মরহুম মাওলানা আব্দুর রহিম, হাফিয আব্দুস সুবহান আজাদী, আব্দুল মু'মিন, হাজী নাজমুল ইসলাম, মুহাম্মদ আলী, আখতার হুসেন কাউসার সহ আরো অনেকেই। আমেরিকা-কানাডায় তুলনামূলক তাঁর সফর কম হলেও ইংল্যান্ডে হয়েছে বেশি। তিনি পৃথিবীর ৫২টি দেশে আল-কুরআনের দাওয়াতি সফর করেছেন। বিশেষকরে তাঁর সউদী আরবের জেদ্দা ও রিয়াদ, কুয়েত ও কাতারের মাহফিলগুলো আজও ইউটিউবে শুনে আসতে পারেন। দুবাইয়ের মাহফিলের নিরাপত্তার জন্যে দুবাই সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন রীতিমত হিমশিম খেয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে মানুষকে জিজ্ঞেস করেছে সাঈদী সাহেবের এত জনপ্রিয়তা কেন? তিনি ইরান-ইরাকের যুদ্ধ সন্ধির শান্তি কমিশনের সম্মেলনের অন্যতম মেহমান ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনের এ অবদান কবুল করুন এবং সকল জায়গার আয়োজকদের আজরে আযীম দানে ভূষিত করুন।

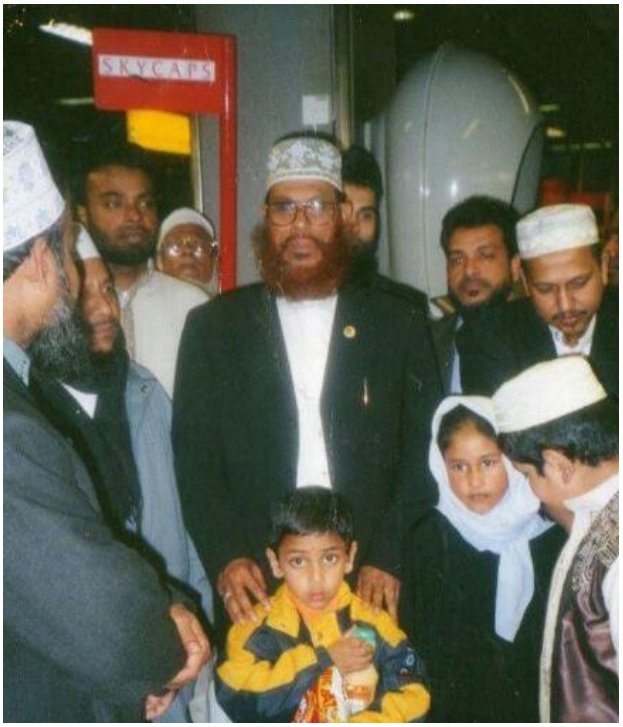

বিদেশে চিকিৎসা

তাঁর লন্ডনের নিয়মিত চিকিৎসক ছিলেন ডাক্তার আহমদ হুসেন। ডাক্তার সাহেবের সার্জারী ছিল পূর্ব লন্ডনের কেনন স্ট্রীটে। লন্ডন এসে পৌঁছলেই প্রথমে একবার চেকআপ করে প্রয়োজনীয় ঔষুধ-পত্র সেবন করতেন, আবার ফেরত যাবার সময় হয়ে গেলে ফাইন্যাল চেকআপ করে বিদায় নিতেন। একবার ডাক্তার হোসেন সাহেব তাঁর উচ্চ চিকিৎসার জন্য লন্ডনের একটি বিখ্যাত হাসপাতালে রেফার করলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে বিধি বাম! মহিলা তাঁকে চেকআপ করে ঔষধ দিলেন না, বরং কিছু মৌখিক পরামর্শ এবং নিয়মিত ব্যায়ামের কিছু টেকনিক বাতলে দিয়ে বললো 'থেন্ক ইউ ফর ভিজিটিং মি'। বেচারী একটা ঔষধ তো দিলই না, বরং উল্টো ওয়ায়েজকে ব্যায়ামের ওয়াজ-নছীহত করে খালি হাতে একটা 'থেন্ক ইউ' দিয়ে বিদায় করে দিল।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেবের সাথে সৌজন্য বৈঠক: সম্ভবত ১৯৯৭ সাল। প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেব লন্ডন এসে সাঈদী সাহেবকে খবর দিয়েছেন দেখা করার জন্যে। দেশের রাজনীতির উপর পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খুব জরুরি মতবিনিময় বৈঠক হবে। সাবেক প্রেসিডেন্টের সাথে একান্ত বৈঠক হবে, আমারও যাবার জন্য বেশ আগ্রহ। তারিখ এবং সময় নির্ধারিত হলো, আখতার হোসাইন কাউসার ভাই ড্রাইভ করবেন এবং সঙ্গী হিসেবে আমি থাকব। সাউথ লন্ডনের চেলসীর একটি ৫ স্টার হোটেলে এরশাদ সাহেবের সাথে মোলাকাত হল সম্ভবত সকাল ১১টার দিকে। আমরা হোটেলে পৌঁছেই লবির সোফায় বসে উপস্থিতির খবর দিলাম। আখতার ভাই গাড়ি পার্ক করে আসতে বিলম্ব হচ্ছে, আমি সঙ্গে একা। খানেক পরে স্বয়ং এরশাদ সাহেব নিজে বের হয়ে সাঈদী সাহেবের সাথে হাত মিলিয়ে স্বাগতম জানালেন। সাবেক প্রেসডেন্ট নাস্তা অফার করলেন এবং তিনি নাস্তা করে বের হয়েছেন, এ জন্য কিছুই খাবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। আমি কিছুটা হলেও সঙ্গী হিসেবে কষ্ট পেয়েছি খেতে না পেরে নয়, বরং কি দিয়ে বেচারা এত বড়ো মেহমানকে নাস্তা করায় তা দেখার তীব্র আগ্রহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায়। কয়েক মিনিট আলাপের পর আমাকে রেখে দু'জন ভেতরের বৈঠকরুমে চলে গেলেন। প্রায় ৩০-৪০ মিনিট একান্ত বৈঠকের পর সাঈদী সাহেব বেরিয়ে এলেন এবং রীতিমত প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেব এগিয়ে এসে তাঁকে বিদায় জানালেন। বৈঠকের গায়েবী খবর তো আর পাওয়া গেল না।

তাঁর খেদমত করার সৌভাগ্য: ১৯৯৭ সালে তাঁকে 'ইসলামিক ফোরাম অব ইউরোপ' দাওয়াত করে এনেছিল, সে বছর সংগঠন থেকে আমি তাঁর খেদমত করতে ও সারা দেশে প্রোগ্রাম ম্যানেজ করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলাম। জনাব আতিকুর রহমান জিলু ভাই তাঁর খাদেম তথা সফর সঙ্গী। এ দাওয়াতি কাজে রাত-দিন দু'জনে গ্রেট বৃটেন চষে বেড়িয়েছেন। বিভিন্ন মাহফিলে তাঁর আগে বয়ান করার অপূর্ব সুযোগ পেয়েছিলাম বলে আমি আমাকে ধন্য মনে করছি। তাঁর ওজর থাকায় সান্ডারল্যান্ড মসজিদে একা আমাকেই বয়ান করতে হয়েছিল সেদিন। বৃটেনের বড়ো বড়ো সিটিসহ বিভিন্ন শহরে সংগঠনের ইউনিট এবং ব্রাঞ্চ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও সেন্টার গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ঐ বছর লন্ডন কিংসক্রস আল-নেহার মসজিদ, বো এলাকার কিংস্লী হলের মহিলা মাহফিল, কার্ডিফের সুপরিচিত শাহজালাল মসজিদসহ অনান্য মসজিদে তাঁর পূর্বে আমাকে বক্তব্য রাখতে হয়েছিল।

১৯৮০/৮১ সালে ফিল্ডগেট স্ট্রীটে বরফগলা টান্ডার মধ্যে বিশাল মাহফিল করে ইস্ট লন্ডন মসজিদের জন্য ফান্ডরেইজ করেছেন তিনি। মসজিদ তৈরির বছর কয়েক পর ২০০৪ -এ এল.এম.সি'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য মুসলিম দেশের এম্বেসেডরস ও মন্ত্রীসহ

কা'বা শরীফের প্রধান ইমাম শায়েখ আব্দুর রহমান আস-সুদাইস সাহেবের সাথে তাঁকেও আমরা পেয়েছিলাম সম্মানিত মেহমান হিসেবে। এ মসজিদে তিনি বাংলাদেশী কমিউনিটির উদ্দেশ্যে ২০০৮ সাল (অর্থাৎ দেশে গ্রেফতারের পূর্ব) পর্যন্ত তাফসীর এবং ওয়াজ মাহফিল করেছেন যখনই বৃটেনে এসেছেন। ফলে অসংখ্য মানুষ মদ, জুয়া, লটারি ও হারাম ব্যবসা-বাণিজ্য ও যেনা-ব্যভিচার ত্যাগ করে দ্বীনের পথে আসার সন্ধান পেয়েছে তাঁর ওয়াজ শুনে। যার ফলাফল হিসেবে দীর্ঘদিন পরেও আজ আমরা লন্ডনের মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

লন্ডনের ওলামা-মাশায়েখ মাহফিল: লন্ডন আসলে স্থানীয় অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের খোঁজ-খবর নিতেন। ২০০১ সালে ধর্ম নিরপেক্ষ সরকারের ফতোয়া বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে সর্বদলীয় 'ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি'র উদ্যোগে আমরা আলতাব আলী পার্কে বিশাল ওলামা-জনতা সমাবেশ করেছিলাম তাঁকে প্রধান মেহমান করে। এতে লন্ডনের ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও বিশেষ মেহমান ছিলেন (লন্ডন সফররত) সিলেটের কাজির বাজার মাদ্রাসার মুহতামিম প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রহমান (রাহি.) ও শেখ তোফাজ্জল হোসাইন হবিগঞ্জী (রাহি.) সহ আরো অনেকেই। এ সময় প্রিন্সিপাল সাহেবসহ আমরা ইস্ট লন্ডন মসজিদে মাসের পর মাস কত প্রস্তুতি সভা করেছি, এমনকি প্রিন্সিপাল সাহেব সাঈদী সাহেবের সম্মানে শায়েখ আব্দুল কাইয়ুম সাহেব সহ আমরা ক'জনকে তাঁর বাসায় এক আলীশান দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছিলেন। সিলেটের প্রথিতযষা এ আলেমের দিল যে এত বড়ো; তা আমাদের জানা ছিল না। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। আলেমদের ঐক্যের সে সোনালী ইতিহাস ভুলে যাবার নয়। শহীদ সাঈদীর ওয়াজ ও চরিত্র থেকে দীক্ষা নিয়ে আমরা ইসলামী আন্দোলনে এসেছি। এমনকি তাঁর অনুসরণে কুরআনের দারস দিতে শিখেছি, যার উদ্দীপনা এখনও দিল থেকে অনুভব করি। তিনি ছিলেন দা'ওয়াহ জগতের এক উজ্জল নক্ষত্র, বিশেষত: তাফসীর জগতের বাংলাভাষী এক কিংবদন্তি।

এটি স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না: কেইসের শুরু থেকেই শহীদ সাঈদীকে আওয়ামী জালেমরা পার্শ্ববর্তী বন্ধু রাষ্ট্রের পরামর্শে ফাঁসি দিতে অনড় ছিল। যা তারা বেআইনীভাবে ঘোষণাও দিয়েছিল। কিন্তু পরে ঘোষণার সাথে সাথেই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সারা দেশে গণ মিছিল বের হল এবং সেসব মিছিলে আওয়ামী পুলিশ লীগ বেধড়ক হামলা করে এবং ঘটনাস্থলেই প্রায় দু'শর অধিক সাঈদী প্রেমিক জনতা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করল যে বিশ্ব নন্দিত কুরআনের এ পাখিকে তাঁরা কী পর্যন্ত ভালবাসে। অতঃপর বেআইনী নাটকের মঞ্চ 'যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল' তাদের 'কালো আইন' দিয়ে তাঁকে আমৃত্যু জেলে বন্দি করে দিল। যখন আইন দিয়ে ফাঁসি দিতে পারেনি, তখন থেকে তারা পেরেশান হয়ে কোন একটি অসীলা খুঁজতেছিল যে কীভাবে তাঁকে হত্যা করা যায়। এবার তাঁর এ হার্টের রোগের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আসন্ন নির্বাচনের পূর্বেই হত্যার ব্যবস্থা করল। এটি আর কারো বুঝতে থাকলো না। জনগণ যে কারণগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সরকার থেকে জানতে চাচ্ছে তা নিম্নরূপ:

- হৃদরোগের রোগীর কোন আলামত অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট হতে কেউ দেখেনি বা নার্সরাও বলেনি।
- যদি হার্টের রোগের কারণে শ্বাস নিতে কষ্টই হচ্ছিল তাহলে অক্সিজেন মাস্ক তাঁকে কেন পরানো হলো না?
- তাঁকে হাসপাতাল পরিবর্তনের নাম করে কেনো দু'ঘণ্টা পর্যন্ত বিনা চিকিৎসায় এম্বুল্যান্সে বসিয়ে রাখা হল।
- সাঈদী সাহেব নিজে বলছেন "আমাকে রেফার্ড করার দরকার নেই, বরং আমাকে আমার বাসায় বা যেখানে ছিলাম সেখানে পাঠিয়ে দিন", কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে জোরকরেই পি.জি তে পাঠাল।
- সম্ভবত তিনি তাদের গোপন ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরেছিলেন, তাই এ অনুরোধ করেছিলেন।
- তাজউদ্দীন হাসপাতাল থেকে বিদায় হবার সময়ে ডাক্তার এবং সার্জনদের কৃতজ্ঞতা আদায় করেছেন।
- অনেকেই আবেগ আপ্লুত হয়ে তাঁর কাছে দোয়া চেয়েছেন এবং একজন সার্জনের মাথায় হাত বুলিয়েছেন।
- এ সুযোগে গোপন পরমর্শ করেই গণজাগরণের ঐ আওয়ামী ডাক্তারকে পি.জি তে ডেকে পাঠানো হয়েছে।
- অনেক বিলম্বে করে হলেও গাড়ী থেকে নামিয়ে তাঁকে পি.জি তে আনা হয়েছে, সে মুহূর্তেও তাঁকে স্ট্রেচে করে আনা হয়নি বরং হুইল চেয়ারে বসিয়ে বেড়ে নেওয়া হয়েছে, যা হার্টেও রোগীর বেলায় অন্যায়।
- তিনি হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স এবং ভিড় করা মানুষগুলোকে সেখানে একজন পুরো সুস্থ মানুষের মত সালাম এবং সুন্দর একরাশ হাসি দিয়ে আপনারা কেমন আছেন বলে তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন।
- তাঁর সেবায় নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের জন্য দোয়া করেছেন এবং তিনি সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।
- এতেই প্রমাণ মিলে যে, তিনি স্বাভাবিক হৃদরোগী ছিলেন, অস্বাভাবিক কোন আলামত তাঁর মধ্যে ছিল না।
- তাঁকে ইনজেকশন দেবার প্রস্তুতি যখন চলছিল, তখন তিনি নিজে আপত্তির সুরে জিজ্ঞেস করেছেন আমাকে কিসের ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে? ডাক্তার বলেছে, "এটা আপনার জন্য অনেক ভাল হবে"।
- অথচ নার্স স্বাক্ষ্য দিয়েছে "ইনজেকশনের সাথে সাথেই সাঈদী হুজুর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন"।
- অসুস্থ পিতাকে দেখার জন্য ছেলেদের বার বার দাবি করা স্বত্বেও কোন সুযোগ দেওয়া হল না কেন? না তারা ভেতরে ঢুকে পড়লে এ ষড়যন্ত্র করা যাবে না, ঘটনার আগেই তারা বুঝে উঠতে পারে– এ আশঙ্কায়।
- ইন্তেকালের পর পি.জি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জনগণের কাছে তাঁর অবস্থা বিবৃত করতে চেয়েছিল, কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রস্তুতি নেওয়ার পরও সরকার কেন তা বন্ধ করলেন, তারা এর কী ব্যাখ্যা দেবেন?
- গণজাগরণের ঐ নাস্তিক ডাক্তার আজ পর্যন্ত কী ইনজেকশন পুশ করেছে তার নাম প্রকাশ করেনি কেন?
- অথচ হৃদরোগের রোগীকে কোন ইনজেকশন দেবার কথা নয়, বরং শ্বাসকষ্ঠ হলে অক্সিজেন দেওয়ার কথা।

- ইন্তেকালের পর লাশ পরিবারের হাতে না দেওয়ার হীন প্রচেষ্টা কি 'মানবতা বিরোধী' ও বেআইনী নয়?
- লাশবাহী গাড়িতে পুলিশ তাঁর আপন ছেলেদেরকে সাথে নিতে বাধা দেওয়ার কী কারণ থাকতে পারে?
- লাশকে বাড়ীতে নেওয়ার এবং বিধবা স্ত্রীকে শেষবারের মত একটিবার কেন দেখতে দেওয়া হয়নি?
- বড়ো ছেলে পিতার জানাযায় আসতে বাধা স্বরূপ ঢাকায় তাঁকে প্রায় দু'ঘণ্টা আটকে রাখা হলো কেন?
- সরকারের বক্তব্য এ পর্যন্ত না আসায় এবং হাসপাতালের ব্রিফিং বন্ধ করায় সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে।

সাঈদী প্রেম বিশ্বময়

কুরআনের পাখির ইন্তেকালে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্ব যেভাবে শোকহত হয়েছেন এবং নিজেদের শোকের কথা বিবৃতি, ভাষণ, প্রবন্ধ, পোস্ট, গান ও কবিতার মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়াসহ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করছেন, তাঁর নজির ইতিহাসে খুবই দুর্লভ।

তাঁর ইন্তেকালে অমুসলিম বিশ্ব থেকে প্রতিক্রিয়া

- ইউরোপ-আমেরিকাসহ অমুসলিম বিশ্বের মুসলিম কমিউনিটির স্থানীয়ভাবে অসংখ্য গায়েবানা জানাযাহ।
- অমুসলিম দেশের বিভিন্ন মসজিদ ও সেন্টারে ৯৩ এর অধিক গায়েবানা জানাযাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মুসলিম বিশ্বের সুপরিচিত দাঈ ভারতীয় নাগরিক জাকির নায়েক তাঁর খবর পেয়েই প্রথম বিবৃতি দিয়েছেন।
- ভারতের নাদয়াতুল উলামার সাবেক রেক্টর মাওলানা সালমান নদভী সাহেব অনুরূপ বার্তা পাঠিয়েছেন।
- মাওলানা মুফতী আব্দুল মুন্তাকিম সাহেব ইকরা টি.ভিতে উর্দুতে দীর্ঘ সময় আলোচনা ও দোয়া করেছেন।
- ভারতের জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের মাওলানা শৌকত আহমাদ সাহেব দীর্ঘ বয়ান পাঠিয়েছেন।
- বৃটেনের জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের অনেক দায়িত্বশীল উলামা তাঁর প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
- গ্রেট বৃটেনের ছোট-বড়ো প্রায় মসজিদের কমিটি, খতীব, শায়েখ ও ইমামগণ মসজিদে মসজিদে দোয়া, আলোচনা ও গায়েবানা জানাযাহ করেছেন এবং বিভিন্ন ইসলামিক টি.ভি চ্যানেলও নিউজ কাভার করেছে।
- আমেরিকার নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডি.সি, মিশিগান, ক্যালিফর্নিয়াসহ বড়ো বড়ো সিটি এবং আরব-আজমী মসজিদ সমূহে তাঁর জন্য অসংখ্য গায়েবানা জানাযাহ ও অগণিত দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া

- সুদানের বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান ও দেশের গ্রান্ড মুফতী শায়েখ ইসাম আল-বাশীর বিবৃতি দিয়েছেন।
- মুসলিম বিশ্বের মধ্যে কা'বা শরীফের প্রধান ইমাম শায়েখ আব্দুর রহমান আস-সুদাইস দোয়া করেছেন।
- সম্পূর্ণ আলাদাভাবে শায়েখ ইউসুফ কারদাভীর প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বিবৃতি আন্তর্জাতিক মিডিয়া ছাপানো হয়েছে।
- ইখওয়ান নেতা তাঁর দল ও দেশের পক্ষ থেকে শোকবার্তার পাশাপাশি পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন।
- ফিলিস্তিনের সম্মিলিত ওলামা পরিষদ ও ইন্তেফাদা দলসহ আরো অনেকেই শোক বার্তা পাঠিয়েছেন।
- তাঁর জন্য মিশর, ইরাক, তুরস্ক, সুদান, আলজেরিয়া, কুয়েত, কাতার আবুধাবী, দুবাই, সৌদী আরব ও বাহরাইনসহ প্রায় সকল মুসলিম দেশের মসজিদে মসজিদে অসংখ্য গায়েবানা জানাযাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- তাছাড়া বাংলাদেশের এমন কোন পরিচিত আলেম বা প্রতিষ্ঠান নেই যারা সাঈদী (রাহি.) -এর জন্য দোয়া করেননি অথবা বিবৃতি দেননি, ইতিহাসে আলেম সমাজের এমন সহানুভূতি খুব কমই দেখা গিয়েছে।
- বিশেষকরে হেফাজতে ইসলামের বাবু নগরী হুজুর, বি.এন.পি. ও চরমোনাইয়ের পীর, নেজামে ইসলাম, নিজামে ইসলাম, তাদের যুব সংঘ, ইসলামী ঐক্যজোট, এ.বি পার্টি, ইসলামী যুব সমাজ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, উভয় খেলাফত মজলিসসহ আরো অনেকেই।

(দ্রষ্টব্যঃ ১৫ই অক্টোবর ইমরান আহমদের ফেইসবুকের আই.ডি থেকে এ খবর সংগ্রহ করা হয়েছে।)

উপসংহার: 'আলোর পথ' ম্যাগাজিনের বিদগ্ধ পাঠকদের জন্য অনেক কাজ তিনি দিয়ে গেছেন যা না করে কেবল সাঈদী প্রেমে আসক্ত হলে চলবে না, কাজেই নিম্নলিখিত কয়েকটি অনুরোধ প্রস্তাব সবার জন্য রাখতে চাই:

- তিনি যেভাবে কুরআনের দাওয়াত বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, আমাদেরও তাঁর অনুসরণে দাঈ হওয়া।
- কুরআনের প্রতি আমাদের যে ৫টি দায়িত্ব আল্লাহ দিয়েছেন, তা আমাদের নিয়মিত পালন করা, যেমন: ১. শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত শেখা এবং অপরকে তা পড়ানো, ২. নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তোলা ৩. কুরআন বুঝে বুঝে পড়া, ৪. যা বুঝা হলো, তার উপর নিজে আমল করা, ৫. এবং অন্যকে কুরআনের উপর আমল করতে দাওয়াত দেওয়া।
- কুরআন বলছে মুসলিম মিল্লাতকে ঐক্যবদ্ধ হতে, কাজেই দ্বীনের কাজের লক্ষ্যে আমাদের সংঘবদ্ধ হওয়া।
- শহীদ সাঈদীর জন্য সর্বদা দোয়া অব্যাহত রাখা এবং তাঁর এলাকা ও মাদরাসায় পারলে সাহায্য পাঠানো।

তিনি দোয়া চেয়েছেন, আমরাও দোয়া করি, মহান আল্লাহ তাঁর মৃত্যুকে শাহাদাতের মউত হিসেবে কবুল করুন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসকে 'নুযুল' হিসেবে উপহার দিয়ে তাঁর মেহমানদারি করুন।

লেখক: দাওয়া সেক্রেটারী, এম. সি. এ.
ইমাম ইস্ট লন্ডন মসজিদ
লন্ডন, সোমবার ১৮ই সেপ্টেম্বর'২০২৩

শহীদ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.)

ডা. মোহাম্মদ আমিন

আমার 'কোরআনের পাখি'

আল্লামা শহীদ দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) এর সাথে পরিচিত হই বাংলাদেশে প্রথম সিরাতুন্নবী (সা.) মহাসম্মেলনে, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। তখন আমি ঢাকার ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। দ্বিতীয়বার আরও ঘনিষ্ঠ হই ফেনী ট্রাংক রোড জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে। এস.এস.সি পরীক্ষা শেষে তখন আমি গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। মুসলিম ঐতিহ্য অনুসারে আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরিতে পবিত্র কোরআন-হাদিস ছাড়াও তাফসীর যেমন মাওলানা আকরাম খাঁ এবং বিভিন্ন ইসলামি সাহিত্য (মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা, যে সত্যের মৃত্যু নেই, মোস্তফা চরিত, বিষাদ সিন্ধু ইত্যাদি) ছিল। সুযোগ অনুযায়ী দূরের কাছের অনেক ওয়ায়েজদের আলোচনা শোনারও সৌভাগ্য হয়েছিলো। কিন্তু আল্লামা সাঈদীর মাহফিলে প্রথম অভিভূত হই পবিত্র কোরআনের প্রাণ মুগ্ধকর তেলাওয়াত ও বিশুদ্ধ বাংলায় এর ব্যতিক্রম উপস্থাপনায়। তাঁর গভীর জ্ঞানের বাগ্মিতায় ভেসে যায় শুধু শির্ক বেদাত নয় বরং তৎকালীন সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের মতো মানবরচিত সকল মতবাদের অসার তন্ত্রমন্ত্র। সর্বোপরি রাসুল (সা.) এর সমাজের আলোকে আজও আমাদের ব্যক্তি জীবনে এবং সামষ্টিক জীবনে উন্নয়ন সাধন করে আমাদের প্রিয় জন্মভুমি বাংলাদেশে একটি সুখি, শোষণমুক্ত, ইনসাফভিত্তিক ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠন সম্ভবত তিনি কুরআনের তাফসীরে ক্ষুরধার যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরেন। এভাবে আমি মনের অজান্তে ইসলামের অনুসারী থেকে ইসলামের আশেক হিসাবে গড়ে উঠি। আমার বিশ্বাস সারাজীবন 'কোরআনের এই পাখি' আমার মতো অগণিত সংখ্যক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজকে গতানুগতিক মুসলিম থেকে কোরআনের কর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে বিশাল অবদান রেখে গেছেন। আরশের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে এ সকল মহান অবদানের জন্য তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমিন।

আল্লামা সাঈদী শাহাদাত বরণ করেছেন

এ প্রসঙ্গে শুরুতে বলা যায় এটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে,

আল্লামা সাঈদী (রহ.) কে তাঁর জন্য Right এবং Available চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। Medicolegal দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে এতে পদে পদে রয়েছে অনেকগুলো ভয়াবহ মেডিকেল মেলপ্রাকটিস আর ইথিক্যাল মিসকনডাক্ট ও সংঘটিত হয়েছে।

প্রথমত: Medically unacceptable delay হৃদরোগ চিকিৎসার মূলনীতি হচ্ছে Every second counts অর্থ্যাৎ প্রতিটি সেকেন্ডই অতি গুরুত্বপূর্ণ; এক্ষেত্রে হার্ট এটাক্ট সনাক্ত করার পর কারা কর্তৃপক্ষের মেডিকেল টিম তাকে কার্ডিয়াক সেন্টারে না নিয়ে কেন শহীদ তাজউদ্দিন হাসপাতালে পাঠালে?

দ্বিতীয়ত: Wrong Referral কারাগারে থাকা অবস্থায় যখন আল্লামা সাঈদী (রহ.)-এর প্রথম হার্ট এটাক্ট হয় ২০১২ সালে, তখন তাকে ডায়াবেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য জটিল মেডিকেল অবস্থার কারণে বারডেম ইব্রাহিম কার্ডিয়াক সেন্টারে এনজিও প্লাসটি (হার্টে রিং পরানো) করা হয়। সেই সফল চিকিৎসার কারণে তিনি গত ১১ বছর হার্টের জটিলতা থেকে মুক্ত ছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে সেদিন তাঁর হার্ট এটাকের সাইন এবং সিমটম সনাক্ত হওয়ার পর তাকে শহীদ তাজউদ্দিন হাসপাতাল থেকে সরাসরি ইব্রাহিম কার্ডিয়াক সেন্টারে রেফার করা হলো না কেন? যেখানে তাঁর পূর্ব চিকিৎসার সকল কাগজপত্র যেমন এনজিওগ্রাম রক্ষিত ছিল। অথচ তাকে রাস্তার অপর পাশে বিএসএমইউ'তে (পিজি হাসপাতালে)

ভর্তি করা হয়।

তৃতীয়ত 'Ethically Wrong Decision'। গণতান্ত্রিক বিশ্বের চিকিৎসকদের রাজনীতি করার অধিকার অবশ্যই আছে। সেই অধিকারের অংশ হিসাবে যদি কোন চিকিৎসক কারো ফাঁসির জন্য রাজপথে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সেই চিকিৎসক উক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করার ইথিক্যাল রাইট হারান। আমরা জানি আল্লামা সাঈদী ও তাঁর সাথীদের রাজনৈতিক কারণে ফাঁসির দাবিতে শাহবাগে যে আন্দোলন করা হয়েছিলো তাদের অন্যতম নেতা ছিলেন আজকের প্রফেসর জামান। আমরা আরও জানি আল্লামা সাঈদীকে বিএসএমইউ হাসপাতালের কার্ডিউলজি (হৃদরোগ) বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মেশকাতের অধীনে প্রথমত: ভর্তি করা হয়। এখন প্রফেসর মেশকাত সাহেবের নিকট প্রশ্ন? আপনি কেন মেডিকেল ইথিক্স লঙ্ঘন করে ফাঁসির দাবিকারী একজন চিকিৎসকের হাতে আপনার অধীনে ভর্তিকৃত একজন রোগীকে ট্রান্সফার করলেন? আর কেনইবা প্রফেসর জামান সাহেব আল্লামা সাঈদীর চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন? এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'Sensitve Relation' এর কারণে যুক্তরাজ্য সহ উন্নত দেশ সমূহে কর্মরত চিকিৎসকরা নিজেদেরকে এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা করার অধিকার হারান।

চতুর্থত: 'Wrong Treatment' চিকিৎসার মূলনীতি ও চিকিৎসা পদ্ধতি স্বজ্ঞানে লঙ্ঘন করা হয়েছে। আল্লামা সাঈদীর সেই মুহূর্তে 'প্রাইমারী পিসিআর' করা একান্ত জরুরি ছিল। প্রফেসর জামান তা উপলব্ধি করে সেই পজেটিভ সিদ্ধান্তের কথা তার প্রথম ভিডিও বার্তায় প্রচার করেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে কোন প্রকার 'Contraindication' ছাড়াই তিনি তা স্থগিত করলেন, তা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞতো দূরের কথা একজন সাধারণ নবীন ডাক্তারের কাছেও বোধগম্য নয়। তবে এটা কি তিনি উপরের ইশারা বা নির্দেশে করেছেন? কেনই বা জরুরি ভিত্তিতে 'এনজিওগ্রাম' করা হলো না?

পঞ্চমত: 'Moral Right' লঙ্ঘন করা হয়েছে। সারা বিশ্বে (বাংলাদেশসহ) এমন কী মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পূর্বেও অভিযুক্তকে শেষ ইচ্ছা এবং পরিবারের নিকটতম সদস্যদের সাথে দেখা করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়। আল্লামা সাঈদীর আন্তর্জাতিক বিচার অঙ্গনে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ রাজনৈতিক বিতর্কিত বিচারেও এতো গুরুত্বর অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। তারপরও কেন হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা কক্ষের অপর পার্শ্বে অবস্থানরত তাঁর সন্তানদের শেষ আকুতির পরেও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আল্লামা সাঈদীকে একনজর দেখার সুযোগ দেওয়া হয়নি?

ষষ্ঠত: মেডিকেল 'Follow Up' সহ সকল নাগরিকের চিকিৎসা পাবার সাংবিধানিক অধিকার থেকে আল্লামা সাঈদীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ২০১২ সালে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে হার্ট অপারেশনের পরে ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য মেডিকেল জটিলতার জন্য তাকে ৬ মাস পরপর না হলেও বছরে অন্তত একবার বিশেষজ্ঞদের অধীনে ফলোআপ চিকিৎসা প্রদান করার জন্য বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক মেডিকেল Protocol এর দাবি। এই ন্যূনতম চিকিৎসার অধিকার থেকেও কারা কর্তৃপক্ষ আল্লামা সাঈদীকে বঞ্চিত করেছেন পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার আবেদনের পরেও।

অষ্টমত: মেডিকোলিগ্যাল মিসকনডাক্ট। প্রফেসর জামান সাহেব বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর মেশকাতের কাছ থেকে রেফারেলের পর নিজে আল্লামা সাঈদীর চিকিৎসার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অথচ এখন প্রফেসর জামান সাহেব নিজেকে দায়মুক্ত করে আল্লামা সাঈদীর অপ-চিকিৎসার দায়ভার প্রফেসর মেশকাতের উপর চাপানোর এ কোন অপকৌশল।

নবমত: আল্লামা সাঈদীর জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন না করা। দেশের প্রতিটি সাধারণ নাগরিকের সুচিকিৎসা পাওয়া সাংবিধানিক অধিকার। এক্ষেত্রে জটিল অবস্থা সৃষ্টি হলে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশের সকল হাসপাতালেরই একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আল্লামা সাঈদী তো অতি সাধারণ রোগী ছিলেন (যা পরে আলোচনা করা হয়েছে) আর তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা ও ছিল বেশ কঠিন। এ অবস্থায় মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হলো না কেন– এ প্রশ্নের কী জবাব দিবেন প্রফেসর মিশকাত ও জামান সাহেব?

পরিশেষে বলা যায় এজাতীয় অনেক গুরুতর এবং ভয়াবহ তথ্য ও প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আল্লামা সাঈদীর মৃত্যুকে মেডিকোলিগ্যাল ও প্রফেশনাল এনালিস্টদের কেউ কেউ সংজ্ঞায়িত করেছেন 'মেডিকেল কিলিং' হিসাবে আবার কেউ কেউ আখ্যায়িত করেছেন 'ইন্সটিটিউশনাল কিলিং' হিসাবে। গ্লোবালাইজড ভিলেজের বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ কোন বিচ্ছিন্ন অঞ্চল নয়। তাই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের চিকিৎসার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতে অপ-চিকিৎসার পুনরাবৃত্তি রোধে আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দাবি উঠেছে একটি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেডিকোলিগ্যাল টিম গঠন করে আল্লামা সাঈদীর চিকিৎসা ও মৃত্যুর কারণ তদন্তের জন্য। তবেই বেরিয়ে আসবে কী কী মেডিকেলি মিসকন্ডাক্ট, নেগলিজেন্স এবং মেলপেকটিস হয়েছে। এমনকি Manslaughter এর অপরাধ সংগঠিত হয়েছে কি না, আর এক্ষেত্রে কার দায় কতটুকু?

বাংলার ইতিহাসে অতি জনপ্রিয় নেতা কারা?

গত শত বছরে বাংলার অতি জনপ্রিয় নেতা কারা– অর্থাৎ যাদের জনপ্রিয়তা ছিল সার্বজনীন এবং আজও অম্লান। এমন শীর্ষ নেতা কারা? এই প্রশ্নের জবাবে ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। তবে আমার মতে অতি জনপ্রিয় শীর্ষ নেতাদের মাঝে উঠে আসবে বরিশালে জন্ম নেওয়া দুই মহান নেতার নাম। তারা হচ্ছেন– শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (জন্ম ১৮৭৩ রাজাপুর, ঝালকাঠি) এবং আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (জন্ম ১৯৪০ ইন্দুরকান্দি, পিরোজপুর) এরা দুজনেই সর্বস্তরের মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করে শিক্ষার আলো জালিয়ে বাংলার মানুষের জুলুম-নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে অধিকার আদায়ের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে সর্বস্তরের জনগণের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন। তবে তাদের অবদানের ক্ষেত্র পুরোপুরি এক ছিলো না।

শেরে বাংলা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে জমিদারদের শোষণ বন্ধ করা, ঋণ শালিসি বোর্ড গঠন করে নির্যাতনের পথ রুদ্ধ করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে সফলতার সাথে গুরুদায়িত্ব সমূহ পালন করে গেছেন। শুধু তাই নয় উপমহাদেশের নির্যাতিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বৃটিশ রাজ থেকে লাহোরের ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাবের মাধ্যমে স্বাধীকার ও স্বাধীনতার পথ রচনা করেছেন। তাই বাংলাদেশের ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

অনুরূপভাবে আল্লামা সাঈদী (রহ.) ৮০'র দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশের সর্বত্র মানুষকে কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে জুলুম-নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করে দুনিয়ার অধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে আখেরাতের স্থায়ী মুক্তির পথে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ও সংগঠিত করেছিলেন। তাঁর এই আওয়াজ শুধু মাঠে ময়দানে, হাজার হাজার মানুষের সামনে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি উচ্চারিত হয়েছে বাংলাদেশের পার্লামেন্টেও বছরের পর বছর। এমনকি সারা পৃথিবীর শহরে শহরেও ধ্বনিত হয়েছে তাঁর এই আহ্বান বলিষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ ও সাবলীল কণ্ঠে। তাই তিনিও বাংলার ইতিহাসে শীর্ষস্থানীয় অতি জনপ্রিয় নেতা হিসাবে আগামী শত বছর পরও বেঁচে থাকবেন শেরে বাংলার মতো। এ বিষয়ে আশাকরি অনেকেই আমার সাথে একমত হবেন।

দেশে বিদেশে তাঁর অগণিত গায়েবানা জানাজা তা প্রমাণ করে। শুধু তাই নয় গায়েবানা জানাজা পড়তে গিয়ে জালিম সরকারের গুলির মুখে শাহাদাতবরণের ঘটনা ও ঘটেছে (চকরিয়া চট্টগ্রাম)। রাজনৈতিক সু-গভীর ষড়যন্ত্র আন্তর্জাতিক বিচারাঙ্গনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নে অসংখ্য প্রশ্নবিদ্ধ, সাজানো বিচারে ২০১৩ সালে যখন তাকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় তখন কেঁপে উঠেছিল সারাদেশ। তীব্র প্রতিবাদ করতে জনতা রাজপথে নেমে আসে বহু সংখ্যক (আল জাজিরার মতে কমপক্ষে ১০০, ভয়েস অব আমেরিকার মতে শতাধিক, বেসরকারি সুত্র মতে ২৪৭)। গ্রীকদের মানুষ জালেমশাহীর গুলিতে হাসিমুখে শাহাদাতবরণ করেন। মানবজাতির ইতিহাসে এমন নজির কয়টি আছে? বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড যে মিথ্যা ও অন্যায় ছিল তা বুঝতে বাকি ছিল না গ্রিকের। কিন্তু কয়জন এতটা তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন, যা তাদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করেছিল?

কোরআনের আহ্বান চলতেই থাকবে

সাহাবা (রা.) গণ রাসুল (সা.) এর ইন্তেকালের পর কোরআনের বাণী নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন আরবজাহান থেকে সারা বিশ্বে। গত অর্ধশত বছর ধরে বাংলার এই জমিনে যারা কোরআনের বাণী বুদ্ধিমত্তা ও হেকমতের সাথে প্রচার করে গেছেন তাদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ছিলেন আল্লামা সাঈদী (রহ.)। কোরআনের পাখি তার সময় শেষে শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে উড়ে গেছে জান্নাতের পানে ইনশাআল্লাহ। তাই বলে কী কোরআনের আহ্বান স্থিমিত হবে? না অবশ্যই না। বরং আল্লামা সাঈদী (রহ.)র শূন্যতাকে মূলধন হিসেবে ধরে নিয়ে আরও বেগবান হবে কোরআনের মিশন। এক্ষেত্রে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসতে হবে সাঈদী ফাউন্ডেশনসহ আমাদের সকলকে আল্লামা সাঈদী দেশে বিদেশে কোরআন প্রচারের যে অভিযান চালিয়ে গেছেন সর্বশক্তি দিয়ে, আল্লাহর সকল বান্দাদের সেই অভিযানকে আরও জোরদার করতে হবে কেয়ামত পর্যন্ত।

রেসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা যা করতে পারি;

1. আল্লামা সাঈদী (রহ.)-এর অপ্রকাশিত তাফসীর দ্রুত প্রকাশের ব্যবস্থা করা।
2. ইতোমধ্যে প্রকাশিত অংশসমূহের (যেমন: সুরা ফাতিহা, আসর) ইংরেজি অনুবাদ করা। উল্লেখ্য সারা বিশ্বে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত এবং অবাঙ্গালী মুসলমানদের মাঝে শহীদ আল্লামা সাঈদী (রহ.) ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।
3. দেশে বিদেশে দাঈর মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আল্লামা সাঈদী (রহ.) পুরস্কার চালু করা।
4. শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে বুদ্ধিমত্তা ও হেকমতের সাথে আজীবন নিবেদিত থাকা।

লেখক: যুক্তরাজ্যের একজন চিকিৎসক।

আমার দেখা আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.)

ড. আব্দুস সালাম আজাদী

আমি যখন মন নরম করতে চাইতাম; কুরআনের আঙিনায় ফিরে এসে নতুন নোঙর ফেলতে চাইতাম; সুরের মূর্ছনায় ইসলামি ইতিহাসের চমক শোনার আকাংক্ষা করতাম; ভাবতাম ইসলাম কত সুন্দর তা মোহনীয় ভাষায় আমার কানে বাজতে থাকুক, তখন আমি ক্যাসেট লাগাতাম। শায়খ সাঈদীর বক্তব্য ভরা ক্যাসেট লাগাতাম আমার 'ন্যাশনাল প্যানাসোনিক' টেপ রেকর্ডারে।

আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর বয়স যখন মাত্র ১৬ বছর, মানে আলিম ক্লাসে পড়তেন, তখন থেকে তিনি ওয়াজ করতেন। তার ওয়াজের উস্তায ছিলেন একাধিক। তবে খুলনার শায়খ আব্দুল কাদির মুফাসসিরে কুরআন রাহিমাহুল্লাহ ও আব্দুল ওয়াহহাব বুলবুল-ই-বাংলাদেশ রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন তার গুরু। তবে তার জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছেন মিশরের মরহুম আব্দুল হামিদ কিশক রাহিমাহুল্লাহ।

আমার আব্বা বলেছেন, সাঈদী সাহেব আমাদের জয়নগর আমিনিয়া মাদ্রাসায় সেই ছোট বেলায় বুলবুল-ই-বাংলাদেশ এর সাথে একবার ওয়াজ করতে যান। বয়স অল্প থাকার কারণে তাকে যখন সময় দেওয়া হচ্ছিলো না, তার উস্তায এক প্রকার জোর করেই কিছু বলার সুযোগ করে দেন। আব্বার ভাষায়, তখনই বুঝা যায় তার কোকিল কণ্ঠি সুরের আবাহন কত হৃদয় স্পর্শী, তার আলোচনার ধরন কতো গভীর এবং তার শব্দ চয়ন কত সাহিত্যপনায় ভরপুর।

অনেকের অনেক যোগ্যতা থাকে, তার যোগ্যতা ছিল তিনি মানুষের প্রিয় ভাজন হতে পারতেন। জামায়াতে ইসলামির রুকন হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে তার দাওয়াত আসতো ইসলামি ফ্রন্টের সাথে সাথে সেক্যুলার প্লাটফরম থেকে। আমাদের সাতক্ষীরায় আওয়ামী লীগ ঘরানা থেকেই তিনি দাওয়াত পেতেন বেশি। জামায়াতের জন্য একান্ত হলেও তার সেই গ্রহণযোগ্যতা ও ভালোবাসা কমেনি।

তিনি অনেক মাদ্রাসায় পড়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সম্ভবত, একটু ডানপিঠে ছিলেন। মানে কোন বাধা বন্ধন তিনি সইতে পারতেন না। খুলনা আলিয়া, ছারছিনা, এমনকি সাতক্ষীরার কোন এক মাদ্রাসায়ও তিনি সাতক্ষীরার শায়খ আবু আইয়ুব আনসারির সাথে পড়েছেন বলে আমার দুলাভাই মাওলানা মিজানুর রহমান সাহেব বলেছিলেন।

ছাত্র জীবনে ধীমান ছাত্র ও রেজাল্টে কীর্তিমান হিসেবে খ্যাতি তিনি পাননি, কিন্তু তিনি পড়তেন অনেক বেশি, শুনতেন তার চেয়ে বেশি ও বড়ো বড়ো আলিমগণের সাথে ঘুরতেন রাত-দিন। এভাবে তার মাঝে জ্ঞান ও অভিজ্ঞানের সংযোজন ঘটে। এটা তার জীবনে এমন প্রভাব ফেলে যে, তার উস্তাযগণ যেভাবে সুর তুলে যে সব ঘটনার বর্ণনা দিতেন, তিনিও সেই সব বর্ণনা দিতে সেই ভাষা ও সুর ব্যবহার করতেন। আব্দুল কাদির মুফাসসিরে কুরআনের কাছে আমি তায়েফের বর্ণনা যে ভাবে শুনেছি, ঠিক ঐ সুরে, ঐ ঢঙে এবং একেবারে ঐ শব্দে তার কাছেও তায়েফের বর্ণনা শুনে আমি কেঁদেছি। পথে কাঁটা দেওয়া বুড়ির ইসলাম গ্রহণের যে সুন্দর বর্ণনা আমি শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব বুলবুল-ই-বাংলাদেশের কাছে শুনেছি, সেই সুর, সেই ধারা ও সেই শব্দের ক্রন্দন আমি শায়খ সাঈদীর কাছেও শুনেছি। ফলে পরবর্তীতে তাকে যখন বিভিন্ন ঘটনার অথেন্টিসিটি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হতো, তিনি সেগুলো বাদ দিতেন, কারণ এর অনেকগুলো ছিল শ্রুত।

তিনি স্বল্পকিছু দিন নাকি শিক্ষকতা করেছিলেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়ে নাকি কিছুদিন ব্যবসাও করেছিলেন। কিন্তু এসব তার জীবনের গল্পে কেউ কোন দিন আনেনি, কারণ এইগুলো উল্লেখযোগ্য ছিল না।

উল্লেখযোগ্য ছিল কুরআনের তাফসীর মাহফিলে তার অনন্য সংযোজন। তার মূলতঃ উত্থান ঘটে চট্টগ্রামের চুনতির শাহ সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ১৯দিন ব্যাপী সিরাতুন্নবি (সা.) মাহফিল থেকে। এখানে তিনি প্রথমে তার শায়খ আব্দুল কাদের মুফাসসিরে কুরআনের সাথে আসতে আসতে তিনিই হয়ে ওঠেন মধ্যমণি। এবং ১৯৭৫ সালে দেশের পট পরিবর্তনের সাথে সাথে তার প্যারেড ময়দানের তাফসীরুল কুরআন মাহফিল হয়ে ওঠে সারা দেশের দাওয়াতি ধারার এক অমূল্য মডেল।

যে কেউ তার সুর নকল করে বক্তৃতা দিতে পারলে তার কদর বেড়ে যেতো। তার মত উন্নত বিষয়ের উপস্থাপনা ছাড়া কারো বক্তৃতা শুনতে ইচ্ছা হতো না। তার পরা সুন্দর টুপি মাথায় না দিয়ে কেউ

স্টেইজে উঠতো না। তার মতো পাকানো গুম্ফের লাগোয়া দাড়ির সৌষ্ঠব না নিয়ে আলোর সামনে আসতো না। আমরা সেই সময়কে মনে করতাম "ওয়াজের সাঈদী" কিংবা "সাঈদীর ওয়াজ"। টেক-নাফ থেকে তেতুলিয়ার মাঠে ময়দানে তাকে দেখতে পাওয়া হয়ে ওঠে আমাদের আরাধ্য, তাকে আনতে পারা হয়ে ওঠে ধনী মানুষের গর্বের বিষয় এবং তার ওয়াজ হবে ঘোষণা হওয়া মানেই হলো আসে পাশের জেলা গুলো থেকে বাস ভাড়ার হিড়িক। তার ওয়াজ শুনতে আমি ১২ মাইল পথ পা হেঁটেও গেছি। এমন অপ্রতিরোধ্য হতো তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা, যা আটকায়ে রাখলে মারমারি বেঁধে যেতো।

তিনি ক্রমান্বয়ে বিদেশেও যাওয়া শুরু করেন। আশির দশকেই শুরু হয় তার বিদেশে যেয়ে বক্তৃতা দেওয়া। প্রথম আমেরিকা, পরে বৃটেনে। তারপর আরব বিশ্বে এবং যেখানেই বাংলাদেশীরা আছেন, সেখানে তাকে নেওয়া একটা ফ্যাশন কিংবা বলতে পারেন গর্বের বিষয় ছিল। বিদেশের সংগঠনের ছত্র ছায়ায় তিনি আন্তর্জাতিক ভাবেও পরিচিতি পান। এমনকি তার সম্পর্কে বৃটিশ পার্লামান্টে করা আলোচনা, আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত প্রতিবেদনসমূহ এবং বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া তার দাওয়াত নামার বহর দেখে বুঝতে পারবেন কত বড় খ্যাতি আল্লাহ তাকে সারা দুনিয়ায় এনে দিয়েছিলেন।

একমাত্র স্ত্রীর গর্ভ থেকে তিনি ৪ সন্তানের গর্বিত বাবা হলেও সারা দু-নিয়ায় লক্ষ লক্ষ যুবককে তিনি ছেলে হিসেবে বুকে জায়গা দিয়েছেন এবং ইসলামের পথে আনা ও টিকে থাকার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে গেছেন।

একাডেমিক পড়াশুনার কখনও তার ধাতে সয়নি, কিন্তু তিনি ছি-লেন "মুসাক্কাফ" বলতে যা বুঝায় তার প্রতিকৃতি। নানান বিষয়ে তার গভীর অনুধ্যান ছিল। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃ তি, সাহিত্য ও দর্শন তার একান্ত প্রিয় ছিল। এগুলো তিনি এমন ভাবে আত্মস্ত করেছিলেন যে তা মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারতেন অত্যন্ত সহজে সারল্যে, অনেক মোহনীয় করে ও অনুধাবন যোগ্য করে। তিনি আল্লামা ইকবাল দ্বারা এমন প্রভাবিত ছিলেন, যে তার প্রতিটি আলোচনায় আল্লামা ইকবাল যেনো ঢেউ তুলত। কাজী নজরুলের কাব্যিক বিদ্রোহ তার কণ্ঠেই বেশি সঞ্চারিত হতো, কবি ফররুখের ইতিহাস পাঠ তার বুকেই হতো চব্বিশ ঘণ্টায় লালিত।

তিনি পড়তেন, পড়তে জানতেন, লাল মলাটের বই আমি তার লাইব্রেরিতে দেখেছি, বিপ্লবের ইতিহাস তার ডায়েরিতেও পড়েছি। তার মূলধারা তাসাউফের সরোবর থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন দ্রোহের স্রোত তুলে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের ভুলপন্থী পীরদের প্রধান শত্রু, কবর পূজার বিরুদ্ধের মর্টার শেল, বিদআতের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত। যেহেতু তিনি তাসাউফপন্থিদের থেকেই নিজের জীবন সিঞ্চিত করেছেন এবং সেখান থেকেই তার প্রাথমিক জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে, ফলে এ থেকে বের হতে তার অনুশীলন করতে হয়েছে ধাপে ধাপে। মাওলানা মওদূদির লেখা-সমগ্র, জামায়াতে ইসলামির মৌলিক লেটারেচার, মাওলানা আব্দুর রহিমের সান্নিধ্য ও দাওয়াত, আরব বিশ্বে তার পদচারণা ও বড়ো বড়ো শায়খগণের সাথে তার সাক্ষাত, সর্বোপরি শায়খ সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী হাফিযাহুল্লাহ এর সাথে তার বন্ধুত্ব, সম্পর্ক এবং সান্নিধ্য তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

যে সব গবেষক তাকে নিয়ে লিখেছেন বা বলেছেন তারা তার জীবন এই উত্থান ও বাঁকগুলো না দেখেই কথা বলেছেন। ফলে তার প্রতি তারা ক্ষেত্র বিশেষে জুলুম করেছেন। তিনি যে হাদিস, কুরআন ও ফিকহে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না, এটা তারা না ধরেই তার ভুল নিয়ে খিস্তি খেওড় করেছেন।

তিনি ওয়াজ মাহফিল করতে যেয়ে টাকা নিতেন। কিন্তু ঐটা তার পেশা হিসেবে দুনিয়াদারি অর্জনের জন্য তা করতেন বলে মনে হয়নি। বরং অর্জিত টাকা দিয়ে তিনি অনেক অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিম খানা, দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরি করে গেছেন। তার কাছ থেকে কিছু চাইতে গিয়ে খালি হাতে ফিরেছেন এমন কথা শুনিনি আমি।

তিনি কুরআনের মুফাসসির হিসেবে সারা দুনিয়ায় খ্যাতি অর্জন করেন। তার কুরআন তাফসীর কখনো ক্লাসিক্যাল মেথড অনুসরণ করেছে বলে মনে হয় না। তবে কুরআন যে বর্ণিল জ্ঞানবাহী, কু-রআনের একেকটি আয়াত যে নানা দিগন্ত ভেদী, কুরআনের প্রতিটি শিক্ষা যে কেয়ামত পর্যন্ত আসা মানবতার জীবন সমস্যার সমাধান-কারী–তা ফুটে উঠত তার করা তাফসীরে। ফলে তার তাফসীরে আমরা সকল বিষয়ের আলোচনা পেয়ে যাই। আমার কোন সময় মনে হয়নি তিনি কোন একটা নির্দিষ্ট তাফসীর ফলো করতেন। তবে তাফহীমুল কুরআন, ফী যিলালিল কুরআন, তাফসীর ইবন কাসীর ও মাআরিফুল কুরআন তিনি পড়তেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে পড়তে বলেছেন।

তার বক্তৃতায় তিনি নানা বিষয়ের অবতারণা করতেন। হাসাতেন যখন, তখন তা অট্টহাস্যে রূপ নিতো। কাঁদাতেন যখন, তখন বিষাদ যেন সিন্ধু হয়ে ঢেউ তুলে কান্নার প্লাবন বইয়ে দিতো। তার তৈরি সারকাজম বা শ্লেষ যেন বিষাক্ত তীরের ফলা হয়ে বিরোধীদের অন্তর এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতো। তিনি যখন দ্রোহের স্বর হয়ে উঠাতেন তখন রক্ত টগবগ করে উঠত, হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আকাশ পানে উড়তো। আমি নিজে কোনো দিন ঐ সময়ে বসে থাকতে পারিনি, দাঁড়িয়ে যেতাম। ঐ ধরনের বক্তব্যগুলো আরামের বিছানায় শুয়ে শুনতে পারিনি। চতুর্দিকে "আল-কুরআনের আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো" ধ্বনি শুনে আকাশ মুগ্ধ হতো, পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠত এবং ময়দান থেকে শায়তান যেন পালিয়ে যেতো। তিনি যে সুর দিয়ে ওয়াজ করতেন, তা যেন গভীর রাতে বংগদেশে গানের আসরগুলো মলিন করে দিতো। তার হুঙ্কার তাগুতকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাতো। তার সামনে উপচে পড়া ভিড় কখনও কখনও ইবনুল জাওযির জনস্রোতে-কও হার মানাতো। ফলে সাঈদীর উত্থান বাংলাদেশের জন্য বক্তৃতা শিল্পের নতুন এক ধারা তৈরি করে।

তিনি যখন বক্তব্যে শ্লেষ নিয়ে আসতেন, তখন আঞ্চলিক শব্দ ও সাধারণের বাক্য ব্যবহার করতেন, যেখানে বরিশাল এলাকার টান যেমন থাকতো, ভাটি এলাকার শব্দ তেমন খরখরিয়ে উঠত। তিনি যখন আবেগের কথা বলতেন, নরম ও কোমল কথার স্তর সাজাতেন তখন সুরের মূর্ছনা উঠাতেন, তাল তুলতেন, আয়াতের সম্মোহন তৈরি করতেন। কণ্ঠকে শায়খ শুরাইম বা তার উস্তায আব্দুল

কাদিরের কণ্ঠ বানাতেন। মনে হতো গান ধরেছেন, ভাটিয়ালি বা পল্লিগীতি। আবার যখন মননের সাথে কথা বলতেন তখন হতেন একজন বুদ্ধিজীবী অথবা দার্শনিক। তবে তার একটা বড় গুণ ছিলো, তিনি আবেগী হয়ে গেলে শব্দের স্রোত নিজের কষেই ধরে রাখতে পারতেন। সাধারণ বক্তাদের মত মিথ্যে গুল্পের ভাণ্ডার সাজাতেন না বা আবোল তাবোল কথা বলে নিজকে খাটো করতেন না।

সম সাময়িক বিষয়গুলো তার বক্তব্যের মাঝে এমন আসতো যে, শ্রোতারা যেন কোন বক্তব্যের আগেই বুঝে ফেলত সাঈদী সাহেবের আজকের আলোচনায় কী কী আসবে। তিনি নোট রাখতেন। আমি নিজেই তার হাতে লেখা নোট দেখেছি, এতে বুঝতাম প্রতিটা বক্তৃ তার জন্য তিনি কত সুন্দর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আমি তার আলোচনা সাধারণত ২-৩ ঘণ্টার বেশি পাইনি। সিরিজ আলোচনা করতেন একাধিক দিন ধরে। কিন্তু ৪-৫ ঘণ্টা সময় নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন না। প্রতিটি আলোচনাকে তিনি অন্তত ৫/৬ ভাগে বিভক্ত করতেন, ফলে একঘেয়েমি তার আলোচনায় আসেইনি কোনদিন।

তার বক্তৃতার ভাষার স্ট্যান্ডার্ড এমন হতো যা একজন মুর্খ মানুষ ও বুঝতে যেমন পারতেন, পিএইচডি করা বিশেষজ্ঞ বা করপোরেট জগতের টাইফুন কিংবা প্রফেশনাল জগতের অধিপতিও তা থেকে আনন্দ পেতেন। ঘরে বসে সময় কাটাতে, নির্ঘুম চোখে ঘুমের ছোঁয়া আনতে, কফি শপের নীলাভ নীরব নীরব আলো আঁধারিতে, কলেজের নবীন বরণে, কৃষকের ক্ষেত নিংড়ানোর তড়পড়ানিতে এমন কি বাসের লম্বা ভ্রমণের বিরক্তি কাটাতে সাঈদী সাহেবের ওয়াজ রুহে আফযার মত কাজ করতো, কিংবা এখনো করে বৈকি।

তার ওয়াজের দুই তিনটা বাক্য থেকেই বুঝে ছিলাম ক্যাপিটালিজম কাকে বলে, কয়েকটা শব্দে তিনি মারক্সিজম বুঝিয়েছিলেন। গণতন্ত্রের সোজা বাঁকা পথ দেখিয়েছিলেন। দার্শনিক তত্ত্বগুলো সাধারণের ভাষায় তিনি নিয়ে আসতে পারতেন অত্যন্ত সহজ ভাষায়।

তিনি সস্তা হতেন না। গম্ভীরতা বজায় রাখতেন। স্টেজে তার চেহারার দীপ্ততার সাথে জ্বল জ্বল করতো এমব্রয়োডারি করা টুপির নানা রঙের আভা। কালো আবায়ার সাথে থাকতো সোনালী সুতোর দৃষ্টি-টানা বুনন। তার মাইকে উল্টা পাল্টা শব্দ করতে পারতো না। তার আলোচনা সিএইচপি ছাড়া কেউ রেকর্ড করার সুযোগ পেতো না। কারণ সব কিছু শুনে এডিট করেই তবে তিনি ছাড় দিতেন। ওয়ায়েজ হিসেবে এমন সব দুর্লভ গুণ খুব কমের মধ্যে আমি দেখছি।

তিনি রাজনীতিতে একটিভ হয়ে যাবার পর থেকে কাজে ও কর্মে পুরো রাজনীতিবিদ হয়ে যান। তার এই পরিবর্তনকে অনেকেই ভালো চোখে নেননি। বিশেষ করে তার যেসব ভক্ত জামায়াতে ইসলামি ছাড়া অন্য দল করতো। বিশেষ করে ইত্তেহাদুল উম্মাহ প্রতিষ্ঠার সময়ে তার ভূমিকা ঐক্যের পথচারী পথিকদের একদিকে অসহায় করে দেয়, অন্য দিকে দিকভ্রান্তও করে ফেলে। ময়দান ছেড়ে তার উমরার উদ্দেশ্যে যাওয়া এবং ঐ সময়ে দেওয়া তার বিবৃতি একদিকে মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে ফেলে, অপরদিকে তাকে বেশ বিতর্কিতও করে দেয়। জানিনা ঐ সময় কারা অধিকতর সঠিক পথে ছিলেন, কিন্তু তিনি সমগ্র উলামায়ে কিরামের কাছে যে উচ্চতায় গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন তার কিছু অবনমন আমরা লক্ষ্য করি। এই একটি বিষয় ছাড়া রাজনীতিতে তিনি অনেক প্রভাবশালী হিসেবে মৃত্যুর পরে আজো প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৯৬ সালে এমপি ইলেকশানের আগে মদিনা প্রবাসী ভাই নাসিম আসেন দারুল আরাবিয়্যাতে। তিনি আমাকে একটা স্বপ্নের কথা শোনান। বলেন ভাই, আমি মদিনায় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম আমাদের বাড়ির পাশে একটা বড়ো রাজ প্রাসাদ। হঠাৎ রাজপ্রাসাদে আগুন লাগলো। আমি ছটফট করছি আমাদের প্রাসাদের মানুষগুলো বাঁচবে কিনা। মানুষগুলো খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম ৩জন একটা কাঁচের রুমে সুস্থ আছেন। একজনকে চিনলাম সাঈদী সাহেব, অন্য দুইজনকে আমি চিনিনি, তবে তারা অত বেশি পরিচিত মনে হল না। আব্দুস সালাম ভাই, মনে হয় এবার নির্বাচনে আমরা ৩টি আসনের বেশি পাবনা, তবে সাঈদী সাহেব ইনশাআল্লাহ দুইজনকে নিয়ে দুর্বল হয়ে থাকলেও দল বেঁচে থাকবে। এই ভাইয়ের স্বপ্ন ও তার করা ব্যাখ্যা তখন আমাকে খুশি করেনি। কারণ আমরা তখন ভেবেছিলাম জামায়াত কম পক্ষে ৩০টা আসন পাবে। আশ্চর্য ব্যাপার নির্বাচনের ফলাফলে আমাদের নাসিম ভায়ের স্বপ্নটাই যেন সত্য হয়েছিলো সেবার।

তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়েও কথা বলতেন। আশ্চর্যের বিষয় প্রতি কথাতেই তার উপর খড়গ নেমে আসতো। ইরাকের আক্রমণের কারণে জর্জ বুশকে যে ভাষায় আক্রমণ করেন, বৃটেনকে যে ভাষায় সমালোচনা করেন এবং মিত্র বাহিনীকে যেভাবে কটাক্ষ করে কথা বলেন তার প্রতিটি শব্দ রেকর্ড করা হয়। এবং ঐ সব দেশে তার ভিসা দেওয়া বন্ধ করা হয়। তিনি আজন্ম ছিলেন বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারত নীতির বিপক্ষে। ফলে ভারত তাকে কোন ভাবেই বন্ধু ভাবতে পারেনি। ফলে সাঈদী সাহেবকে মেরে ফেলা হবে এই প্রপঞ্চ নিয়ে ২০০৬ সাল থেকে রাজনীতি এগিয়ে যায় এবং গত ১৪-১৫ বছর পরে তার মৃত্যুর মাধ্যমে খেলার একটা পর্যায় শেষ হল। রাজনীতি একটা খুব বড়ো ভাগাড়। যার তলায় থাকে পঙ্কিলতা। আর উপরে ভাসে অদ্ভুত লাশ। আর তার আকাশে ঘুরে বেড়ায় শকুনির ঝাঁক। গা হিম করা নিকষ আঁধারে ছোট বড়ো মশাল নিয়ে এগোয় রাজনীতিবিদরা। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা স্মরণীয় কালের সবচেয়ে অন্ধকারের থাবায় পড়েছে। জানি না মশালের আলো কতটুকু দীপ্যমান হবে, অথবা কত দূর তা নিয়ে যাওয়া যাবে।

তার ওয়াজ শুনে মুসলিম হয়েছে শত শত। হারামের পথ ছেড়ে তাওবার পথে এসেছে লক্ষ মুসলিম যুবক-বৃদ্ধ, ছাত্র-শিক্ষক কিংবা নর-নারী।

দোয়া করি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, মায়া করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বনিয়ে নিন। আমিন।

তার মত মানুষের ঠিক মত সেবা দেওয়া যায়নি, চিকিৎসা হয়নি, জানাযা নামাজের বন্দবস্ত করা যায়নি, এটা সরকারের আমার্জনীয় অপরাধ। তার মৃত্যুও তাদের কাছে ভীতিকর সেটা প্রমাণিত হয়েছে।

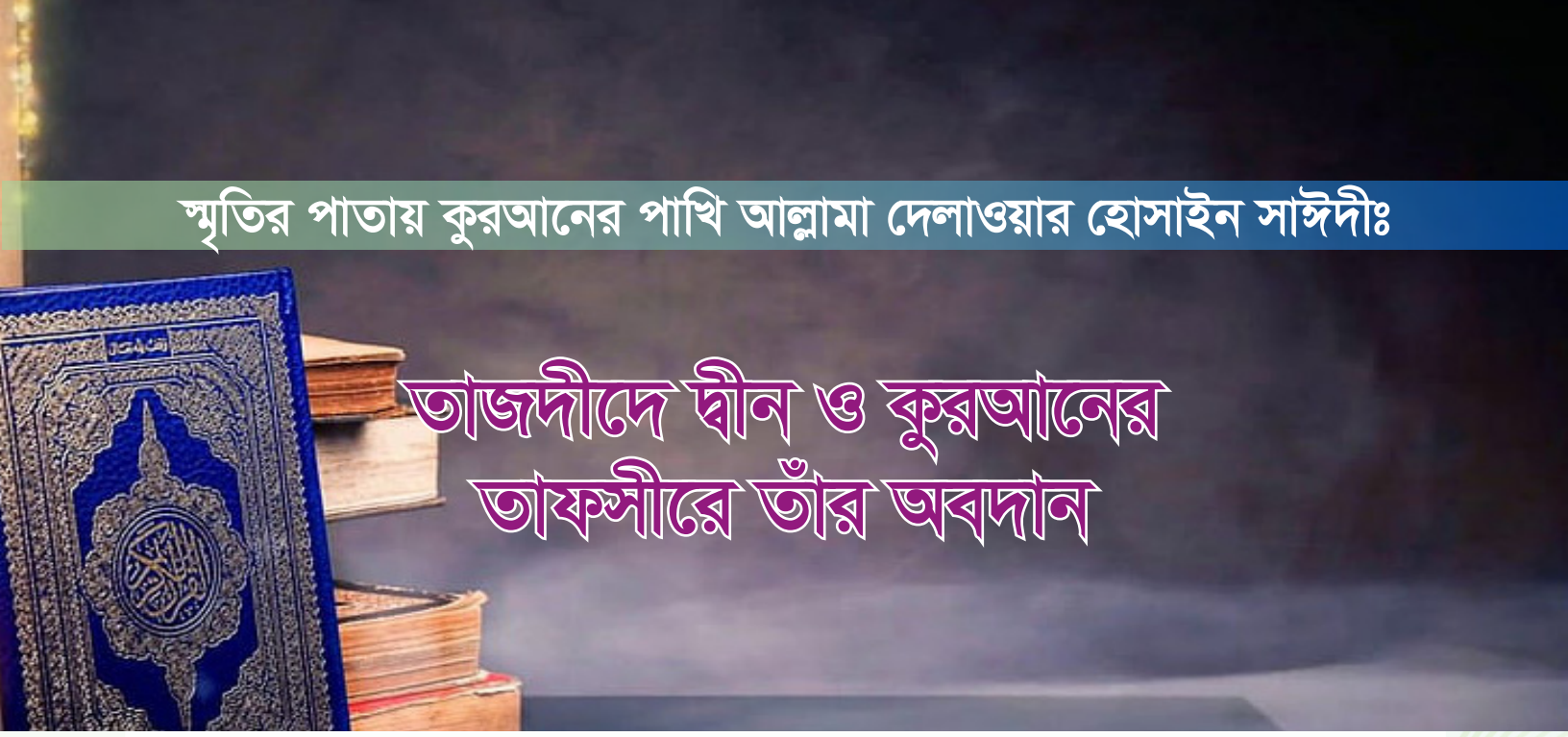

তাজদীদে দ্বীন ও কুরআনের তাফসীরে তাঁর অবদান

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

আল্লামা সাঈদী (রহ.) কুরআনের পাখি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আমরা মনে করি এখন তিনি আল্লাহর পেয়ারা বান্দাহদের সাথে জান্নাতের পাখি হিসাবে আছেন। ১৪ই আগস্ট ২০২৩ ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট শহীদ ড. মুরসীর (রহ.) এর মত কারাবন্দী হিসাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অনেকেই মনে করেন কারাগারে ইমাম আবু হানিফাকে যেমনিভাবে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে অনুরূপভাবে আল্লামা সাঈদীকেও চক্রান্তমূলকভাবে যথাযথ চিকিৎসা না দিয়ে কিংবা 'ইনজেকশান পুশ' করে হত্যা করা হয়েছে। তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন নাই বরং শাহাদাতবরণ করেছেন। ১৩ই আগস্ট তাঁকে এ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা পিজি হাসপাতালে আনার সময় তিনি অতুলনীয় মিষ্টি হাসি দিয়ে কথা বলেছেন। তাঁর প্রিয় ছেলে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মাসুদ সাঈদী ভাইয়ের কান্না ভেজা বক্তব্য সকলের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে। তিনি বলেছেন, "তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পর সারা রাত এবং পরের দিন সকলের কাছে ধরনা দিয়েছি; তারপরও পরিবারের কারো সাথে এক সেকেন্ডের জন্য সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়নি।" এর চেয়ে নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা আর কী হতে পারে? একজন ফাঁসির আসামীকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে শেষ ইচ্ছা জানতে চাওয়া হয়। পরিবার-পরিজনের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়। আল্লামা সাঈদীকে কী কারণে তাঁর পরিবারের সাথে ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত দেখার সুযোগ দেওয়া হয়নি সেই প্রশ্ন কোটি জনতার। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে হয়তো বা দুনিয়ার আদালতে; আর তা না হলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় আখেরাতে আল্লাহর আদালতে তার প্রকৃত বিচার হবে এবং জুলুমকারীরা কঠিন শাস্তিভোগ করবে। তাদের নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতায় পুরো জাতি ব্যথিত ও শোকে মুহ্যমান। জাতি হতবাক যে, একজন মানুষ মারা যাওয়ার পর তার লাশ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর না করে ভোর রাতে পিরোজপুর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। আর তাঁর ভক্তরাসহ দেশের আম জনতার প্রত্যাশা ছিল ঢাকাতেই তাঁর প্রথম জানাযা হবে; যাতে সারা দেশের মানুষ অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় কিন্তু সরকার ঢাকায় জানাযার অনুমতি দেয়নি। এমনকি ফজরের নামাজরত মুসল্লিদের উপর সাউন্ডগ্রেনেডসহ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে তার কফিন পিরোজপুরের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। আমেরিকায় একটি প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য গমন করার কারণে তাঁর ছেলে মাওলানা শামীম সাঈদী দেশের বাইরে ছিলেন। তিনি প্রিয় বাবার ইন্তেকালের সংবাদ শোনার সাথে সাথে রওয়ানা দেন। দেশে ফিরে এসে জানাযায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে বারবার আকুতি জানান; তাঁর সেই আকুতিও শোনা হয় নাই।

হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দাহকে ভালবাসেন তখন জিবরীলকে বলেন আমি অমুককে ভালবাসি তুমিও তাকে ভালবাস। এই কথা আসমানের সকল ফেরেশতার কাছে প্রচারিত হলে সকলে তাকে ভালবাসে। আর এইভাবে দুনিয়াতেও সকলে তাকে ভালবাসে। আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালের পর পৃথিবীর নানান দেশে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী কোটি কোটি ভক্তদের হৃদয় নিংড়ানের দুআ ও ভালবাসার প্রকাশ প্রমাণ করে তিনি আল্লাহর মাহবুব বান্দাহদের একজন।

আল্লামা সাঈদী বহু গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং বহুমুখী অবদান রেখেছেন। তিনি নেহায়েতই একজন মুফাসির ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন সুলতানুল মুফাসসিরীন; অর্থাৎ তাফসীর জগতের সম্রাট। তাঁর আগে সাধারণত ওয়াজ মাহফিলে কিসসা-কাহিনী তথা সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে গল্পাকারে রূপকথা সাজিয়ে সুরের মাধুরী মিশিয়ে অনেকেই ওয়াজ করতেন। তিনি কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসীরের পথিকৃৎ। যেমনিভাবে আল্লামা ইবনু জারীর তাবারী ও ইবনু কাসীর কুরআন ও হাদিস দ্বারা তাফসীর লেখার পথিকৃৎ হিসাবে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অবদান স্বীকৃত থাকবে। আমি মনে করি আল্লামা সাঈদী (রহ.) মাহফিলে কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে শতাব্দীকাল পর্যন্ত বৃত থাকবেন। তাফসীরের ক্ষেত্রে তাযদীদের অনেক উদাহরণ রয়েছে যা পৃথকভাবে গবেষণার দাবি রাখে। তবে এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে তাঁর তাফসীর

মাহফিলে শিক্ষক-ছাত্র, মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে, পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষ, নেতা ও কর্মী, লেখক-গবেষক ও কম শিক্ষিত বা অক্ষরজ্ঞান বিহীন সকলেই এক সাথে শুনতো এবং মোটিভেটেড হতো। সকলেই তাদের খোরাক পেতো এবং উজ্জীবিত হতেন। তাঁর উপস্থাপনা এত বেশি মোহনীয় ছিলো যে রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে যারা তার দলের বিরোধী ছিলো তাঁরাও তাঁর মাহফিলের আওয়াজ পেলে মৌমাছি যেমনিভাবে ফুলের রেণুতে এসে মধু আহরণ করে অনুরূপভাবে সকলেই তন্ময় হয়ে শুনতো। এই প্রসঙ্গে আমি একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করছি। ২০১৩ সালে আল্লামার ফাঁসির রায় দেওয়ার পর আমি বাংলাদেশে যাই। ঢাকা থেকে হাতিয়াতে যাওয়ার সময় লঞ্চে আমাদের উপজেলার আওয়ামীলীগের অন্যতম একজন বড় নেতার সাথে দেখা হয়। তিনি বলেন, কয়েক বছর আগে তিনি চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন এক কাজে। তাঁর কাজ শেষ হওয়ার পর হাতিয়াতে ফেরত আসার জন্য তিনি রিকশা যোগে স্টীমার ঘাটে যাওয়ার পথে চট্টগ্রামে আল্লামা সাঈদীর তাফসীর মাহফিলের আওয়াজ কানে আসে। তখন তিনি রিকশা থামিয়ে ওয়াজ শুনতে থাকেন। আল্লামার মোহনীয় সুর ও বিষয়বস্তুর আকর্ষণে তিনি সেই দিন হাতিয়া যাওয়ার কথা ভুলে যান। হাতিয়ার আওয়ামী লীগের প্রায় নেতৃবৃন্দের সাথে আমার ও আমাদের পারিবারিক পরিচয় ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আল্লামা কারাগারে যাওয়ার আগে তাঁদের অনেকেই আমার কাছে অনেকবার অনুরোধ করেছেন আল্লামাকে হাতিয়াতে নেওয়ার জন্য। লন্ডনে আমি তাঁকে সেই দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম এবং তিনি যাওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কারণ হাতিয়াতে কখনও তাঁর মাহফিল হয় নাই। কিন্তু ২০১০ সাল থেকে কারারুদ্ধ হওয়ার কারণে হাতিয়াতে তাঁর আর যাওয়া হলো না। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করছি আল্লাহ যেনো আমাদেরকে আমরণ এমনভাবে আমলে সালেহ করার তাওফিক দান করেন, যেনো জান্নাতে কুরআনের পাখি আল্লামা সাঈদীর কণ্ঠে কুরআনের বাণী শুনতে পাই। তিনি হাতিয়া কখনো যান নাই। তারপরও সাধারণ নারী-পুরুষ সকলের কত বেশি প্রিয় ছিলেন একটি ঘটনা তার প্রমাণ। হাতিয়ার একজন গরীব মহিলা মারা যাওয়ার আগে তার ছেলেদেরকে অসিয়ত করেন যে, তারা যেনো পাঁচশত টাকা আল্লামা সাঈদীর মুক্তি আন্দোলনের জন্য দান করেন।

মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগিশ আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীও রাজনীতিবিদ ছিলেন। ভারতের মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রাজনীতিবিদ ও তাফসীরকারক ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সকলের মূল পরিচয় ছিল রাজনীতিবিদ হিসাবে। আল্লামা সাঈদী (রহ.)ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নায়েবে আমীর ছিলেন এবং দুইবার পিরোজপুরের অনেক বেশি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন। কিন্তু তিনি জামায়াতে ইসলামী করলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ধর্মাবলম্বীসহ সর্বস্তরের মানুষের কাছে কত বেশি প্রিয় ছিলেন তা ২০১৩ সালে আওয়ামী সরকারের কাঙ্গারু কোর্টে ফাঁসির আদেশ দেওয়ার পর তার প্রতিবাদে দুই শতাধিকের ওপর মানুষ জীবন দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। যেমনিভাবে ২০১৬ সালে তুরস্কে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের বিরুদ্ধে ক্যু করার চেষ্টা করা হলে হাজারো জনতা রাজপথে নেমে আসে এবং জীবনবাজি রেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। যার ফলে উক্ত ক্যু সফল হয়নি। অনুরূপভাবে আল্লামা সাঈদীর ফাঁসির রায়ের বিরুদ্ধে গণ বিক্ষোভের ফলেই পরবর্তীতে তা আমরণ কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়। আল্লামা সাঈদী ১৯৯৬ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন সংসদে তাঁর প্রদত্ত প্রতিটি বক্তব্য শুনলে মনে হয় তিনি নতুন নয় বরং একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান। সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেন, "সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ নয় বরং আল্লাহ তায়ালা।" সংসদে প্রবেশ কালে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রবেশ করার রীতির বিরুদ্ধে তিনি সংসদে বিল উপস্থাপন করে এবং তা যথারীতি পাশ হয়। এইভাবে

রাজনৈতিক তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, তিনি রাজনীতির ময়দানেও তাযদীদের অনেক কাজ করেছেন।

আমি তাফসীরের একজন ছাত্র। ভারত ও পাকিস্তানে অনেক তাফসীরকারক রয়েছেন যাঁদের তাফসীর সারা-বিশ্বে সমাদৃত। যেমন মুফতী শফী (রহ.) কর্তৃক রচিত মাআরেফুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী কর্তৃক তাফহীমূল কুরআন, মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী কর্তৃক রচিত তাদাব্বুর কুরআন, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ কর্তৃক রচিত তারজুমানুল কুরআন, আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী কর্তৃক রচিত তাফসীরে মাযেদী, শাব্বির আহমদ উসমানী কর্তৃক রচিত তাফসীর, মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর তাফসীর বায়নুল কুরআন, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে হক্কানী প্রভৃতি। বাংলাদেশে তাফসীর চর্চা সে তুলনায় অতি নগণ্য। তবে এই ক্ষেত্রে মাওলানা আকরাম খাঁ এর অপূর্ণাঙ্গ তাফসীর, মাওলানা আমিনুল ইসলাম সাহেব এর নুরুল কুরআন ও আল্লামা সাঈদীর তাফসীরে সাঈদী উল্লেখ করার মত। বাংলাদেশে আরবী ও উর্দু ভাষায় রচিত কিছু তাফসীরের বাংলা অনুবাদ ও কুরআনের অনুবাদের কিছু কাজ হয়েছে। আমি মনে করি আল্লামা সাঈদী (রহ.) এর তাফসীরের অবদান নিয়েও গবেষণা হওয়া দরকার এবং তাঁর তাফসীরের ইংরেজী ও আরবি অনুবাদ করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

আল্লামা সাঈদী (রহ.) যুগে যুগে তাযদীদে দ্বীনের আন্দোলনে যাঁরা অনেক ত্যাগ-কুরবানির নজরানা স্থাপন করেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। আমরা জানি যুগে যুগে যাঁরা তাযদীদে দ্বীনের কাজ করেছেন তাঁরা ঈমানের অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। কারাগারই তাঁদের অনেকের আবাসে পরিণত হয়। যেমন বর্তমানে তিউনিশিয়ার আননাহদার প্রধান সাবেক স্পীকার ড. রাশীদ ঘানুশী কারাগারে আছেন। মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমুনের প্রধান ড. মুহাম্মদ বাদীঈসহ হাজারো নেতা-কর্মী কারাগারে রয়েছেন। তুরস্কে ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলনের পথিকৃৎ বদিউজ্জমান সাঈদ নুরসী, ড. নাজিমুদ্দীন আরবাকান বছরের পর বছর কারাবরণ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীসহ অনেকেই কারা নির্যাতন ভোগ করেন। এমনকি মুহজাদ্দেদে আলফে সানী সাইয়েদ আহমদ সিরহিন্দ সম্রাট আকবরের দ্বীনি ইলাহীর বিরোধিতার কারণে কারাভোগ করেন। সেই সময়ও কিছু আলেম মুবারক নাগুরী ও তার ছেলে শাইখ ফয়েজীর মত তাফসীরকারকরাও আকবরের দ্বীনে ইলাহীর সমর্থন করেছিলো। যেমনিভাবে বাংলাদেশে কিছু মাইজভান্ডারীর নামে পরিচিত আলিম নামধারী ব্যক্তি আল্লামা সাঈদীর বিরোধিতা ও রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সহযোগিতা করে। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারিও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলসহ সকলেই কারা নির্যাতনসহ অনেক জুলুমের শিকার হন। ইমাম মালেককে আঘাতে আঘাতে রক্তে রঞ্জিত করা হয়। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল প্রচণ্ড রোদে বেত্রাঘাতে বেহুশ হয়ে পড়তেন। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত অধ্যাপক গোলাম আযম, অধ্যাপক নাজির আহমদ, মাওলানা একেএম ইফসুফ, মাওলানা আব্দুস সোবহান (রহ.) কারাগারেই ইন্তেকাল করেছেন। কথিত যুদ্ধাপরাধের মিথ্যা অজুহাতে শাহাদাতবরণ করেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, জনাব কামারুজ্জামান, জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা ও জনাব মীর কাশেম আলী। জনাব এটিএম আজহারুল ইসলামসহ অনেক নেতা-কর্মী এখনও কারাগারে রয়েছেন। শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক, মুফতী আমিনী প্রমুখও কারাবরণ করেছিলেন; জনাব মাওলানা মামনুল হক সাহেবসহ অনেক আলেম-উলামা বর্তমানে কারাগারে আছেন।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রহ.) কে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবি করে খতমে নবুওয়াত বই লেখার পর ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। তাঁকে যখন বলা হয় ক্ষমা চাইলে মুক্তি দেওয়া হবে তখন তিনি বলেন, "মওত কী ফায়সালা আসমান মে হোতি হায় যমীন মে নেহী" অর্থাৎ মৃত্যুর ফায়সালা আসমানে হয় জমিনে নয়। সাইয়েদ কুতুব শহীদকে যখন কারাগারে তার বোন হামিদা কুতুবের মাধ্যমে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, তিনি ক্ষমা চেয়ে দুই লাইন লিখলে তাঁকে শুধু ক্ষমা নয় বরং মিশরের শিক্ষামন্ত্রী বানানো হবে। তখন তিনি প্রতি উত্তরে বলেন, যে আঙ্গুলি দিয়ে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র সাক্ষ্য দেয়া হয় সেই আঙ্গুলি দিয়ে মজলুম কখনও জালিমের কাছে ক্ষমা চাইবে না। তারপর তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। আজও পৃথিবীবাসী জানে না শহীদ সাইয়েদ কুতুবের কবর কোথায়।

আমাদের রাহবার, আমাদের প্রিয় নেতা আল্লামা সাঈদীকেও তাঁর ঘনিষ্ঠ একজনের মাধ্যমে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে তিনি যদি জামায়াতে ইসলামী ত্যাগ করেন তাহলে তাঁকে জেল থেকে শুধু মুক্তি নয় বরং তিনি যা চাইবেন তা দেওয়া হবে। আল্লামা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। আল্লামা সাঈদী (রহ.) কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তবে দ্বীনের পথে বিশেষভাবে নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তিনি ছিলেন অকুতোভয়। হযরত ইবরাহীমের পদাঙ্কানুসরণে আল্লাহর প্রতি তাঁর তাওয়াক্কুল ছিলো অপরীসীম। আমি তাঁর অনেক তাফসীর মাহফিলে ছিলাম যেখানে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে নানা ধরনের বাধার পাহাড় উপেক্ষা করে তিনি মাহফিলে উপস্থিত হতেন।

আল্লামা সাঈদী ছিলেন একজন দায়ী ইলাল্লাহ। গাজীপুর হাসপাতালে তিনি অল্প সময় ছিলেন। উক্ত হাসপাতালের রেজিষ্ট্রার স্যোশাল মিডিয়াতে লিখেন যে, অতি অল্প-সময়ে ডাক্তার-নার্স, অন্যান্য রোগী সকলেই তাঁর আচরণে মোহিত হয়ে যায়। তিনি বিদায় নেওয়ার সময় ডাক্তার সাহেব এর মাথায় হাত দিয়ে বলেন, "বাবা ঠিকমত নামাজ পড়বে।" তারপর যখন তাঁকে ঢাকায় পিজি হাসপাতালে আনা হয় এ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানোর সময় যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি কেমন আছেন তখন তিনি হৃদয়কাড়া জান্নাতি হাসি দিয়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভাল আছি। সেই সময় তিনি যে সকল কারারক্ষী তাঁকে নিয়ে আসেন কৃতজ্ঞতাসহ তাদের সেবাযত্নের প্রশংসা করেন।

আল্লামা সাঈদী (রহ.) ছিলেন উঁচু মাপের আলিম, লেখক, রাজনীতিবিদ, মোহনীয় চরিত্রের অধিকারী একজন বাগ্মী বক্তা। বাংলাদেশে তাঁর জনপ্রিয়তার কাছে অন্য সকল জনপ্রিয় ব্যক্তিরা ম্রিয়মান। অথচ ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতেন; তবে সাদাসিদে চলাফেরা করতো; তাঁর মাঝে কোন অহংকার ছিল না। অন্যকে আকৃষ্ট করার মত যাদুকরী শক্তি শুধু ওয়াজের ভাষা বা শব্দ চয়ন কিংবা

উপমাতে নয় বরং ব্যক্তিগত চরিত্রেও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। আমার মত একজন ক্ষুদ্র মানুষকেও তিনি যে মায়ার জালে আবদ্ধ করেছেন তা হৃদয় পটে ভেসে উঠলে কান্না আসে। তিনি ২০১০ সালে জেলে যাওয়ার আগে প্রতি বছরই লন্ডনে আসতেন। যখন লন্ডনে থাকতেন মাঝে মধ্যে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য জনাব আব্দুল মান্নান সাহেব এর যে বাসায় তিনি থাকতেন আমরা সেখানে যেতাম। একদিন যাওয়ার পথে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়। আমি বৃষ্টিতে ভিজে যাই। তাই তিনি যেই রুমে থাকতেন উক্ত রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আমি সালাম দিই। বৃষ্টিতে আমার শরীর ভেজা; তার সাথে মুসাফাহা ও মুআনাকা করলে আমার ভেজা কাপড়ের কারণে তাঁর কাপড় ভিজে যাবে তাই আমি তাঁর কাছে যাইনি। তখন তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "ইউনুছ আমার বুকে আস। এখনই তোমার একটু গরম হওয়া দরকার।" তিনি আমাকে অনেকক্ষণ বুকে জড়িয়ে রাখলেন। ২০১৬ সালে আমার মুখের ডান পাশ প্যারালাইসি হয়ে যায়। তাঁর ছোট ছেলে বন্ধুবর নাসিম সাঈদী ভাই আমাকে জানালেন তাঁরা আল্লামার সাথে জেলখানায় দেখা করতে গেলে আমার অসুস্থতার সংবাদ শুনার পর আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন। তারপর আরও কয়েকবার তাঁদের মাধ্যমে খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং একবার নাসিম সাঈদী ভাই আমাকে আল্লামার হাতের লেখা একটি চিরকুট মেসেজ করেন। তিনি উক্ত চিরকুটে আমার শশুর মাওলানা আব্দুল আউয়াল ও শাঈখ আব্দুল কাইউম ভাইসহ অনেকেরই কাছে সালাম দেন। আর আমাকে আমার লেখা যুগে যুগে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা ও জালিমের পরিণতি বইটি লেখার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি উক্ত বই এর দ্বিতীয় খণ্ড লেখার পরামর্শ দেন। আফসোসের বিষয় হচ্ছে তাঁর হাতের লেখা চিরকুটটি অনেক দিন সংরক্ষণে রাখলেও পরবর্তীতে হারিয়ে যায়। আমার স্নেহাস্পদ ভাতিজা জামিল মাহমুদ আল্লামার নাতিন জামাই। মাওলানা রফিক বিন সাঈদী ভাইয়ের ছোট মেয়ের সাথে তার বিবাহের সূত্র ধরে আল্লামার পরিবারের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর আমি অনেক কাছ থেকে তাঁর পরিবারকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার আলোকে আসহাবে রাসুলের পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি পরিবারের সদস্যদেরকে গড়ার চেষ্টা করেছেন। আমি মনে করি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে আল্লামার পরিবারের প্রতি। আমার ভাতিজা জামিলের ফোনের মাধ্যমে আল্লামার সাথে সর্বশেষ ২০২৩ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ কথা বলার দুর্লভ সুযোগ হয়। তখন আমি উমরাহর উদ্দেশ্যে মক্কায় ছিলাম। তিনি সেই কথা শুনে দুআ করতে বলেন যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উমরাহ করার সুযোগ করে দেন। আমিও বিনয়ের সাথে তাঁর কাছে দুআ চাই। দুনিয়ার জীবনে আল্লামার সাথে এটা শেষ কথা হবে তা ভাবিনি। কারণ আমাদের দুআ ছিল আল্লাহ যেন হযরত ইউসুফের মত জেলখানা থেকে আল্লামাকে মুক্ত করেন। হযরত ইউসুফ জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করার সুযোগ আল্লাহ তায়ালা করেন। আর তাঁকে দেওয়া মিথ্যা অপবাদ এর কলুষমুক্ত হন।

যেমনিভাবে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে কসাই কাদের বানানো হয়েছিলো অনুরূপভাবে আল্লামা সাঈদী (রহ.) কে কথিত দেইল্লা রাজাকার চিত্রিত করে অন্যায়ভাবে সাজা দেওয়া হয় যা দেশের মানুষ বিশ্বাস করেনি। আল্লামার ইন্তেকালের পর হাজারো গায়েবানা জানাযা এবং পিরোজপুরে জানাযার নামাজে লাখো মানুষের ঢল তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আল্লামা জেলে থাকার সময় তাঁর বড় ছেলে রফিক বিন সাঈদী ভাই মারা যান। তাঁর জানাযার নামাজের জন্য আল্লামা প্যারোলে কিছু সময়ের জন্য মুক্তি পেয়ে এসেছিলেন। উক্ত জানাযায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে মহান রবের কসম খেয়ে বলেছিলেন, "আমি রাজাকার নই। আমার গায়ে কথিত অপরাধের কোন কাদা লাগে নাই।" তিনি সব সময় বলতেন আল্লাহ যেনো তাঁকে রাজাকারের কালিমা মুক্ত করেন। আল্লাহর রহমতে তিনি সেই কালিমা মুক্ত। যেই বিশা বালীকে হত্যার অভিযোগে তাঁকে সাজা দেয়া হয়। তার ভাই সুখরঞ্জন বালি আল্লামার জানাযায়

> "আল্লামা সাঈদী তাঁর অনেক মাহফিলে নিজেকে মুফাসসির হিসাবে পরিচয় না দিয়ে তালেবে ইলম বা তাফসীরের ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিতেন। এটা ছিল তাঁর বিনয়ের নিদর্শন। এছাড়া তিনি এত বড় মাপের আলেম ও বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির হওয়ার পরেও যে কোন ধরনের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করতেন। আমার মনে পড়ে সর্বশেষ তিনি যখন লন্ডনে আসেন তখন আমি তাঁকে তাঁর আশির দশকের ওয়াজ এবং নব্বই এর দশকের ওয়াজের একটি বিশ্লেষণ মৌখিকভাবে দিয়েছিলাম এবং তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেছেন।"

উপস্থিত হয়ে জাতির সামনে স্পষ্ট করেছেন তাঁর ভাইয়ের হত্যার সাথে আল্লামা সাঈদী জড়িত ছিলেন না এবং তিনি রাজাকার ছিলেন না ও কোন অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। আল্লামা সাঈদী যে রাজাকার ছিলেন না তা তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধের সেই সেক্টর কমান্ডার স্পষ্ট করে গেছেন। আফসোসের বিষয় হচ্ছে, সুখরঞ্জন বালি যখন সত্য কথা তার সাক্ষ্যে বলতে মনস্থ করেন তখন তাকে আদালত প্রাঙ্গন থেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর কয়েক বছর ভারতের কারাগারে ছিলেন। আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালের পর অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাযার মাঠে হাজির হন এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য জাতির সামনে প্রদান করেন। সুখরঞ্জন বালির এই সাহসী ভূমিকার প্রশংসা করে স্যোশাল মিডিয়াতে আমেরিকাতে অবস্থানকারী একজন পিএইচডি গবেষক একটি পোস্ট দেওয়ার পর বাংলাদেশে তার মাকে গ্রেফতার করা হয়। এটা কতটা ন্যাক্কারজনক তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা আন্দামান বন্দির আত্মকাহিনী পড়েছি যয়নাব আল গাজালীর লেখা কারাগারে রাতদিন বইতে জুলুম নির্যাতনের অনেক ঘটনা পড়েছি। মূলত পৃথিবীর সকল দেশের জালিম এর ভূমিকা এক। তাদের ভাষা ও বর্ণের মাঝে পার্থক্য আছে কিন্তু জুলুমের উদ্দেশ্য ও ধরনের মাঝে পার্থ্যক্য নেই। তবে মুমিনের জন্য হতাশার বা ভয়ের কারণ নেই। রাত যত গভীর হয় সুবহে সাদিক তত কাছে আসে। তবে এই কথা ঠিক যে, আল্লামা প্রায় তের বছর জেলে ছিলেন। তিনি জেলে যাওয়ার আগে এক মাহফিলে জাতিকে এই ঘোর অমানিশার কালো রাত সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। তার মোকাবিলায় আমরা কী পদক্ষেপ নিয়েছিলাম তা পর্যালোচনার দাবি রাখে।

আল্লামা সাঈদী একটি নাম; একটি ইতিহাস। তাঁর ইন্তেকালের পর কোটি কোটি বনি আদম তাঁর জন্য দুআ করেছে এবং তা অনাগত কালেও অব্যাহত থাকবে। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের বিরোধী যারা তাদের অনেকেই শোক প্রকাশ করেছেন। এমনকি আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের কয়েক শত নেতা-কর্মী আল্লামার ইন্তেকালের খবর শুনে ইন্নালিল্লাহ পড়ার কারণে দল থেকে বহিষ্কৃত হন। অনেক কবি কবিতা লিখছেন; অনেক শিল্পী গানের কলিতে আবেগভরা ভাষায় তাঁর জন্য দুআ করছেন। কারণ তিনি সকলকে ভালবাসতেন। তাঁর এক মাহফিলে তিনি স্পষ্টত বলেছেন, "আওয়ামী লীগ আমার, বিএনপি আমার, জামায়াতে ইসলামী আমার, জাতীয় পার্টি আমার। যারা মানুষ তারা সকলেই আমার।" তাই যাদের মধ্যে মনুষত্ব এবং মানবিকতা রয়েছে তারা সকলেই আল্লামার জন্য চোখের পানি ফেলে দুআ করছে। বাংলাদেশে কাওমি ও আলিয়া মাদরাসার মাঝে পার্থ্যক্য রয়েছে। কিন্তু আল্লামার ভাষায় কাওমি ও আলিয়া তাঁর দুই চোখের মত।

আল্লামা সাঈদী তাঁর অনেক মাহফিলে নিজেকে মুফাসসির হিসাবে পরিচয় না দিয়ে তালেবে ইলম বা তাফসীরের ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিতেন। এটা ছিল তাঁর বিনয়ের নিদর্শন। এছাড়া তিনি এত বড় মাপের আলেম ও বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির হওয়ার পরেও যে কোন ধরনের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করতেন। আমার মনে পড়ে সর্বশেষ তিনি যখন লন্ডনে আসেন তখন আমি তাঁকে তাঁর আশির দশকের ওয়াজ এবং নব্বই এর দশকের ওয়াজের একটি বিশ্লেষণ মৌখিকভাবে দিয়েছিলাম এবং তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেছেন। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী প্রতি শতাব্দীতে এক বা একাধিক মুজাদ্দিদ আসেন। তারা দ্বীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাযদীদের কাজ করেন। আমার দৃষ্টিতে আল্লামা সাঈদী (রহ.) তাফসীর ও রাজনীতির ময়দানে তাযদীদের অনেক কাজ করেছেন। নির্ভয়ে সত্যকে সত্য বলা, জালিম শাহীর সাথে আপোষ না করে দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল থাকার তিনি নজরানা স্থাপন করেছেন। আল্লামা সাঈদী তিনি শিরক-বিদআত ও মাজারপূজার বিরোধী ছিলেন। তাঁর ওয়াজের ফলে সমাজ থেকে অনেক শিরক বিদআত মূলোউৎপাটিত হয়েছে। অনেক অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসেছে। অনেক মুসলিম যারা জানত না ইসলাম কী জিনিস তাদের সামনে ইসলামের রূপ সৌন্দর্য তুলে ধরছেন; যার ফলে অনেকেই অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে এসেছেন।

আল্লামার মাহফিলের অন্যতম প্রতিপাদ্য ছিলো মানব রচিত মতবাদের বিপরীতে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা। তাঁর যুক্তিপূর্ণ আলোচনার কারণে আশির দশকে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজিম বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে প্রত্যাখাত হয়েছে। এছাড়াও নব্বই দশক থেকে কারাবরণের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি মাহফিলে পুঁজিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অসরতা জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। আল্লামা সাঈদী নারীদের মর্যাদা ও ইসলামে নারীর অধিকার তুলে ধরেছেন। আমরা দেখি আল্লামা সাঈদীর আগে ইসলামে নারী অধিকার নিয়ে এত স্পষ্ট বক্তব্য নারী সমাজ শুনে নাই। তাই লাখো নারী তার ভক্ত ছিলো। এই কারণে তাঁর ফাসির রায় ঘোষনার পর অনেক নারীকে হাতে ঝাড়ু নিয়ে মিছিল করতে দেখা যায়। বিভিন্ন স্থানে নারীরাও পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।

আল্লামা সাঈদীর মত ব্যক্তিত্ব কয়েক যুগে নয় বরং কয়েক শতাব্দীতেও আসে না। আল্লামা সাঈদী (রহ.) এর জীবন ও কর্ম নিয়ে শুধু কয়েক ঘণ্টার আলোচনা কিংবা কিছু লেখালেখি করে মনের আবেগ প্রকাশ যথেষ্ট নয়। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ও অবদান নিয়ে পিএইচডি গবেষণাসহ অনেক রিসার্চ হওয়ার দাবি রাখে। আর আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন অনাগতকালে যোগ্য আলেম ও কুরআনের তাফসীরকারক তৈরীতে ভূমিকা রাখবে সেই প্রত্যাশা অনেকেরই। অনুরূপভাবে যারা আল্লামার ভক্ত অনুরক্ত রয়েছেন তাঁরা তাঁর লেখা বইগুলো পড়া এবং তাঁর গড়া প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি যত্নশীল থাকবেন আশা করি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি ইক্কামাতে দ্বীনের যেই আন্দোলনের কারণে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মুজাদ্দেদে আলফে সানী প্রমুখের মত কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন আমাদেরকে তাযদীদে দ্বীন ও ইক্কামাতে দ্বীনের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের ভুল ত্রুটি মাফ করুন; সীমাবদ্ধতা দূর করুন এবং আমরণ আমলে সালেহ ও সদকায়ে জারিয়ার কাজ করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহর নেক বান্দারা দুনিয়াতে আল্লাহর রাসুলকে স্বপ্নে দেখতে পারেন কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব নয়। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ তিনি যেন আল্লাহর সকল নেক বান্দাহগণের সাথে জান্নাতে তাঁর দীদার লাভের মত আমরণ নেক আমল করার তাওফিক দান করেন। আমিন।

লেখক: বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক
ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলের সদস্য, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) ও তাঁর কৃত আল কোরআনের অনুবাদের উপর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

ড. মিজানুর রহমান

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) ছিলেন বিশ্ব বরেণ্য আলেমেদ্বীন ও মুফাসসিরে কোরআন। তিনি একদিকে অসাধারণ বাগ্মিতার সাথে বাংলা ভাষী প্রায় সকল শ্রেণিকে আল কোরআনের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। অন্যদিকে লেখনীর মাধ্যমে তাঁর কথা, কাজ, চিন্তা ও দাওয়াতকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রেখে গিয়েছেন। কিংবদন্তি, ক্ষণজন্মা এই মহান মুফাসসির বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সকল ভ্রান্ত মতবাদের ব্যর্থতা ও ইসলামের সৌন্দর্য এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের সক্ষমতার পরিচয়টি তুলে ধরেছেন সারাটি জীবন। এই প্রবন্ধের কলেবর বেড়ে যাওয়ার ভয়ে আমি খুবই সংক্ষেপে উনার জীবনীর কিছু অংশ তুলে ধরে, তাঁর কিছু কাজ ও অনুবাদের উপর মূল্যায়ন করব। আশা করি তাঁর চিন্তা, কাজ ও লিখনীর উপর বিভিন্ন আঙ্গিকে কাজ হবে। কিছু কিছু গবেষকের কাছে আল কোরআনের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। নিবন্ধের শেষ দিকে তাঁদের প্রশ্নের ও জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ উনার সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

আল্লামা সাঈদী (রহ.) এর লিখিত ৫০ এর অধিক বই থেকে এখানে কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি যা ইসলামের ও কোরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার মূলনীতি, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম, শিশুর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়, পবিত্র কোরআনের মু'জিজা, মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল-কোরআন, হাদিসের আলোকে সমাজ জীবন, দ্বীনে হক-এর প্রতি দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি, দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা, তাফসীরে সাঈদী-সুরা আল-আসর, তাফসীরে সাঈদী-সুরা লুকমান, তাফসীরে সাঈদী-সুরা আল-ফাতিহা, তাফসীরে সাঈদী- আমপারা, বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন-১ম খণ্ড, বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন-২য় খণ্ড, আল্লামা সাঈদী রচনাবলী-১ম খণ্ড, আল্লামা সাঈদী রচনাবলী-২য় খণ্ড, মাওলানা সাঈদী রচনাবলী-৩য় খণ্ড, সীরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন, নন্দিত জাতি নিন্দিত গন্তব্যে।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর লিখিত ও প্রকাশিত এই সব বই বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। কোরআন, হাদিস, আকীদা, সীরাতে রাসুল (সা.), ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ইসলামী রাজনীতি, দাওয়াতে দ্বীন ইত্যাদি বিষয়ে লিখা তাঁর বই গুলো পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সৌভাগ্য ছিল যে, আল্লাহ তার ভেতরে একদিকে ভালো বক্তা, একদিকে ভালো লেখক, ভালো দায়ী, ভালো রাজনীতিবীদ ইত্যাদি অনেক গুণের সমাহারে সমৃদ্ধ করেছিলেন। আমরা সাধারণত অনেক ভালো লেখকদের চিনি যারা হয়ত ভালো বক্তা নন। আবার অনেক ভালো বক্তাকে চিনি যারা হয়ত ভালো লেখক নন। আবার অনেক বক্তা ও লেখক আছেন যারা সরাসরি জনগণের সাথে সম্পৃক্ত নন। আল্লামা সাঈদীর নানাবিধ যোগ্যতার কারণে তিনি একদিকে তাঁর দল জামায়াতে ইসলামীতে জনপ্রিয় ছিলেন, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন।

আল্লামা সাঈদীর জেল খানায় বসে করা আল কোরআনের অনুবাদ

"কোরআনুল কারিম, সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ"

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কারাগারে থাকা কালে "কোরআনুল কারিম, সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ" নামে আল কোরআনের একটি অনুবাদ করেছিলেন, ২০১৮ সালে গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক, বাংলাবাজার ঢাকা পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত

হয়েছিল। এ ছাড়াও তিনি আল কোরআনের সুরা ফাতিহা, ত্রিশতম পারা (আমপারা), সুরা লুকমান ইত্যাদি সুরার বাংলায় তাফসীর করেছেন। আমি এই অংশে আল্লামা সাঈদীর অনুবাদের উপরে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে কিছু মূল্যায়ন করতে চাই।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর (রহ.) অনুবাদের কিছু নমুনা

আল্লামা সাঈদীর অনুবাদের উপর মূল্যায়ন করতে গিয়ে আল কোরআনের বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকটি আয়াত বাছাই করে এই আয়াতগুলোর উপর আল্লামা সাঈদীর করা অনুবাদ ও বাংলা ভাষায় করা অন্যান্য অনুবাদসমূহের কিছুটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে আল্লামার অনুবাদটি যে সাধারণ পাঠকদের জন্য তাফসীরের সহযোগিতা ছাড়াও বুঝতে সহজ হবে, তাই মূলত ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, গভীর ভাবে কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে তাফসীরের কোন বিকল্প নেই। অনুবাদ কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক মাত্র। বাংলা ভাষায় আল কোরআনের অনুবাদে বিভিন্ন অনুবাদক, অনুবাদ শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী যে অনুবাদগুলো করেছেন তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। এখানে আল্লামা সাইদীর অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করা মানে অন্যান্য সকল অনুবাদকে ভুল প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সারা জীবন ঘুরে ঘুরে দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের উপর দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণই আল্লামা সাইদীকে আল কোরআনের শাব্দিক অনুবাদের চেয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের দিকে ধাবিত করেছে বলে মনে করি। শুধু শাব্দিক অনুবাদ পড়ে তাফসীরের সহযোগিতা ছাড়া কোরআন বুঝা অসম্ভব তাই অবশ্যই তাফসীরের সহযোগিতা নিতে হয়। কিন্তু সবার পক্ষে তাফসীর ক্রয় করা, সংগ্রহে রাখা, বহন করে সাথে রাখা কঠিন, তাই অতি সংক্ষিপ্ত ও না, আবার অতি দীর্ঘও না, তিলাওয়াত ও ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ থেকে কোরআনের অর্থ বুঝা যাবে এমন করেই তিনি ব্যাখ্যামূলক অনুবাদটি করেছেন। প্রথম উদাহরণ হিসেবে সুরা রুমের প্রথম আয়াত সমূহ দেখা যাক।

الٓمٓ ١ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ٣ فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَيَوۡمَئِذٖ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ

আল্লামা সাঈদীর অনুবাদঃ "আলিফ লাম মীম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে, নিকটস্থ ভূমিতে পারসিকদের কাছে, কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পর খুব শীঘ্রই পারসিকদের উপর বিজয়ী হবে। পারসিকদের উপর রোমানরা বিজয়ী হবে তিন থেকে নয় বিজোড় বছরের মধ্যে, কোন কাজটি পূর্বে সংঘটিত হবে এবং কোন কাজটি পরে সংঘটিত হবে এ ফায়সালা মহান আল্লাহরই হাতে। একই বছরে রোমানদের উপর পারসিকদের বিজয় ও ইসলাম বিরোধীদের মোকাবেলায় বদরের প্রান্তরে মুসলিমদের বিজয়ে সেদিন মুমিনরা দ্বিগুণ আনন্দিত হবে"। (সুরা রুম ৩০/১-৪, সাঈদী, কোরানুল করিম' সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ, পৃষ্ঠা : ৫৯৮)

এই আয়াত সমূহের অনুবাদে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদটি উল্লেখ করছি। "১) আলিফ-লাম-মীম। ২) রোমানগণ পরাজিত হইয়াছে। ৩) নিকটবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু উহারা উহাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হইবে, ৪) কয়েক বছরের মধ্যেই, পূর্বের ও পরের ফায়সালা আল্লাহরই। আর সেই দিন মুমিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হইবে। (আল কুরানুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা ৬৫৪) ইসলামিক ফাউন্ডেশন শাব্দিক অনুবাদ করলেও "রুম, নিকটবর্তী অঞ্চল ও বিদয়ী সিনিন" শব্দ সমূহের সংক্ষিপ্ত টীকায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আল্লামা সাঈদীর অনুবাদে "নিকটস্থ ভূমিতে পারসিকদের কাছে, কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পর খুব শীঘ্রই পারসিকদের উপর বিজয়ী হবে"। অংশ দ্বারা রুমকদের প্রতিপক্ষ উল্লেখ করায় পাঠকদের কাছে অনুবাদ থেকেই এই আয়াতটি বুঝতে সহজ হবে বলে মনে করি।

وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلۡغَاوُۥنَ ٢٢٤ أَلَمۡ تَرَ أَنَّهُمۡ فِي كُلِّ وَادٖ يَهِيمُونَ ٢٢٥ وَأَنَّهُمۡ يَقُولُونَ مَا لَا يَفۡعَلُونَ

আল্লামা সাঈদীর অনুবাদঃ "আল্লাহ ভীতিহীন বস্তুবাদী কবিরা! এদেরকে তো পথভ্রষ্ট লোকজনই মর্যাদা দিয়ে অনুসরণ করে। তুমি কি দেখতে পাও না, আল্লাহভীতিহীন বস্তুবাদী কবিরা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্তের অনুরূপ বিচরণ করে? এ প্রকৃতির কবিরা এমন সব কথা দ্বারা ছন্দ, পঙক্তি রচনা ও বাক্য সজ্জিত করে যা তারা নিজেরা করে না"। (সুরা শুয়ারা ২৬/২২৪-২২৬, সাঈদী, কোরানুল করিম' সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ, পৃষ্ঠা-৫৫৬)

সুরা শুয়ারার এই আয়াত গুলোর অনুবাদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমানের অনুবাদ (পৃষ্ঠা ৬২৮) থেকে দেখতে পারি। যেমন, "২২৪) আর বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে। ২২৫) তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? ২২৬) আর নিশ্চয়ই তারা এমন কথা বলে, যা তারা করে না"। এই অনুবাদ গুলোতেও কোন ভুল মনে করার কারণ নেই।

কিন্তু আল্লামা সাইদীর অনুবাদে, আয়াতে বর্ণিত জাহেলী কবিদের থেকে ইসলামী কবিদের আলাদা করে তুলে ধরা হয়েছে। "আল্লাহ ভীতিহীন বস্তুবাদী কবিরা" অংশ দ্বারা সাহাবী কবি হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.) ও আজ পর্যন্ত তাঁরই অনুসারী ইসলামী কবিদের আলাদা করে অনুবাদ করা হয়েছে। "এদেরকে তো পথ ভ্রষ্ট লোকজনই মর্যাদা দিয়ে" অনুসরণ করে। এই অংশেও কিভাবে অনুসরণ করে প্রশ্নের সুন্দর জবাব চলে এসেছে মনে করি। "তুমি কি দেখতে পাও না, আল্লাহভীতিহীন বস্তুবাদী কবিরা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্তের অনুরূপ বিচরণ করে? এ প্রকৃতির কবিরা এমন সব কথা দ্বারা ছন্দ, পঙক্তি রচনা ও বাক্য সজ্জিত করে যা তারা

নিজেরা করে না”। এখানে অন্যান্য অনুবাদকগণ ও সুন্দর অনুবাদ করেছেন, তবে আল্লামা সাঈদীর প্রয়োগকৃত অতিরিক্ত শব্দগুলো সাধারণ পাঠকদের উক্ত আয়াত বুঝার জন্য সহায়ক হয়েছে বলে মনে করি।

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ ۖ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

আল্লামা সাঈদীর অনুবাদঃ উহুদের ময়দানে কোরআনের অনুসারী ও এর বিপরীত আদর্শের অনুসারী দু'টি দল পরস্পরের মুখোমুখী হয়েছিল, আর মুসলিম বাহীনির অন্তর্ভুক্তদের মধ্য থেকে যারা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো, তাদের নিজেদেরই কোন কোন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিলো। দুর্বলতা প্রদর্শনকারী এসব লোক অনুশোচনা প্রকাশ করলে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাসুলভ দৃষ্টি দিলেন, কেননা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'আলা অসীম ক্ষমাশীল ও পরম ধৈর্যের অধিকারী। (আল ইমরান, ৩/১৫৫, সাঈদী, কোরানুল করিম' সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ, পৃষ্ঠা-১১৯)

এই আয়াতের অনুবাদের মূল্যায়ন করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদটি দেখা যেতে পারে। ইসলামী ফাউন্ডেশনের অনুবাদটি নিম্নরূপ– “যেদিন দুইদল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সেই দিন তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা পৃষ্টপ্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাহাদের পদস্খলন ঘটাইয়াছিল। অবশ্য আল্লাহ তাহাদের ক্ষমা করিয়াছেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল। (আল ইমরান, ৩/১৫৫, আল কুরানুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা ১০৫)

আল্লামা সাঈদীর অনুবাদে يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ “যেদিন দুইদল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল” অংশের অনুবাদে শানে নুযুলের দিকে লক্ষ্য রেখে অনুবাদ করা হয়েছে। “উহুদের ময়দানে কোরআনের অনুসারী ও এর বিপরীত আদর্শের অনুসারী দুটি দল পরস্পরের মুখোমুখী হয়েছিল” অংশে সেদিনের ঘটনাস্থলের উল্লেখ থাকায় যে কোন সাধারণ পাঠকের পক্ষে আয়াতটি বুঝতে সহজ হয়েছে বলে মনে করি।

وَرَبُّكَ ٱلْغَنِىُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنۢ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ١٣٣ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَـَٔاتٍ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

আল্লামা সাঈদীর অনুবাদঃ “হে রাসুল! আপনার পালনকর্তা মহান আল্লাহ সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত ও পরম অনুগ্রহশীল, তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের বিদ্রোহের কারণে তোমাদেরকে এ জনপদ থেকে অপসারিত করতে পারেন এবং তোমাদের পরে যাকে চান তাদেরকেও জনপদের অধিবাসী হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে নিয়ে এসেছেন অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে। আমার বিধান অমান্য করে জনপদসমূহে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করলে আমার গযব তরান্বিত হবে, তোমাদের প্রতি এ সম্পর্কে যে ওয়াদা প্রদান করা হয় তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, আর তোমরা আমার ওয়াদা ব্যর্থ করে দিতে কখনোই সক্ষম নও”। (আল আনয়াম ৬/১৩৩-১৩৪, সাঈদী, কোরানুল করিম' সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ, পৃষ্ঠা-২১৮)।

এই আয়াতের অনুবাদের মূল্যায়নের জন্য মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিমের অনুবাদ থেকে দেখা যাক। ১৩৩) “তোমার প্রভু অভাবমুক্ত রহমত ওয়ালা দয়াময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সরিয়ে দিতে পারেন এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অপর একটি কওমের বংশধারা থেকে। ১৩৪) তোমাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই তা অবশ্যই আসবে। তোমরা সেটার আগমন ঠেকাতে পারবে না। (আবদুস শহীদ নাসিম, আল কোরআনঃ সহজ বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১৫০।)

আল্লামা সাঈদীর অনুবাদে “তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের বিদ্রোহের কারণে তোমাদেরকে এ জনপদ থেকে অপসারিত করতে পারেন এবং তোমাদের পরে যাকে চান তাদেরকেও জনপদের অধিবাসী হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন”।“তোমাদের বিদ্রোহের কারণে” শব্দ সমূহ যুক্ত করার কারণে তাদের অপসারণের কারণ বুঝা সহজ হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আল্লামা সাঈদীর অনুবাদঃ “হে ইমানদার জনগোষ্ঠী! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক এবং তার অনুপ্রেরণায় আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত আদর্শ সমুহের অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক ও তার দ্বারায় উদ্ভাবিত আদর্শের অনুসরণ করে, শয়তানের ও তার পদাঙ্কের অনুসারী লোকজন তাকে সৎচরিত্র গড়ার পরামর্শ না দিয়ে অশ্লীলতা ও মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর কর্ম করারই আদেশ দেবে। মহান আল্লাহ যদি তাঁর অনুগ্রহ ও রহমত দ্বারা সততা- স্বচ্ছতা, ন্যায়-অন্যায় ও শালীনতা অশালীনতার পার্থক্য শিক্ষা না দিতেন, তাহলে তোমাদের কেউই নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের কারণে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পরিশুদ্ধ হতে পারতে না, তবে মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাকেই পরিশুদ্ধ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা সব কিছুই শোনেন ও সব কিছুই জানেন”। (সুরা নুর ২৪/ ২১, সাঈদী, কোরানুল করিম' সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ, পৃষ্ঠা-৫১৭)

এই আয়াতের অনুবাদের উপর মূল্যায়ন করার জন্য আবার প্রফেসর ড. মজিবুর রহমানের অনুবাদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

"হে ইমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সব কিছু শোনেন, জানেন"। (মজিবুর রহমান, কোরানুল করিম, পৃষ্ঠা ৫৮৫)

এখানে لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ "তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না", অংশের অনুবাদে আল্লামা সাঈদী "তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক এবং তার অনুপ্রেরণায় আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত আদর্শ সমুহের অনুসরণ করো না" বলে অনুবাদ করেছেন। আল্লামা সাঈদীর অনুবাদ দ্বারা শয়তানের অনুপ্রেরণায় আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত বস্তু বা আদর্শের উল্লেখ করায় শয়তানের নানামুখী ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং মুসলমানরা সতর্কতা অবলম্বন করতে সহজ হবে।

فَأَلْقَوْا۟ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا۟ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَٰلِبُونَ ٤٤ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٥ فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ٤٦ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٤٧ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

আল্লামা সাঈদীর অনুবাদঃ যাদুকরগণ তাদের রশি এবং লাঠি ময়দানে নিক্ষেপ করলো ও তারা বললো ফেরাউনের মর্যাদার শপথ! নিশ্চয়ই আমরা বিজয়ী হবো। এরপর মুসা তাঁর লাঠি ময়দানে নিক্ষেপ করলো এবং তৎক্ষণাৎ তা বিশালাকারের অজগরে রূপ ধারণ করে যাদুকরদের ছুড়ে দেওয়া দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার মতো অলীক সৃষ্টি গুলোকে গিলে ফেলতে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে যাদুকরগণ তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করলো মুসার সাথে রয়েছে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা, আর তারা যা করছে তা যাদু। এ জন্য যাদুকরগণ সাথে সাথে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাজদাবনত হয়ে গেলো এবং তারা ঘোষণা দিয়ে বললো, ফেরাউন রব নয়, আমরা সেই প্রকৃত রব-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতসমূহের রব। অনুগত হলাম তাঁর প্রতি, যিনি মুসা ও হারুনের রব। (সুরা আশ শুয়ারা ২৬/৪৪-৪৮, সাঈদী, কোরানুল করিম' সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ, পৃষ্ঠা-৫৪৩।)

এই আয়াতসমুহের অনুবাদের উপর মূল্যায়ন করার জন্য ইসলামী ফাউন্ডেশনের অনুবাদের সহযোগিতা নেওয়া যায়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদঃ ৪৪) "অতঃপর উহারা উহাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং উহারা বলিল, ফিরআওনের ইযতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হইব। ৪৫) অতঃপর মুসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, সহসা উহা উহাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল। ৪৬) তখন যাদুকরেরা সিজদাবনত হইয়া পড়িল। ৪৭) এবং বলিল, আমরা ইমান আনয়ন করিলাম জগতসমুহের প্রতিপালকের প্রতি। ৪৮) যিনি মুসা ও হারুনের ও প্রতিপালক"। (আল কুরানুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা ৫৯০।)

বাংলা ভাষার অধিকাংশ অনুবাদক فَأَلْقَوْا۟ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ অংশের অনুবাদে "অতপর উহারা উহাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল" বলেই অনুবাদ করেছেন। কিন্তু আল্লামা সাঈদী তাঁর অনুবাদে "যাদুকরগণ তাদের রশি এবং লাঠি ময়দানে নিক্ষেপ করলো" বলে অনুবাদ করেছেন। প্রথমে রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপকারী ছিল যাদুকরেরা। অন্যান্য অনুবাদে শাব্দিক অনুবাদ করায় "উহারা" সর্বনাম উল্লেখ করেই অনুবাদ করেছেন। যা অনুবাদ শাস্ত্র অনুযায়ী সঠিক। কিন্তু এই জায়গাতে আল্লামা সাঈদী রশি ও লাঠি নিক্ষেপকারীদের আসল পরিচয় দিয়ে ব্যাখ্যা করায় সাধারণ পাঠকদের কাছে বুঝতে আরো সহজ হবে।

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

এই আয়াতের অনুবাদে ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ অধিকাংশ অনুবাদক "অতঃপর মুসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, সহসা উহা উহাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল" অনুবাদ করেছেন। কিন্তু আল্লামা সাঈদী তাঁর অনুবাদে "এরপর মুসা তাঁর লাঠি ময়দানে নিক্ষেপ করলো এবং তৎক্ষণাৎ তা বিশালাকারের অজগরে রূপ ধারণ করে যাদুকরদের ছুড়ে দেয়া দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার মতো অলীক সৃষ্টি গুলোকে গিলে ফেলতে লাগলো" বলে অনুবাদ করেছেন। আল্লামা সাঈদী শাব্দিক অনুবাদের পরিবর্তে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করায় কোরআনের সুরা আরাফের ১০৭ নং আয়াতে বর্ণিত (فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ) আয়াতের ভিত্তিতে "অজগরের রুপ ধারণ করে" অনুবাদ করেছেন। যা পাঠকের জন্য অনুবাদ পড়েই আয়াতের অর্থ বুঝতে সহায়ক হয়েছে বলা যায়।

আপনি তুমি সম্বোধন

বাংলা ভাষায় সম্বোধনের ক্ষেত্রে আপনি, তুমি, তুই এ তিন ধরনের সম্বোধনে রীতি প্রচলিত। অধিকতর সম্মানিত কাউকে সাধারণত আপনি, সমবয়সী বা ছোট কাউকে সাধারণত তুমি, অধিকতর ছোট বা বন্ধু পর্যায়ের অথবা অধীনস্থ কারো সাথে সম্বোধনে তুই শব্দ ব্যবহৃত হয়। স্থান, কাল, পাত্রভেদে এই সব সম্বোধন ঐতিহ্যগত ভাবে চলমান। সে হিসেবে আল কোরআনে আল্লাহ রাসুল (সা.) কে সম্ভোধনের সময় বা আল্লাহর কাছে রাসুলগণের প্রার্থনামূলক আয়াত গুলোর অনুবাদে বিভিন্ন অনুবাদক "তুমি" সম্ভোধন সূচক শব্দ দিয়েই অনুবাদ করেছেন। আগেই বলেছি যে, এভাবে সম্ভোধন প্রচলিত ও দোষের নয়। কিন্তু আল্লামা সাঈদী তাঁর স্বভাব সুলভ ভদ্রতা থেকে এই সব সম্ভোধনের বেলায়ও আপনি শব্দ দিয়ে অনুবাদ করেছেন। অনুবাদে এত সূক্ষ্ম বিষয়গুলো খেয়াল করতে পারাটা নিশ্চয়ই অসাধারণ। নিম্নের আয়াতে এটি আরো পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠবে আশা করি।

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۖ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আল্লামা সাঈদীর অনুবাদঃ হে রাসুল! ওদের কথায় আপনি কষ্ট পাবেন না, কেননা আপনার পূর্বে আমি মানুষকেই নবী রাসুল মনোনীত করে জনপদের লোকদের কাছে প্রেরণ করেছি। আপনি তাদেরকে বলুন, নবী রাসুলদেরকে মানুষের মধ্য থেকেই প্রেরণ করা হয়, এ বিষয়টি তোমাদের যদি জানা না থেকে তাহলে ইতঃপূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে প্রকৃত সত্য জেনে নাও। (সুরা আল আম্বিয়া ২১/৭, সাঈদী, কোরানুল করিম' সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ, পৃষ্ঠা- ৪৭৩)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ

আল্লামা সাঈদীর অনুবাদঃ জ্ঞান, বিবেক, বোধ-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকজন স্বীয় মালিক আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ! আপনি যখন আমাদের সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন তখন আপনি আমাদের চিন্তা-চেতনার জগতকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হতে দিয়েন না এবং আমরা যেন সত্যের উপর আমৃত্যু দণ্ডায়মান থাকতে সক্ষম হই, এ জন্য আপনার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, কেননা আপনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহানদাতা। (সুরা আল ইমরান ৩/৮, সাঈদী, কোরানুল করিম' সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ, পৃষ্ঠা- ৯১) এভাবে আরো অনেক জায়গায় তাঁর অনুবাদের সৌন্দর্য আমরা লক্ষ্য করি।

তাঁর অনুবাদ ও তাফসীরের কিছু বিশেষত্ব

1) ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ। আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর করা বাংলা ভাষায় আল কোরআনের অনুবাদটি বাংলা ভাষায় প্রচলিত অন্যান্য অনুবাদ সমূহ থেকে কিছুটা ভিন্নতা আছে। যেমন তিনি শাব্দিক অনুবাদের পরিবর্তে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছেন।
2) সাধারণ মানুষদের উদ্যেশ্যে লিখিত বা অনুবাদিত। আলেম সমাজ মূলত নিজেদের অর্জিত জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও তাফসীরের সহযোগিতায় আল কোরআনকে বুঝার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাঁদের কথা মাথায় রেখে তিনি অনুবাদ করেছেন। ফলে কিছুটা দীর্ঘ মনে হতে পারে কারো কাছে। কিন্তু তার অনুবাদ কোরআন শরীফকে বোঝার জন্য যথেষ্ট সহায়ক বলে মনে করি।
3) কোরআনকে নিজ জীবনের সাথে একাকার করে অনুবাদ করেছেন। সারা জীবন সকল বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে বাংলা ভাষাভাষী আল্লাহর বান্দাহদের কাছে আল্লাহর কোরআনের বাণী পৌঁছে দেয়ার অদম্য এক বাসনা পেয়ে বসেছিলো তাঁকে। আর এই কাজটি তিনি করেছেন সামগ্রিক উপায়ে। একদিক তাফসির মাহফিলের মাধ্যমে অন্যদিকে লিখিত বই পত্রের মাধ্যমে। তাঁর সকল কাজের আমার বিবেচনায় কোরআনের অনুবাদ ও তাফসীরই শ্রেষ্টতর কাজ বলা চলে।
4) একই সাথে কুরানের প্রচারক ও অনুবাদক। আল্লামা সাঈদী তাঁর কর্ম জীবনের শুরু থেকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আল কোরআনের তাফসীরের মাধ্যমে একদিকে সারা বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে কোরআন প্রচার করেছেন। আবার আল কোরআন নিয়ে তাঁর চিন্তা থেকে মানুষ আরো উপকৃত হওয়ার জন্য এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি লিখিত অনুবাদের মাধ্যমে স্থায়ী পাঠ্য উপকরণে রুপ দিয়েছেন। একই কথা তাঁর লিখিত অন্যান্য গ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য।
5) কোরআনকে প্রাক্টিক্যাল ময়দানে থেকেই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। মুসলিম বিশ্বে এমন অনেক সেরা স্কলারদের ও পাওয়া যায় যারা কোরআনের সুন্দর আলোচনা করেন। কিন্তু কোরআনের পথে সারা জীবন জুলুম নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বিরল এক ব্যক্তিদের অন্যতম যারা কোরআনের কথা বলতে গিয়ে প্রতি পদে পদে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত জালিমের অন্ধকার জেল কারাগারে থেকে জীবনকে শেষ করতে হয়েছে।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের বৈধতা প্রসঙ্গে তাফসীরের উসুল বিদগণের মতামত

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কোরআনের অন্যান্য অনুবাদকদের মত শুধুমাত্র শাব্দিক অনুবাদ করার পরিবর্তে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছেন। আমাদের সমাজে আল কোরআনের শাব্দিক বা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রচলিত থাকায় ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ আমাদের সমাজের কোরআন পাঠকদের কাছে খুব পরিচিত কোন বিষয় নয়। ফলে কোন কোন কোরআনের পাঠকের পক্ষ থেকে এ ধরনের অনুবাদের বৈধতা নিয়ে ও প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রশ্ন দূরীকরণে বিষয়টির আলোচনা জরুরী মনে করছি। উসূলে তাফসীরের বিভিন্ন বইয়ের মাঝে ব্যাখ্যামূলক তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা এসেছে। যেমন মোহাম্মদ হোসাইন আযযাহাবীর আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন গ্রন্থে আরবী ভাষার বাইরে বিদেশী ভাষায় ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের বৈধতা ও প্রয়োজনীতা তুলে ধরা হয়েছে।

মোহাম্মদ হোসাইন আযযাহাবীর মতে অনারব বা কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে অপারগ যে কোন মুসলমান বা অমুসলমানদের প্রতি দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য, হেদায়াতের পথ দেখানোর জন্য আল কোরআনের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আরবী ভাষাজ্ঞানহীন জনসাধারণকে আরবী ভাষার প্রতি ঘৃণা তৈরী করে কোরআন থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার জন্য ভিত্তিহীন বিশ্বাস এবং

বিভ্রান্ত শিক্ষা দিয়ে কোরআনকে অনুবাদ করার চেষ্টায় রত মিশনারিদের হাত থেকে কোরআন ও এর পাঠকদেরকে রক্ষার জন্য ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ ক্ষেত্রেও ভ্রান্তি থেকে রক্ষার জন্য ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবার জন্য কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

১। ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ হাদিস সমূহ, আরবি ভাষার নিয়ম-কানুন, ইসলামী শরীয়াতের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির আলোকে করা হলে নির্ভর যোগ্য হবে। এমতাবস্থায় অনুবাদকের অবশ্যই মূল মতনের অর্থ যথার্থ ভাবে ফুটিয়ে তুলার জন্য গ্রহণযোগ্য যে কোন একটি তাফসীরের উপর নির্ভর করতে হবে। কোন তাফসীরের উপর নির্ভর না করে যদি কোরআনের অর্থকে শুধু মাত্র নিজের মত অনুযায়ী অনুবাদ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২। অনুবাদক, কোরআনের আনীত মূলনীতি সমূহের বিপরীত ভিত্তিহীন আকীদা বিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকবেন। এটি একই সাথে মুফাসসিরের জন্য ও আবশ্যকীয় শর্ত। কারণ অনুবাদক বা মুফাসসিরদের কেউ একজন ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসে যুক্ত হলে তা তার চিন্তার জগতেও প্রভাব বিস্তার করে। এমতাবস্থায় মুফাসসির বা অনুবাদক কোরআনের অনুবাদে বা ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া উপায়ে অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করে থাকেন। আর এ ভাবে উভয় পন্থায় কোরআনের হিদায়াত থেকে দুরে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়।

৩। অনুবাদক, কোরআনের ভাষা এবং অনুবাদের ভাষা উভয়টিতে দক্ষ হতে হবে। এই উভয় ভাষার সুখ্যাতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলো এবং এর নিয়ম পদ্ধতি সমূহে পারদর্শী হতে হবে।

৪। প্রথমে কোরআনের, তার পরে তাফসীরের অতঃপর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করা উচিত। এতে করে কুরআনের অনুবাদ অধিকতর শুদ্ধ হবে এবং ভুল ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

এ শর্তসমূহ কুরআনের ভাষা থেকে অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ করতে ইচ্ছুক যে কারো জন্য দুর্বলতামুক্ত হয়ে অনুবাদ করতে ইচ্ছুক যে কারো জন্য আবশ্যকীয় নিয়ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

উসুলে তাফসীরের এই সব নিয়ম সমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তার ব্যাখ্যামূলক অনুবাদে এই নিয়মগুলো মেনেই অনুবাদ করেছেন। এর পরও তিনি নিজের অনুবাদকে নির্ভুল দাবি করেননি। তার অনুবাদের ভূমিকাতে তিনি যে কোন ভুল ত্রুটির জন্য পাঠকের কাছে বিনয়ের সাথে ক্ষমা চেয়ে দৃষ্টি গোচরীভূত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা পোষণ করেছেন।

আল্লামা সাঈদীর এই ধরনের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা বোধ করার পেছনে আরেকটি কারণ মনে করি উনার দীর্ঘদিন দাওয়াতের ময়দানে সরাসরি যুক্ত থাকা। অনেক অনুবাদককে দেখা যায়, নিজে অনেক বড় আলেম হলেও দাওয়াতের ময়দানে নিজে সরাসরি যুক্ত নন যে রকম সাঈদী সারা জীবন যুক্ত ছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের বা কোরআনের সাধারণ পাঠকদের জন্য বা নিজের এলাকার ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। কাজেই যে কোন আগ্রহী পাঠককে বা কোরআনের যে কোন ছাত্রকে কোরআন বুঝার জন্য সহজ উপায় হিসেবে অন্যান্য অনুবাদ গুলোর পাশাপাশি দেলাওয়ার হোসাইন সাইদীর করা অনুবাদ ও সংগ্রহে রেখে অধ্যয়ন করলে কোরআন বোঝা আরো সহজ হবে বলে মনে করি।

উপসংহার

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সারা জীবনের দাওয়াতি কাজ, ইসলামের সামাজিক সুবিচার ও ন্যায় ভিত্তিক বণ্টন পদ্ধতিতে একটি রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, তাঁরই লিখিত পঞ্চাশের অধিক সাহিত্য কর্মের মধ্যে আল কোরআনের অনুবাদ ও তাফসীরের যে টুকুই করতে পেরেছেন তাই তার শ্রেষ্ঠতম কাজ বলা চলে। বিশেষ করে তাঁর অনুবাদকৃত আল কোরআনের অনুবাদটি কোরআনকে সহজ ভাবে বুঝার জন্য অনেক সহায়ক মনে করি। আমি আল কোরআনের একজন ছাত্র ও গবেষক হিসেবে আল্লামা সাঈদীর অনুবাদ গ্রন্থটি সংগ্রহে রাখাটা জরুরী মনে করি।

আমরা দোয়া করি আল্লাহ, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে তার সারা জীবনের ভালো আমল সমূহের উসিলায়, সারা দুনিয়াতে তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী আল্লাহর বান্দাহদের দোয়ার উসিলায় আল্লাহ উনাকে ক্ষমা করে দিন। আমাদেরকেও তাঁদের রেখে যাওয়া দায়িত্ব পালনের তাওফিক দিন।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গাজী আন্তেপ বিশ্ববিদ্যালয়, তুরস্ক

আল্লামা সাঈদী স্মরণে

আলী আহমাদ মাবরুর

আল্লাহর অশেষ রহমতে, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে শৈশব থেকেই দেখার সুযোগ হয়েছে। সবাই যেভাবে দেখেছে, তেমনি প্রকাশ্য জমায়েতে দেখেছি। আবার একান্তভাবেও দেখেছি। বহুবার আমার বাসায় তাকে আপ্যায়ন করেছি। আবার অনেকবার পারিবারিকভাবে তাঁর বাসায় গিয়েছি। আবার একদমই একা একাও তাঁর সাথে সময় অতিবাহিত করার সুযোগ আমার হয়েছে। এমনকী ২০১০ সালের জুন মাসে আটক হওয়ার পর বিভিন্ন আদালতে, ট্রাইবুনালে, তিনি যখন আসা যাওয়া করতেন, প্রতিবারই কমবেশি তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি। তাঁর খেদমত করার সুযোগও হয়েছে। বাংলাদেশের জমিনে ইসলামী আন্দোলন বিগত ৫০-৬০ বছরে শ্রেষ্ঠ যে সম্পদগুলো উপহার দিয়েছে, আল্লামা সাঈদীসহ তাদের সকলকেই ঘনিষ্ঠভাবে দেখার, সান্নিধ্যে যাওয়ার এবং একান্ত সময় অতিবাহিত করার তাওফিক আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তাদের বিদায় বেলায় উপস্থিত থাকার এবং জানাজায় শরীক হওয়ার সুযোগও করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। এগুলোই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন, শ্রেষ্ঠ পাওয়া, শ্রেষ্ঠ স্মৃতি।

আমার দেখায় আল্লামা সাঈদীর শেষ দিনগুলো

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে যুগশ্রেষ্ঠ দাঈ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর শেষ সময়ের পুরোটাই তাঁর সাথে, তাঁর পরিবারের সাথে কাটাতে পেরেছি। তাঁর ইন্তেকালের দিন, এবং পরের দিন অর্থাৎ যেদিন তার জানাজা হয়েছিল– এ দুটো দিন আমার জীবনের অনন্যসাধারণ দুটো দিন। একটানা নির্ঘুম, দণ্ডায়মান দুটো দিন। হয়তো ধাপে ধাপে লিখবো। কিংবা হয়তো এগুলো মেমোরিতেই থেকে যাবে, কখনো প্রকাশ করা হবে না। আল্লামা সাঈদীর মতো একজন মানুষ আবার এই বঙ্গে কবে জন্ম নেবে, আদৌ নেবে কিনা তাও জানি না।

সোমবার বিকেলে যখন মাসুদ সাঈদী ভাই আর আমি যখন পিজি হাসপাতালের পেছনের একটি হোটেলে একসাথে বসে চা খাচ্ছিলাম, তখনও আমরা কল্পনাও করতে পারিনি–এমন কোনো সংবাদ বা মুহূর্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তবে এবার সবকিছু প্রথম থেকেই অনেকটা ভিন্ন ছিল। সাঈদী সাহেব কারাবন্দি হওয়ার পর এবারই প্রথম হাসপাতালে আসেননি। বড়ো ছেলে রাফিক বিন সাঈদীর ইন্তেকালের পর তিনি প্যারোলে মুক্তি পেয়েছিলেন। জানাজা পড়িয়ে তিনি কারাগারেও চলে গিয়েছিলেন। আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বারডেমে এনে ভর্তি করা হয়। এরপরও একাধিকবার তাকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল নানা সময়ে, নানা প্রয়োজনে। পরিবারের সদস্যরা প্রতিবারই তাঁর কাছে যেতে পেরেছেন, কম বেশি খেদমত করতে পেরেছেন। আমি নিজেও তাঁর সাথে গিয়ে কথা বলেছি প্রতিবার।

কিন্তু এবার পিজিতে শুরু থেকেই খুব টাইট সিচুয়েশন ছিল। পরিবারকে পর্যন্ত তাঁর সাথে একটিবার দেখা ও কথা বলতে দেওয়া হয়নি। এটা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি। ভেতর থেকে আমরা ভালোমন্দ যে খবরই পাচ্ছিলাম সেগুলো ভেরিফাই করার কোনো সুযোগ আমাদের ছিল না। সোমবার বিকেলে যখন মাসুদ ভাই আর আমি একসাথে ছিলাম, তখনও ভালো খবর আসছিল। তবে সেগুলো অথেনটিক কিনা আমি জানি না।

মাগরিবের পর থেকেই পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে। তখন থেকেই বাতাসে নেতিবাচক খবরগুলো ভাসতে থাকে। আমি মাসুদ ভাইয়ের সাথেই ছিলাম সবসময়। ওনার কাছে একটা খবর আসে যে, সাঈদী সাহেবের আবারও হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। কিন্তু এই তথ্যটাও ভেরিফাই করা যাচ্ছিলো না।

আমার জীবনে সাঈদী সাহেবই প্রথম দায়িত্বশীল ব্যক্তি নন– প্রিজন সেলে যার মৃত্যুর ঘটনা আমি সরাসরি দেখেছি। এর আগেও আমি ফিল্ডে থেকে একাধিক দায়িত্বশীলের হাসপাতালে ইন্তেকালের ঘটনার আমি সাক্ষী। হয়তো সেই অভিজ্ঞতার কারণেই এবারের পরিস্থিতি আমার কাছে ভালো মনে হয়নি।

তবে পরিবারকে তা জানাতে সাহস পাচ্ছিলাম না। এরই মধ্যে কারারক্ষীর সংখ্যা ভবনের বাইরে বৃদ্ধি করা হয়। ভবনের প্রবেশ পথ বন্ধ করা হয়নি তখনো। তবে বাইরে ব্যাপক কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। আরেকটি কথাও বলা দরকার। এবার প্রথম থেকেই প্রশাসনের লোকদের আনাগোনা বেশি ছিল। অন্য যতবার হুজুর

হাসপাতালে এসেছেন, তখনও কড়াকড়ি ছিল। তবে তার একটি ধরন ছিল। হয়তো পরিবারের বাইরের লোকজন তাঁর কাছাকাছি যেন যেতে না পারে সেই কড়াকড়ি।

তবে এবার বিভিন্ন ফোর্সের সিনিয়র কর্মকর্তারা নিয়মিত তদারক করেছেন। যাই হোক, আবার সেই রাতের বর্ণনায় ফিরে আসি। আমরা মাসুদ ভাইসহ একবার এদিক আবার ওদিক ছুটে যাচ্ছিলাম। নানা জায়গায় ফোন দেওয়া হচ্ছিল। নানা জায়গার তৎপরতা বৃদ্ধির জন্যেও আমরা চেষ্টা করছিলাম। কারণ আমরা হার্ট এ্যাটাকের খবর পাচ্ছি, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছি না। এরকম অসহায় আর কখনোই এতটা অনুভূত হয়নি। এর মধ্যেই এশার আজান পড়ে যায়।

হাসপাতালের ভবনের সামনে থেকে তখন মোটেও যেতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু কিছু করারও ছিল না। আবার জামায়াতও দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। পরে আমরা মাসুদ ভাই, নাসিম ভাইসহ সবাই মসজিদে চলে গেলাম। ফরজের পর আমি আর মাসুদ ভাই আগে বের হই। আমরা ফরজ পড়েই বের হয়ে যাই। মাসুদ ভাইকে তখন ভেতরে যাওয়ার জন্য বলা হয়। তিনি জানান, ছোট ভাই নাসিম ছাড়া তিনি যাবেন না। নাসিম ভাই তখনও মসজিদে। মসজিদের ভেতর লোক পাঠিয়ে নাসিম ভাইকে ডেকে নিয়ে আসা হয়। এরপর ওনারা দুই ভাই ভেতরে যান।

আমার সাংবাদিক সহকর্মীরা নামাজের আগেই ইন্তেকালের খবরটি জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি পরিবারকে জানানো ঠিক মনে করিনি। কারণ, পরিবারেরই আগে জানা উচিত, এবং তাদের দিক থেকেই মিডিয়াকে বিষয়টি জানানো আমি ঠিক মনে করেছিলাম। মাসুদ ভাইরা ভেতর থেকে আসছিলেন না। ফলে আমরাও খবরটি প্রচার করতে পারছিলাম না।

এরই মধ্যে যমুনা টিভিসহ একাধিক টিভি ও নিউজ পোর্টাল আল্লামার ইন্তেকালের খবর প্রচার শুরু করে। ফেসবুকেও আমাদের ভাইয়েরা তা শেয়ার করে। অনেকেই আমাকে ফোন দিচ্ছিলেন। কিন্তু আমি চুপ ছিলাম। কারণ পরিবারের আগে আমি এই নিউজটি লিক করতে চাইনি। একটি সময় মাসুদ ভাই নিউজের সত্যতা নিশ্চিত করলেন। হাসপাতালের ভেতর থেকেই তিনি স্ট্যাটাস দিলেন। তখন আমরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটা শেয়ার করলাম। অর্থাৎ পরিবারের লোকেরা মিডিয়া নিউজের পরে সংবাদটি প্রচার করেছে।

ইন্তেকালের সময় নিয়েও আমার সংশয় আছে। কারণ সময় বলা হচ্ছে ৮টা ৪০মিনিট। আমাদের এশা পড়ে বের হতে এমনই সময় লেগেছে। পৌনে ৯ টার সময় পরিবারকে ভেতরে নেয়া হলেও তাদের খোঁজাখুঁজি চলছিল আগে থেকেই। আর মিডিয়াই বা পরিবারকে জানানোর এত আগে কীভাবে জেনে গেলো-তাও আমার কাছে রহস্য।

এই আলাপ আর বেশি না এগিয়ে অন্য আলাপ তুলতে চাই। চিকিৎসা নিয়ে এবার অনেক আলোচনা চলমান। আমাদের সংগঠনের ডাক্তাররা প্রথম থেকেই তাদের অবজারভেশন দিয়েছেন। চিকিৎসায় অসঙ্গতি নিয়েও তারা জানিয়েছেন। হয়তো কিছু অবহেলাও

হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, ইন্তেকালের খবর জানাজানি হওয়ারও অনেকটা সময় পর্যন্ত, আমার হিসেবে প্রায় ৪-৫ ঘণ্টা ভেতরে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনায় সাঈদী সাহেবের দুই ছেলে যেমন উপস্থিত ছিলেন, সাঈদী সাহেবের নাতিন জামাইসহ আরো কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন আবার জামায়াতের একাধিক নির্বাহী পরিষদ সদস্যসহ মহানগরী পর্যায়ের নেতারাও সেখানে ছিলেন।

এই আলোচনায় অনেকগুলো এজেন্ডা ছিল যার মধ্যে একটি ছিল পোস্ট মর্টেম প্রসঙ্গ। প্রশাসন পোস্ট মর্টেমে আগ্রহী ছিল। আর পরিবার স্বাভাবিকভাবেই লাশের কাঁটাকাঁটি না করার পক্ষে ছিল। এর আগে মাওলানা আব্দুস সুবহান সাহেব একইভাবে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও তারও পোস্ট মর্টেম হয়েছিল। তাই এবারও এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

তাছাড়া বিকেল থেকেই মাওলানার চিকিৎসা নিয়ে নানা ধরনের তথ্য ছড়িয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসা না করা বা ভুল চিকিৎসাসহ নানা অভিযোগ। প্রশাসন এই অভিযোগগুলোর সত্যতা যাচাই করার অজুহাতেও পোস্ট মর্টেম করতে বলেছিল। পরিবার আর ঐ ঝামেলায় যেতে চায়নি। তারা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে বলেই বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। পরিবার ও সংগঠনের দায়িত্বশীলরা উর্ধ্বতন মহলের সাথে বারবার কথা বলে এই পোস্ট মর্টেম বন্ধ করেছেন।

তাই আমার নিজের মধ্যেই অনেক ধরনের সংশয় ও প্রশ্ন থাকার পরও আমি এই প্রসঙ্গে আর আলাপ করতে আগ্রহী নই। তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় হেফাজতে থাকা অবস্থায় যখন কারো মৃত্যু হয়, তা নিয়ে কথা বলার সুযোগ ও প্রেক্ষাপট সবসময়ই থেকে যায়। নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে এগুলোর সুরাহা হবে।

আমরা আমাদের সময়ের সবচেয়ে লোকনন্দিত আলেমে দ্বীনকে হারালাম। মাওলানা আমাদের আল্লামা। বাংলাদেশে একজনই ছিলেন। আমরা কুরআনের শ্রেষ্ঠ একজন দাঈকে হারিয়ে ফেললাম। অনেকের মাঝেই তাকে খোঁজা যেতে পারে, তবে আল্লামা সাঈদীর মতো কাউকে আবার পাওয়া, অন্তত এই বস্তুবাদের উত্থানের সময়ে আমার কাছে কঠিনই মনে হয়। আল্লাহ তাআলা ১৩ বছরের

অসহনীয় কারাবাস ও নির্যাতন থেকে আল্লামাকে মুক্তি দিয়েছেন। এটাই আল্লাহর ফায়সালা। আল্লাহ তাআলা আল্লামা সাঈদীকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

আমার দেখা একজন আল্লামা সাঈদী

ওজন আর জনপ্রিয়তা দুটো ভিন্ন বিষয়। আমরা আল্লামার জনপ্রিয়তায় ফোকাস করেছি, ওজনে নয়। তিনি কোন হাইটের মানুষ ছিলেন, আমরা অনেকেই তা পরিমাপই করতে পারিনি। এমনকী, তাঁর জনপ্রিয়তার ধরণটাও পুরোপুরি জাজ করা সম্ভব হয়নি। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই শাহাদাতের ষোল আনা ফজিলত আমরা হাসিল করতে পারিনি। আল্লামা আমাদের জন্য অনেক বড়ো নেয়ামত ছিলেন। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর মতো দ্বিতীয় কাউকে আমরা পাইনি, আগামীতেও পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তাঁর ঢাকায় আসা, অবস্থান, চিকিৎসা বা শেষ কার্যক্রমগুলো আরো অনেক বেশি পরিকল্পিত হতে পারতো। এটাও ঠিক যে, পরিস্থিতি হুটহাট পাল্টালে তাৎক্ষণিকভাবে অনেক কিছুই করতে হয়। সবকিছু একদম প্রত্যাশা অনুযায়ীও করা যায় না। তারপরও আমি বলবো যে, আমাদের জায়গা থেকে প্রস্তুতিটা সঠিকভাবে নিয়ে রাখটা জরুরি ছিল।

আল্লামাসহ সকল শহীদ দায়িত্বশীলদের আমরা অনেকটা সময় কারারুদ্ধ অবস্থায় পেয়েছিলাম। আল্লামাকে পেলাম ১৩ বছরের বেশি। যারা কারা অন্তরালে এতটা সময় পড়ে থাকলেন, তাদের নিয়ে বাইরে আমরা যারা আছি, তাদের প্রস্তুতি ও কার্যক্রম আসলে কেমন ছিল–সেই প্রশ্ন নিজেদেরকেই করা প্রয়োজন।

আল্লামার কথাই বলি। তাঁর সন্তানেরা প্রতিবার সাক্ষাত শেষে যে বর্ণনা লিখছিলেন, তাতে একথা স্পষ্ট হচ্ছিল যে, তিনি শারীরিকভাবে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। তিনি গত কয়েক বছর ধরেই কারারক্ষীদের কাঁধে ভর দিয়ে তাদের সাথে দেখা করতে আসতেন। এমনকী, সেলের ভেতরে স্বাভাবিক হাটাঁচলাও তিনি একা একা করতে পারতেন না। তাঁর বয়সও হয়েছিল ৮৪ বছর। তার হার্টে ৫টি রিং বসানো ছিল। প্রায় ৫০ বছর ধরে তিনি ডায়বেটিক রোগী। এই আপডেটগুলো তো আমাদের কাছে ছিলাই। কিন্তু তারপর ভালোমন্দ যেকোনো পরিস্থিতির জন্য আমরা কতদূর পর্যন্ত ভেবেছিলাম?

আমি যদি অত্যুক্তি নাও করি, তারপরও বলি, আল্লামার জন্য দেশে ও বিদেশ থেকে যতটুকু প্রতিক্রিয়া এসেছে, তার অনেকখানিই একদম ন্যাচারাল। একটু তৎপরতা ও সমন্বয় থাকলে এর থেকে আরো বহুগুণে প্রতিক্রিয়া আনা সম্ভব ছিল। আমরা আমাদের এই দায়িত্বশীলদের মধ্যে এমনও ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছি, যাদের জানাজায় হিসেবের বাইরের অনেকেই আসতে পারতেন, রাষ্ট্রদূতেরা আসতে পারতেন, এমনকী অন্য কোনো দেশের ক্ষমতাসীন নেতা বা এমপিকেও নিয়ে আসা সম্ভব ছিল। অন্তত তাদের প্রতিক্রিয়া তো নিয়ে আসা যেতোই। সেই ধরনের মানসম্পন্ন, পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য দায়িত্বশীল আমাদের ছিল। কিন্তু আমরা সেভাবে আয়োজন করতে পারিনি। এই না পারার সাথে প্রতিকূল পরিস্থিতির যেমনটা দায় আছে, আবার আমাদের অক্ষমতার দায়ও একদম কম নয়।

কেন আমরা আমাদের আল্লামাসহ সাবেক দায়িত্বশীলদের শিকড়ের গভীরতা ও অন্তর্নিহিত শক্তিটি অনুধাবন করতে পারলাম না? আমার কাছে এর নেপথ্যে দুটো বাস্তবতা খুব বড়ো করে মনে হয়।

প্রথমটা হলো, আমরা নিজেরা এখনো ঐ মানে যেতে পারিনি। তাই তারা কতটা উচ্চমানের বা কোন হাইটের- অনেকক্ষেত্রে তা অনুমান করাই আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়। এর পাশাপাশি, নিজেদের নিয়ে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও কৃতিত্ব নেওয়ার মেন্টালিটি তো আছেই। আগামীতেও দেখা যাবে, আল্লামাকে নিয়ে টুকটাক যে কাজ হবে, সেখানেও সমন্বয়হীনতা থাকবে। নানা কাজে অনেক অপ্রত্যাশিত লোকের অবদান সামনে আসবে। অথচ তারা যে আল্লামার জীবনে এই ভূমিকায় ছিলেন, আমরা অনেকেই হয়তো তা ধারণাও করতে পারিনি।

দ্বিতীয় কারণ হলো, কারারুদ্ধ দায়িত্বশীলদের হাইটটা তুলে ধরার জন্য তাদের নিয়ে আলোচনা জারি রাখাটা জরুরি ছিল–যা আমরা করতে পারিনি। একথা মানতেই হবে, শেষের কয়েক বছর তার ছেলেরা ছাড়া পরিবারের বাইরে খুব কম মানুষই তাকে নিয়ে লিখেছেন কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা করেছেন। নানা আলোচনায় বা আড্ডায় হয়তো তার প্রসঙ্গ এসেছে, তবে যেভাবে তাকে তুলে ধরা উচিত ছিল, নতুন প্রজন্মের কাছে যেভাবে তাদের অসাধারণ অবস্থানগুলো উপস্থাপন করা দরকার ছিল– তা হয়নি।

বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং নিত্য নৈমত্তিক ইস্যু আমাদের প্রভাবিত করবে, ব্যস্ত রাখবে– এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার মাঝেও অন্তত কিছু কিছু সময় এই মজলুম মানুষগুলোকে নিয়ে ভাবলে, তাদের অসাধারণ সব অবদানগুলো স্মরণ করলে আমরাই লাভবান হতাম।

উদাহরণ হিসেবে বলি, আজ সকালে আল্লামার একটি ভাষণ শুনলাম। ২০০১ সালে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর পার্লামেন্টে দেওয়া তার প্রথম ভাষণ। অবাক হয়ে শুনলাম, কীভাবে

প্রথম ভাষণেই তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ সব মন্ত্রী ও এমপির সামনে ইসলামের অবস্থান তুলে ধরেছিলেন। কীভাবে তিনি দুর্নীতি, আমানতের খেয়ানত, সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। আফসোস! যদি তাঁর কথাগুলো গুরুত্ব সহকারে শোনা হতো। তাহলে বাংলাদেশের বাস্তবতা হয়তো আজ ভিন্ন রকম হতো।

এমনকী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তিনি জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস নয় বরং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ- তাও বলার সাহস দেখিয়েছিলেন। তিনি ময়দানের হাইপ তোলা বক্তা ছিলেন না। জায়গা মতো গিয়ে সঠিক কথা বলার মতো সৎসাহসিকতা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। যারা বলেন, জামায়াত জোটে যাওয়ার পর সঠিক-ভাবে তৎকালীন সরকারকে সতর্ক করেছিল কিনা–তাদের উত্তর দেওয়ার জন্য এই ভাষণটি চমৎকার একটি নজির হিসেবে বিবেচ্য।

এরকম আরো হাজার হাজার অডিও, ভিডিও মেসেজ আছে আল্লামার। তিনি একমাত্র বাংলাদেশী যিনি কাবাঘরের ভেতর একাধিকবার প্রবেশ করেছিলেন। ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধে গঠিত আন্তর্জাতিক কাউন্সিলেরও তিনি সদস্য হয়েছিলেন। ৮০'র দশক থেকে তিনি সৌদি রাজপরিবারের রাজকীয় অতিথি হিসেবে হজ আদায় করেছেন। প্রতিবছর রামাদানের শেষ সময় তিনি হারামে অতিবাহিত করতেন। আগে যখন কাবাঘরের মাতাফে দাঁড়িয়ে ইমাম নামাজ পড়াতেন, আমি সেখানেও তাকে ইমাম সাহেবের পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে দেখেছি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সাথে বিশ্বের বড়ো বড়ো সব ব্যক্তিত্ব, আলেম, রাজনীতিবীদ, একাডেমিক স্কলারদের যোগাযোগ ছিল।

এই ধরনের মানুষের বিদায়কালীন প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের বহু আগে থেকেই কাজ করা উচিত ছিল। আমরা আমাদের আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ টিমটি হারিয়ে ফেলেছি। একজনের পর একজন গিয়েছেন। কোনো একটি প্রস্থান থেকে শিক্ষা নিয়ে পরের প্রস্থানগুলোর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখাটা আমাদের দায়িত্ব ছিল। অনেক হাইটের মানুষকে যদি আমাদের অক্ষমতার কারণে এ্যাভারেজ হাইটে বিদায় নিতে হয়–তার অল্পবিস্তর দায় আমাদের ওপর আসবেই।

আল্লামার অসাধারণ বাগ্মীতা

আল্লামার বক্তব্যের অনেকগুলো অনুসরণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে আমাকে বেশি টানতো, তাঁর উৎকৃষ্ট শব্দচয়ন। বাংলাদেশের আলেমদের ব্যাপারে এমন একটা ইমপ্রেশন প্রচলিত ছিল যে, তারা বাংলায় ততটা পারদর্শী নয়। কথার মধ্যে কেমন যেন একটা টান থাকে। নেটিভ বাংলা ভাষাভাষী বলে মনে হয় না। সাঈদী সাহেব সেক্ষেত্রে শুধু ব্যতিক্রম নয়, বরং অতি উচ্চ মানসম্পন্ন।

তাঁর ভাষা ছিল সহজ ছিল। ক্ল্যারিটি বা স্পষ্টতা তাঁর বক্তব্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। তিনি শব্দগুলো ভেঙে ভেঙে বলতেন। তাঁর ওয়াজ শুনেছে কিন্তু বুঝেনি, মাথার ওপর দিয়ে গেছে– এমন কেউ বলতে পারবে না। এত স্পষ্ট এবং এত প্রকাশ্য আলোচনা সহজে শোনা যায় না। এরকম বক্তাও পাওয়া খুবই কঠিন, যার বক্তব্য একইসাথে সমাজের আমজনতা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষিত পর্যন্ত সব শ্রেণিকে বিমোহিত করছে।

তাঁর বক্তব্যে কুরআন ও হাদিসের রেফারেন্স তো থাকতোই, পাশাপাশি অনেক উদ্ধৃতিও থাকতো। আল্লামা ইকবালের অসংখ্য মন্তব্য ও কোটেশন ছিল তাঁর নখদর্পণে। পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক আয়াত ও কোটেশন বর্ণনা করার এই যোগ্যতা সবার থাকে না। তার আরেকটি যোগ্যতা ছিল, তিনি চোখ কান বন্ধ রেখে ঘুরতেন না। নিয়মিত পেপার পড়তেন। প্রচুর পরিমাণে বই পড়তেন। ফলে, সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল পরিষ্কার।

রাজনীতিতে সম্পৃক্ত থাকায় তিনি মানুষের পালস বুঝতে পারতেন। তাঁর আলোচনাগুলো তাই একঘেয়ে অনুভূত হতো না। দেশ ও জাতির বড়ো সংকট কিংবা ভবিষ্যতের আশঙ্কাগুলো তিনি ধারণা করতে পারতেন। তাঁর ওয়াজ শুনলে তাই মানুষ ঈমানের শক্তিতে যেমন বলিয়ান হতো, তেমনি জাগতিক জীবনেও নিজের করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা লাভ করতো।

তাঁর বক্তব্যে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাব ছিল না। বরং ইসলামের সাথে মিলিয়ে বিজ্ঞানের ফজিলতগুলো তিনি যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা শ্রোতাদের মুগ্ধ করতো। পূর্ববর্তী অভিশপ্ত জাতিগুলোর করুণ পরিণতি, জালিমের শাস্তি, শাহাদাত, ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা এগুলো তাঁর ওয়াজের কমন ইস্যু ছিল। এই সার্বজনীন বিষয়গুলো তাঁর ওয়াজকে দীর্ঘস্থায়ী ও সময়োপোযোগী রূপ পেতে সাহায্য করেছে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, কথার পরিমিতিবোধ। দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশি সময় তিনি ওয়াজ করেছেন। কিন্তু শ্রোতা ধরে রাখার জন্য অযাচিত কথা বলেছেন, চটুল কথা বলেছেন, ভুল রেফারেন্স দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। নিজেকে বড়ো করে উপস্থাপনের চেয়ে নিজেকে নগণ্য বলে উপস্থাপনেই তিনি বেশি অভ্যস্ত ছিলেন। বহু আলোচনায় বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি তাকে অল্প বিশেষণে

বিশেষায়িত করার অনুরোধ করেছেন। অথচ, তিনি যে উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন, সেই জায়গায় যাওয়া সবার জন্য সম্ভবই নয়।

যেটুকু বললে হয়ে যায় ততটুকুতেই থেমে যাওয়া একটি বিরাট যোগ্যতা– যা সবার থাকে না। আল্লামা সাঈদীর এই যোগ্যতাটি ছিল। যারা বক্তা আছেন– তারা হুজুরের এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে পারেন।

বাণিজ্যিক মানসিকতাবিমুখ একজন মুফাসসির

একদিনে তিন স্থানে তিন মাহফিলের যে প্রভাব– সেই তুলনায় কোনো একটি স্থানে তিন দিন বা ৫ দিন ব্যাপী মাহফিল করলে তার ইতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। একদিনে একাধিক মাহফিলে সংশ্লিষ্ট বক্তার ব্যক্তিগত লাভ হলেও নির্দিষ্ট কোনো জনপদে এর প্রভাব ততটা টেকসই হয় না। এটি দুঃখজনক বাস্তবতা যে, আল্লামার পর ধারাবাহিক বা দিনব্যাপী এই মাহফিলের চর্চাটা অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেছে।

আল্লামা যেভাবে কোনো একটি স্থানে টানা তিনদিন বা ৫ দিন মাহফিল করেছেন, তাতে অন্তত এটুকু সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে আল্লামা কমার্শিয়াল মানসিকতার বক্তা ছিলেন না। তিনি নিছক টাকার জন্য ওয়াজ করতেন না। বরং তিনি তাফসীরুল কুরআন মাহফিলকে দ্বীন কায়েমের একটি মিশন হিসেবে দেখেছিলেন। এই মাহফিলগুলোকে তিনি এক ধরনের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম হিসেবেও বিবেচনা করতেন। তাঁর এই মাহফিলগুলো করা এবং মাহফিলে কথা বলার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের জন্য মানসিকভাবে এবং চিন্তার জায়গা থেকে প্রস্তুত করে তোলা।

একটি ভিডিও দেখলাম। হিন্দু কয়েকজন ব্যক্তি তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আগে থেকেই এভিডেভিড করে রেখেছিলেন। তাদের ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে সেদিনের মতো মাহফিলের কার্যক্রমও শেষ হয়। বিদায় বেলায় তিনি বলছিলেন, "আগামীকাল আরো বেশি লোকজন নিয়ে আসবেন। বিশেষ করে আপনাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, লেখক থেকে শুরু করে আপনাদের পিতা-মাতা, বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বী, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে আসবেন। কারণ আগামীকাল আমি কুরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো নিয়ে কিছু আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। কুরআন যে কতটা বিজ্ঞানময় তাও আগামীকালের আলোচনায় তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ।"

এবার বিষয়টি চিন্তা করুন। একজন বক্তা টানা ২ ঘণ্টা কথা বলার পরে কীভাবে পরের দিন সমাজের আরেকটা ক্লাসকে টার্গেট করে তাঁর বক্তব্য রেডি করেন। কারণ তিনি জানতেন, একটা সমাজে বিভিন্ন ধরনের লোকজন থাকে এবং তাদের ভাবনা ও আলোচনা ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়। যারা তুলনামূলক কম শিক্ষিত তাদের আড্ডার বিষয় আর যারা একটু বেশি শিক্ষিত তাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচল সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। ফলে মাহফিলের একেকদিন তিনি একেক শ্রেণিকে কেন্দ্র করে তাদের উপযোগী বিষয় নিয়েই আলোচনা করতেন।

মানুষ এখন আল্লামার প্রতি যেভাবে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে তা মূলত এক ধরনের প্রতিদান ফিরিয়ে দেওয়ার মতো। কারণ আল্লামা দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর মানুষকে নিয়ে চিন্তা করে, মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনায় নিয়ে, মানুষের চিন্তা কাঠামো, মানসিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানুষকে শুধু দিয়েই গেছেন। তাঁর নেওয়ার পরিমাণ তাঁর দেওয়ার পরিমাণের তুলনায় অতি নগণ্য বলেই মানুষ এখন তাঁর প্রাপ্য প্রতিদানগুলো পরিশোধ করে দিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আমি ঢাকায় তার তিন দিনব্যাপী মাহফিল অনেকবার শুনেছি। ৫ দিনব্যাপী মাহফিলেও আমার বহুবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। দেখা যেত তিনি সুরা ফাতেহা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন আর প্রতিদিন দুই ঘণ্টা সময় আলোচনা করার পরও একদম শেষ দিনে গিয়েও তিনি "ইহদিনাস সিরাতল মুস্তাকিম" পর্যন্ত যেতে পেরেছেন। মাশাআল্লাহ তাঁর আলোচনার গভীরতা এতটাই বেশি ছিল। একটি আয়াত নিয়েই তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাফসীর করতে পারতেন। আর অবধারিতভাবেই তাঁর যেকোনো আলোচনাই শেষ পর্যন্ত আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার প্রসঙ্গ দিয়েই শেষ হতো।

কমার্শিয়াল মানসিকতা থেকে বের হয়ে আমাদের আবার আল্লামার মতো বেশি সময় নিয়ে জনপদকেন্দ্রীক দ্বীনের দাওয়াতি কাজ করা প্রয়োজন। সামাজিক ব্যাধির তীব্রতা ও ব্যাপকতা যেহেতু অনেকটা বেড়েছে তাই এর মোকাবেলা করতে গেলে এন্টিবায়োটিক মেডিসিনের মতো তাৎক্ষণিক প্রতিকার দিলেই কাজ হবে না। বরং সমাজের সংস্কার করতে হবে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও বাড়াতে হবে। তা না হলে সমাজের ভাঙন এবং ইসলামবিরোধী অনাচার বন্ধ করা যাবে না।

নারীদের কথাও ভাবতেন যিনি

আল্লামা সাঈদীর আরেকটি অনবদ্য অর্জন হলো, এদেশের ইসলাম প্রিয় নারীরা তাকে অনেক বেশি সম্মান করতেন, পছন্দ করতেন। গত কয়েকদিন ধরে অনেকে অনেক কিছু লিখলেও এই বিষয়টি তেমন একটা সামনে আসেনি। অথচ বাস্তবতা হলো, অনেক বাসায় এখনো শোকাবহ পরিবেশ বিরাজ করছে কারণ বাসার মহিলারা আল্লামার শোকে কাতর হয়ে আছেন।

এমনকী এমনও অনেকের সাথে আমার কথা হয়েছে, যাদের বাসায় প্রথম দু'দিন ভালোমতো রান্নাও হয়নি। বাসার মা খালারা মন খারাপ করে বসে আছেন। আমি এমন অনেক পরিবারকে চিনি, যেখানে ছেলে হয়তো কমিউনিস্ট, বা ছাত্রলীগ করে বা অন্য কোনো মতাদর্শে বিশ্বাস করে, অথচ তার মা মাওলানা সাঈদীর ভক্ত।

আল্লামার ওয়াজ শুনে এদেশের বহুনারী নামাজ শিখেছেন, পর্দার গুরুত্ব বুঝেছেন, পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন আল্লামা মুসলিম নারীদের মাঝেও এতটা গ্রহণযোগ্য হতে পেরেছিলেন? অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। তবে আমার কাছে মোটাদাগে তিনটি কারণ মনে হয়।

প্রথমত আল্লামা সাঈদী নারীদের প্রতি খুবই সম্মান রেখে কথা বলতেন। তার তাফসীর আলোচনায় কিংবা সীরাতের আলোচনায় নারীরা ইতিবাচকভাবে উপস্থাপিত হতো যা অনেক নারীকেই উজ্জীবিত করেছে, ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। অনেক সময় দেখা যায়, বেশ অনেক বক্তাই আছেন যারা ধর্মীয় আলোচনায় নারীদের নিয়ে হালকা কথা বলে বসেন। সাঈদী সাহেব এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন। তার ওয়াজ শুনে নারীরা বরং নিজেদের মর্যাদাসম্পন্ন ভাবতে পারতেন। ফলে, সাঈদী সাহেবকে তারা নিজেদের জন্য নিরাপদ ভেবেছেন।

দ্বিতীয়ত, হুজুরের আলোচনার একটি সামাজিক ব্যপ্তি। যখন ক্যাসেট যুগ ছিল, বহু নারী ক্যাসেটে ওয়াজ শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন। সাংসারিক কাজের সময়েও ওয়াজ শুনছেন– এরকম চিত্র অনেক বাসায়ই দেখা যেতো। সাঈদী সাহেবের ওয়াজ এ কারণে কর্মস্থলে, যাতায়াতের বাসে যেমন শোনা যেতো তেমনি বাসার রান্নাঘরেও এই সব আলোচনার অবাধ একসেস ছিল।

তৃতীয়ত যে বিষয়টিই বলতেই হয় তাহলো, আল্লামার মাহফিলগুলোতে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। সন্ধ্যায় মূল ওয়াজে নারীদের জন্য আলাদা বসার জায়গাতো ছিলই, এর পাশাপাশি আরেকটি ইউনিক ব্যাপারও ছিল। আল্লামার কয়েকদিন ব্যাপী ওয়াজ মাহফিলের শেষ দিন সকালে আবার নারীদের জন্য আলাদা মাহফিলের আয়োজন করা হতো। শুধুমাত্র নারীরাই তাতে অংশ নিতেন। এই মাহফিলে আল্লামা তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন, নারীদের মনন ও মানসিকতা অনুযায়ী বিভিন্ন টপিকের ওপর আলোচনা করতেন।

এই সিলসিলা আমি আল্লামার পর আর কাউকে ধরে রাখতে দেখিনি। সাঈদী সাহেবের মাহফিল ছিল রীতিমতো একটা উৎসবের মতো। মাহফিলের মূল মাঠের চারপাশে স্টলের ব্যবস্থা থাকতো। বোরকার দোকান, বইয়ের দোকান, ক্যাসেট বা সুভেনিরসহ অনেক কিছুই সেখানে পাওয়া যেতো।

নারীরা দীর্ঘদিন সাঈদী সাহেবের ওয়াজ শুনতে পারেনি– এই বাস্তবতাটিকেই সাম্প্রতিক সময়ে ঘরের ভেতরে তৈরি হওয়া অনেক সমস্যার নেপথ্য কারণ বলেই আমার মনে হয়। মাহফিল ভিত্তিক নারী প্রশিক্ষণের বিষয়ে আল্লামার পর সেভাবে কাউকে ভাবতেও দেখিনি। শুধু পরিস্থিতিই এজন্য দায়ী তা কিন্তু নয়। দাঈসুলভ মানসিকতা এবং নারীদের গুরুত্ব বোঝার ক্ষেত্রেও আমাদের কমতি রয়ে গেছে।

সাহসী এক দাঈ

ঢাকা শহরে যারা ৯০ এর দশকে ছিলেন তাদের অনেকেরই হয়তো পান্থপথের তাফসীর মাহফিলে গোলাগুলির ঘটনা মনে আছে। পান্থপথের আমি এই মাহফিলে উপস্থিত ছিলাম। বেশ ছোট তখন। অনেক কিছু বুঝতামও না। তবে গোলাগুলির ঘটনা এখনো মনে আছে। আল্লামা সাঈদীর জীবনের আরেকটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মাঝেই তিনি দাওয়াতি কাজ করেছেন। কুরআনের আলোচনাকে তিনি বিপ্লব মনে করেছেন, আন্দোলন মনে করেছেন, নিছক ধর্মীয় আয়োজন মনে করেননি, তাই বাতিলেরা তাকে হুমকি ভেবে গেছে আজীবন।

তাঁর মাহফিলে যে পরিমাণ গোলাগুলি হয়েছে, তাকে হত্যার যে পরিমাণ চেষ্টা হয়েছে, তাঁর মাহফিলের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে তা আর কারো ক্ষেত্রে হয়নি। আরো বড়ো ব্যাপার হলো, এই সব হুমকি ধামকি বা হামলায় তাকে কখনো ময়দান থেকে দূরে রাখা যায়নি। সাহসের একটি মডেল ছিলেন তিনি।

এই গুণাবলিগুলোই তাকে অন্য অনেক আলেম ওলামার থেকে পৃথক করে দেয়। তাঁর ওয়াজে বাড়তি কোনো কথা বা অতিরঞ্জন ছিল না। তাঁর উপার্জন বা হাদিয়া গ্রহণ নিয়ে কোনো বিতর্ক ছিল না। যেহেতু তিনি মাহফিলকে ইকামাতে দ্বীনের কাজ হিসেবেই দেখেছেন, তাই টাকা পয়সা তার কাছে মূল বিবেচ্য হয়ে ওঠেনি। তিনি কমার্শিয়াল চিন্তা লালন করতেন না। নিজের পপুলারিটিকে তিনি কখনোই সেল করতে চাননি। তাই তাঁর কাজগুলোর মালিকানা বা স্বত্ব নিয়েও তিনি উদার ছিলেন। অন্যরা তাকে নিয়ে ব্যবসা করার মানসিকতা রাখলেও তিনি সেই ফাঁদে পড়েননি।

আমাদের এই আলোচনাগুলোই বেশি করা দরকার। তাঁর গুণাবলিগুলো নিজেদের মাঝে সংক্রামিত হওয়া প্রয়োজন। যিনি যে ফিল্ডে আছেন, তার সাথে যে গুনটি মানানসই, আমরা যেন তা আত্মস্থ করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা বহুগুণে গুণান্বিত আমাদের আল্লামাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। আল্লামার গুণাবলি ও চেতনা সমৃদ্ধ আরো বেশি দাঈ এই জমিনে দান করুন। আল্লামার ভাষায় যদি বলি, "তাফসীরুল কুরআন মাহফিল সাধারণ কোনো আয়োজন নয়। এই মাহফিল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ঘোষণার এক আন্দোলন"। এরকম বোধসম্পন্ন ব্যক্তি আল্লাহ যেন বারবার দান করেন। আমিন।

লেখক: বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও অনুবাদক।

“বড়ো দাঈ ইলাল্লাহ” মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.)

এ. কে. মওদুদ হাসান

الحمد لله رب العالمين.
الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد،
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون.

“আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করো না” (সুরা বাকারা ২:১৫৪)

বাংলাদেশের এক বড়ো “দাঈ ইলাল্লাহ” আমাদের শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাই মুরব্বী মুহতারাম মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি গত ১৪ই আগস্ট ২০২৩ কারাগারের প্রিজন সেলে বন্দি অবস্থায় থেকে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁকে চিকিৎসার নামে হাসপাতালে এনে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু কুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি কারাগারের একজন বন্দি কয়েদি ঢাকার উন্নত হাসপাতালের বেডে ইন্তেকালকে নিয়ে অনেক কথা এখনো লুকিয়ে আছে বলে জনগণ মনে করে। জালেমের কারাগারে মৃত সাঈদী (রহ.) শাহাদাতের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে আজ কবরে শায়িত আছেন। আল্লাহ তাআলা তঁাকে নাবীয়য়ীন, সালেহীন, সিদ্দিকীন ও শোহাদাদের সাথে হাশর করুন। মাওলানা সাঈদী (রহ.) ছিলেন একজন বড়ো “দাঈ ইলাল্লাহ” একজন আলেমে দ্বীন, মুফাসসিরে কোরআন, একজন অসাধারণ বাগ্মী, একজন সুবক্তা ইসলামের সাহসী কণ্ঠস্বর।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, নাস্তিকতাবাদী তথা ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে উচ্চ কণ্ঠস্বর, ইসলামী আদর্শ ও আন্দোলনের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহস করে কথা বলার ক্ষেত্রে বেপরোয়া। এজন্যই তিনি হয়ে ছিলেন তাদের প্রাইম টার্গেট। অপপ্রচার, মিথ্যা, বানোয়াট ও বিচারের নামে অবিচার এবং প্রতিপক্ষের অপকৌশলের ভিক্টিম তিনি। মুক্ত সাঈদী না জানি কোন মুহূর্তে ইসলামী বিপ্লব ঘটিয়ে দেন। তাঁর ক্যাপাসিটিকে হয়ত তারা এভাবেই পরিমাপ করতো। তাঁর মাহফিলে লক্ষ লক্ষ জনতার উপস্থিতি, তাও আবার কয়েক দশক যাবৎ এ যেন ছিল তাদের ঈর্ষার মূল কারণ। রাজনীতিতে তিনি এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভালো ভোট হলে আবারো এমপি হয়ে যাবেন। পার্লামেন্টে চলে আসবেন। এ ভয় তাদের হয়ত করতে হয়েছে।

মোহতারাম সাঈদী ধৈর্য আর সবর অবলম্বনে কামিয়াব। আল্লাহ তাআলা সবর অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন। দীর্ঘ ১৩ বছরের কারাদণ্ড হাসি মুখে তিনি সহ্য করেছেন। তাঁর আদর্শ ও সত্য পথকে জীবিত রেখে গেছেন। মাথা নত বা আপোষ করেননি মিথ্যা ও বাতিলের কাছে। এক্ষেত্রে তিনি শতভাগ কামিয়াব। ফলে তিনি হয়ে উঠেন আরো জনপ্রিয় ও সম্মানের পাত্র। পেয়ে যান শাহাদতের মর্যাদা। ঢাকার মাটিতে তাঁর জানাজা হওয়াটা প্রাপ্য থাকা সত্ত্বেও তা হতে না দেওয়া জালেমের যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

তিনি ছিলেন একজন ইসলামী রাজনীতিবিদ, সমাজ কর্মী, সমাজ সংস্কারক, ইসলামী শিক্ষাবিদ, ওয়ায়েজ, বক্তা, পার্লামেন্টেরিয়ান, সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা । তিনি আরো অসংখ্য গুণে গুণান্বিত একজন “দাঈ ইলাল্লাহ”। হাদিস থেকে আমরা জানি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “শক্তিশালী মুমিন উত্তম ও প্রিয় আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে।”

আমরা শহীদ সাঈদী (রহ.) জীবনকে দেখলে বলতে হবে যে, তিনি একজন শক্তিশালী মুসলমান ছিলেন। তাঁর ঈমানের শক্তি, দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে তাঁর কথা বলার শক্তি, অত্যাচার নিপীড়ন-জেল জুলুমে ধৈর্য ক্ষমতার শক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। হাদিসের আলোকে তিনি আল্লাহর কাছে ভালো ও প্রিয়। মহান আল্লাহ তায়ালা মরহুম কে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।

“দাঈ ইলাল্লাহ” হিসেবে মাওলানা সাঈদীর যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কোরআন ও হাদিস তথা ইসলামের ইলম ও জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। অতঃপর তা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার সাধ্যমত আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন বাংলা ভাষা ভাষী সকল শ্রেণি মানুষের মাঝে। জাগিয়ে দিয়ে ছিলেন তৌহিদী জনতাকে ইসলামের চেতনায়। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বিপ্লবী

কণ্ঠস্বর। ইসলামী জাগরণী চেতনা সৃষ্টিতে এমন বক্তা ইতিহাসে কমই পাওয়া যায়। তাঁর ভাষা ছিল সুমধুর। আকর্ষণীয় এবং জাগরণীয়। শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার ক্ষেত্রে। যারাই সাঈদীর মাহফিলে অংশগ্রহণ করেছেন, ভিডিও ক্যাসেট দেখেছেন, শুনেছেন তারাই প্রভাবিত হয়েছেন। ইসলামের প্রতি দরদ সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। পুরুষ-মহিলা, যুবক-যুবতী, দেশে-বিদেশে সর্বত্র তাঁর মধুময় ইসলামের বক্তব্য হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। যার কারণে তিনি মুসলমান সাধারণ জনগণের অন্তরে ছিলেন প্রিয় পাত্র। আমার মরহুম আম্মা, খালাম্মা গং ছিলেন সাঈদী সাহেবের ওয়াজ আর তাফসীর নিয়মিত শ্রোতা।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি। সারা জীবন শ্রোতাদের ইসলামের পথে চলার দিকে আহ্বান করেছেন। অন্যদিকে গুনাহের কাজ, অন্যায় আচরণ, আল্লাহ দ্রোহী কর্ম এবং পথ ছেড়ে দিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে চলে আসার জন্য তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান তিনি করেছেন। এমনকি রাষ্ট্রীয় যন্ত্রদেরকেও ইসলাম অনুসরণ করার আহ্বান অনবরত করেছেন। এতে তিনি একজন সত্যিকারের দাঈ ইলাল্লাহ আর মোজাহিদ হিসেবে কামিয়াব। ইসলামের প্রচারের টার্গেট থাকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র। এবং এর ভিতর যে জনসাধারণ, তারা যেন ইসলামের পুরোপুরি অনুশাসনে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ বিরোধী সকল মত ও পথ এবং কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়। তাওহিদের উল্টো পথে গিয়ে শিরকে যুক্ত না হয়। অন্যায়, অবিচার, পরাধীনতা, অন্যের গোলামী যেন মানুষের কাঁধে বসতে না পারে। স্বাধীনতা, সুস্থ বিবেক, চিন্তা-চেতনা, তাহজীব তামাদ্দুন ও উম্মার আসল পরিচিতি যেন ধ্বংসের দিকে ধাবিত না হয়। ইসলামী চরিত্র ও আদর্শ ক্রমে ক্রমে যেন বিলুপ্ত হয়ে না যায়।

"দা'য়ী ইলাল্লাহর" কাজ করতে গিয়ে, আল কোরআনের কথা বলতে গিয়ে, ইসলাম বিরোধীদের পক্ষ থেকে হিংসার শিকার হয়েছেন চরমভাবে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে যত ধরনের অপপ্রচার করা যায় এর কোন কমতি করেনি। পরবর্তীতে কৌশলে বিচারের নামে সাঈদীকে নির্যাতন-অত্যাচারের সুযোগ তারা গ্রহণ করেছে। দীর্ঘ ১৩ বছর থাকে কারাবন্দি করে রেখেছে বিচারের নামে মিথ্যা তাঁকে কলঙ্কিত করেছে এবং কারা পৃষ্ঠে বন্দি করে রেখেছে। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অন্যায় ও অবিচারের কাছে মাথা নত করেননি, আপোষ করেননি, ছিলেন সবর অবলম্বন কারী।

তিনি যার জন্য সংগ্রাম করেছেন সারা জীবন সেগুলো হচ্ছে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে এবং সুন্দর ভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা। আল্লাহর পাঠানো কিতাবের আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সাজানো, ইসলামী সভ্যতা পুনর্জীবিত করা। তাঁর জন্য সমস্ত চেষ্টা তিনি করে গেছেন। অনুধাবন করছেন নিপীড়িত জনতার কথা। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ। ঈমানী শক্তি নিয়ে বলিয়ান হওয়ার চেতনা এবং উপলব্ধি সৃষ্টি করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা। এটা বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য জরুরি বলেছেন। ভবিষ্যৎ অনুধাবন করেছেন এবং সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা, মান মর্যাদা সংরক্ষণ, ইসলামের জীবনী শক্তি রক্ষায়, শিক্ষাব্যবস্থা, ইসলামী আদর্শ টিকে থাকার। অন্যান্য সকল বাতিল এবং জাহিলিয়াতি চিন্তাধারা থেকে ফিরিয়ে এনে ইসলামী চিন্তা ধারা মানুষের মানসপটে ঢুকিয়ে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আর এ জন্যই বলতে হবে জালেমদের জুলুমের শিকার হয়েছেন এবং জীবনের শেষ ভাগ কারাগারে তাঁকে কাটাতে হয়েছে। এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মিথ্যার বেড়াজালে তিনি অবিচারের শিকার হয়েছেন।

তিনি প্রায় অর্ধশত বছর দেশে-বিদেশে তাঁর এই মহান চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম তিনি চালিয়ে গেছেন। আমাদের সংগঠনের দাওয়াতে তিনি বৃটেনে বহু দাওয়াতি সফর করেছেন। তেমনিভাবে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অসংখ্য বিদেশ সফর করেছেন। সবগুলো ছিল দাওয়াতি সফর। এই দাওয়াতি সফরের টার্গেট ছিল কোরআনের বাণী মানুষদেরকে পৌছিয়ে দেওয়া; নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহির আদর্শকে মানুষের সামনে তুলে ধরা। আমরা প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে, সেই কাজ তিনি করেছেন। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে তিনি কমপক্ষে ২০-২৫ বার সফর করেছেন। দাওয়াতি সফরে ইসলামী আন্দোলন, সংগঠনের সম্মেলন ও মাহফিল সমূহ অংশগ্রহণ করেছেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করছেন। লন্ডন শহর সহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে দাওয়াতি মাহফিল করেছেন, তাফসীর করেছেন, ওয়াজ করেছেন। এমনকি রাতের শেষ বেলায়, কর্মরত মুসল্লীয়ানদের জন্য এ সব করেছেন। বলা যায় যুক্তরাজ্যের আপামর বাংলাদেশী মুসলমান পরিচিত হয়েছিলেন তাঁর সাথে। এদেশের অনেক যুবক যুবতীরা বাংলা ভাষা বুঝতে তাদের অসুবিধা হয়। কিন্তু মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তার প্রোজ্জ্বল বাংলা ভাষা, বাচন ভঙ্গি, ইশারা-ইঙ্গিত, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন ছিল যা দিয়ে যুবকদের তিনি বুঝিয়ে দিতেন। যারাই তাঁর বক্তব্য শুনেছে তারাই আকৃষ্ট হয়েছে। দাঈদের বৈশিষ্ট্য সফর করা। তিনি ব্যাপকভাবে তা করেছেন। তিনি তাঁর মিশন এবং ভিশন পৌছিয়ে দেওয়া চেষ্টা করেছেন সাধ্যমত। এইজন্য বলা যায় লন্ডন ও বিভিন্ন জায়গায় আজকের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে ইসলামের অগ্রযাত্রায় বৃদ্ধি ও উন্নতিতে তাঁর কন্ট্রিবিউশন অস্বীকার করার মতো নয়। তাঁর কন্ট্রিবিউশন আমাদেরকে, স্থানীয় ইসলামের দাঈদের ও সংগঠনের বিরাট প্রেরণা যুগিয়েছে। আজকের আমাদের বাংলাদেশী মুসলিম কমুনিটিতে তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তিনি বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে দেশে-বিদেশে অমর হয়ে থাকবেন। সাঈদী (রহ.) কে ভুলে যাবে না বাংলাদেশী, বাংলা ভাষাভাষী ইসলাম প্রিয় জনতা। তাঁর বিয়োগের পর মৃত্যুর পর আলতাব আলী পার্কে ঐতিহাসিকভাবে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডন সহ বিভিন্ন শহরে শহীদ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবনী আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়, হচ্ছে ও হবে। তাঁর সংগ্রামী দাওয়াতি জীবন ইসলামী জাগরণী মানুষ চিরকাল স্মরণ করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে মাগফেরাত দান করুন। মানুষ হিসেবে যেসব ভুলত্রুটিগুলো করেছেন সেগুলোকে মাফ করে দেন। তাঁর নেক ও সংগ্রামী আমলের উত্তম পুরষ্কার দান করুন। শাহাদতের দারাজাত বুলন্দ করুন। তাঁর ভক্তদের যে যেখানেই আছেন, তাঁরই রেখে যাওয়া কাজকে অনুধাবন করে বাস্তবে রূপান্তরিত করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

যুগের শ্রেষ্ঠ দাঈ

ডা. মসিহুর রহমান

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশের একজন প্রতিথযশা আলেমে দ্বীন, মুফাসসিরে কোরআন, দ্বীনের দা'য়ী ছিলেন না, তাঁর সুখ্যাতি বিশ্বজুড়ে। তাঁর শহীদী মৃত্যুতে তিনি নিজেকে ভাস্বর করে তুলেছেন। নিঃসন্দেহে জীবিত দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মৃত সাঈদীর থেকে অনেক গুণে খ্যাতিমান হতে পেরেছেন। দ্বীনি মর্যাদার দিক থেকে তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর সঙ্গে তুলনীয় না হলেও, কারাবাস এবং কারাধীন অবস্থায় তাঁর জীবনাবসানকে তুলনীয় করা যেতেই পারে। গত শতাব্দীতে যুগশ্রেষ্ঠ মুফাসসিরে কোরআন "তাফসীরে ফি জিলালিল কুরআন" এর রচয়িতা শহীদ কুতুব ও মুহাম্মদ মুরসির কাতারে তাঁর অবস্থান।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একজন বাংলাদেশী হয়েও, বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর মূল্যবান সম্পদ ছিলেন। এই জামানার আরেক দা'য়ীয়ে হক ডাক্তার জাকির নায়েক আল্লামা সাঈদীকে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সম্পদ হিসাবে পরিগণিত করেছেন। তাঁর এই মূল্যায়ন একেবারেই যথোপযুক্ত।

আল্লামা সাঈদীকে বাংলাদেশের একশ্রেণির মানুষের দল চিনতে পারেনি। কেবলই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আল্লামাকে নির্যাতন করা হয়েছে। বিচারিক ত্রুটি রেখে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। এত বড়ো অবিচার বাংলাদেশের জনগণ কখনও প্রত্যাশা করেননি। **মুসলিম উম্মাহ যারপরনাই দুঃখিত, মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ।** কিন্তু যুগ-জামানার রাজনৈতিক ক্ষমতার বাগডোর যাদের হাতে থাকে, তারা স্বার্থান্ধ হয়েই সত্যানুসারীদের প্রতি সীমাহীন জুলুম করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা ফ্যাসিবাদের মধ্যেই অবস্থান করতে পছন্দ করে।

যদি বাংলাদেশ সরকার আল্লামাকে বাঁচার পথ করে দিতেন, এতেই ওই দেশেরই লাভ হত, কল্যাণ ছাড়া কিছুই হত না।

> "তিনি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। বলশালী জাতি গড়তে চেয়েছেন। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর অস্তিত্ব বাংলাদেশের জন্য কল্যাণ বয়েই আনতো, সেই সঙ্গে মুসলিম উম্মার জন্যও।"

আজকে বাংলাদেশে ইসলামবিরোধী শক্তি বেশ সক্রিয়। নাস্তিকতার প্রচার চলছে অবাধে; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং খোলা ময়দানে, শাহবাগ থেকে সর্বত্র তার বিচরণ। যুবক-যুবতীরা পাশ্চাত্যের গড্ডালিকা স্রোতে ধাবমান হচ্ছে। ভেতর থেকে নৈতিক চেতনা, মূল্যবোধ তাদের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে। দুর্নীতি গ্রাস করছে ওই দেশটিকে। হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতির ধারা নষ্ট করার প্রয়াস পূর্বেও ছিল, আজকেও অব্যাহত রয়েছে।

আল্লাহর বড় নেয়ামত হলেন এই ধরনের আলেমে দ্বীনেরা। কপাল পোড়া জাতি হলে এই ধরনের যুগশ্রেষ্ঠ দাঈদের হারাতে হয়। আল্লামা সাঈদীর প্রতি ভালোবাসা, অনুরাগ ও হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি পশ্চিমবাংলার মানুষেরা আগেও দেখিয়েছে এবং দেখিয়ে যাবে। তাঁর শহীদী মৃত্যুতে এপার বাংলার সব মুসলিমরা বেদনাহত। ভারতে থেকেও তারা গায়েবানা জানাজা নিশ্চুপে পড়েছেন, আবার কেউ কেউ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে পড়েছেন। তাঁর ওয়াজ এপার বাংলার ঘরে ঘরে লোকেরা শুনে থাকে। পুরুষ ও মহিলা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, যুবক-যুবতী সবাই। এমনকি ফেরিওয়ালারা মাইকে তাঁর ওয়াজ শোনাতে শোনাতে পাড়া গাঁয়ে ফেরি করে থাকেন। একি কম মূল্যবান কথা! আল্লাহ যার মর্যাদাকে বুলন্দ করেন এমনিভাবেই করে থাকেন।

এমতবস্থায় সাধারণ থেকে শিক্ষিত মুসালমদের মধ্যে হসলামের প্রতি আগ্রহ, দ্বীনি চেতনা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কোরআনের প্রতি আকর্ষণ, নবী করিম (সা.)-এর সিরাত ও জীবনাদর্শকে পাথেয় করে জাতীয় চরিত্র নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজন। দুর্বল চরিত্র দিয়ে দেশ গড়া যায় না। তেজোদ্দীপ্ত জাতি গড়া যায় না। ঠিক এই ক্ষেত্রে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মুসলিম জাতির চরিত্র নির্মাণে তৎপর ছিলেন। ইসলামের আলোকে বাংলাদেশের মানুষদের চরিত্র গঠনে তিনি আজীবন প্রয়াস চালিয়েছেন। "কোরআনের পাখি" হিসেবে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী কোরআনের দিকে ফিরে এসেছেন। তারা বাংলাদেশে থেকে ও প্রবাসী জীবনযাপন করে কুরআনের প্রতি আকর্ষিত হয়েছেন। কোরআনের সুরে সুর তুলেছেন। আল্লামা সাঈদীর সুরেলা কণ্ঠ, বাগ্মীতা, পাণ্ডিত্য ও সুনিপুণ প্রবচনে শিক্ষিত মানুষেরাও মুগ্ধ।

তিনি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। বলশালী জাতি গড়তে চেয়েছেন। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর অস্তিত্ব বাংলাদেশের জন্য কল্যাণ বয়েই আনতো, সেই সঙ্গে মুসলিম উম্মার জন্যও।

তাঁর রচিত বই-পুস্তকের থেকে তাঁর ওয়াজ আপামর জনসাধারণের কাছে অনেক বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছে ওপার বাংলায় ও এপার বাংলায়। আল্লাহ তাকে শহীদ ও সালেহীনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিন। জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন।

লেখক- সম্পাদক, সাপ্তাহিক 'মিজান' (পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকা)

এক কিংবদন্তির বিদায়ে শোকাবিভূত বাংলার এপার-ওপার

ইমরান হোসেন

এশার নামাজের পর 'কুরআনের পাখি', আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.)-র মৃত্যুর খবর এপার বাংলায় আছড়ে পড়েছিল। তরঙ্গের গতিতে বাঁধ ভাঙা আবেগে ভেসে যায় আল্লামা সাঈদীপ্রেমী জনতা। মসজিদের মিম্বর থেকে সামাজিক মাধ্যম সবখানেই এক গভীর ক্রন্দনের সুর। এত আবেগ অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দু আর করুণা, তিনি আল্লামা সাঈদী। সীমান্ত পেরিয়ে এপার বাংলাতেও তাঁর তাফসীরুল মাহফিলের দরাজ গলার তেলাওয়াতের সুর পৌঁছে যেত। অল্লামার জনপ্রিয়তা সেই ছোটবেলা থেকেই দেখেছি। ২০০১ সালের স্মৃতি। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় আব্বুকে কলকাতার চাঁদনী মার্কেট থেকে আল্লামার সাঈদীর অডিও রেকর্ডের ক্যাসেট কিনে এনে শুনতে দেখতাম। তখন অবশ্য ভিডিওর প্রচলন সহজলভ্য হয়নি। শুধুমাত্র আল্লামার কণ্ঠে বিষয় ভিত্তিক তাফসীরুল মাহফিল শুনেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের বুকেও রাতের মাহফিল এবং অসংখ্য ওয়েজিন থাকার পরও আল্লামা সাঈদী যেন অনন্য। তাঁর কুরআনের তাফসীর শুনতে কোন দল ও মতের বাধা নেই। সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে আল্লামা সাঈদীর মাহফিলে মশগুল থাকত সাধারণ জনগণ। এইভাবেই চলতে চলতে একদিন তাঁর কণ্ঠ রোধ করতে বন্দিশালায় পাঠানো হল। তারপর থেকে নতুন নতুন তাফসীরুল কুরআনের অডিও-ভিডিও ক্যাসেট আসা বন্ধ। এপার বাংলায় কিন্তু তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হল না। কুরআন-প্রেমীরা তাঁর দীর্ঘদিনের কুরআনের খেদমত ও মাহফিলের পুরানো রেকর্ড শুনতে থাকলো। প্রায়শই দেখেছি, মসজিদের বাইরে বা বাড়ির দেহলিজে বড়ো পর্দায় আল্লামা সাঈদীর মধুর কণ্ঠের তাফসিরুল কুরআন মাহফিল দেখার আয়োজন করা হত। আর সেখানে তাদের প্রিয় আল্লামাকে দেখতে মানুষ ভিড় করত। এইখানে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) কোন বিশেষ মসলক, মাজহাব ও সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমস্ত মতবিরোধ আর বেড়াজাল ছিন্ন করেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন জনতার আল্লামা, 'কুরআনের পাখি'।

তাঁর মৃত্যুতে সকল মসলকের অনুসারীদেরই বুক কেঁপে উঠেছিল। কেঁদে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের কুরআন-প্রেমী সাধারণ মুসলমান থেকে আলেমে-দ্বীন সকলেই। আল্লামা সাঈদীর মৃত্যুর পরই ভূ-ভারতের বিশিষ্ট আলেমে-দ্বীন এবং প্রখ্যাত স্কলার মাওলানা সালমান নাদভি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "শায়খ দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মুফাসসির ও বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন। মহান আল্লাহ আপন রহমতে তাঁকে আবৃত করে রাখুন। তাঁর তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে লাখ লাখ মুসলমান উপস্থিত হত। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান, ফিরদাউস দান করুন। আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং উত্তম অভিভাবক।" আল্লামার মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরেই ভূমিকম্পের ঘটনায় অল ইন্ডিয়া সুন্নাতুল জামায়াতের সম্পাদক মুফতি আব্দুল মতিন প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন, "আল্লামা সাঈদী (রহ.)-এর ইন্তেকালের সময় ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ঢাকা শহর। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা সহ ত্রিপুরাতেও ভূমিকম্প হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সময়কার এই ভূমিকম্প কী জালিম সরকারকে হুমকি দিচ্ছে?" পশ্চিমবঙ্গের ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা উজায়ের সিদ্দিকী মাওলানা সাঈদী (রহ.)- এঁর মৃত্যুতে আবেগঘন কলমে লিখেছেন, "কিছু মানুষের মধ্যে জীবনীশক্তি এতটাই বিশাল থাকে যে, সেই মানুষটার মৃত্যু বিশ্বাস করাটাই অনেকটা কঠিন হয়ে যায়। মানতে কষ্ট হয় যে, এই বিশাল মানুষটা আর নেই। আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন

সাঈদী সাহেবের ইন্তিকালে ঠিক আমার কাছে এমনই মনে হলো। সেই ছোট্টবেলা থেকেই দেখেছি, তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ইসলামের দিকে আহ্বান। বিশাল জনস্রোতের সামনে বসে সকলের জন্য উপযোগী করে কুরআনকে উপস্থাপন করার মতো ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর মুরুব্বিরা ছিলেন মুজাদ্দিদুয যামান আবু বাকর সিদ্দিকী (রহ.) এঁর ভক্ত ও অনুরক্ত। যদিও তাঁর চিন্তাভাবনা ভিন্ন ছিলো, কিন্তু তিনি মুজাদ্দিদুয যামান (রহ.) এঁর চিন্তাভাবনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর এই কুরআনের খেদমাত, ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান ও যালিমের এক যুগব্যাপী জুলমের পরেও তাঁর এই নিজের নীতির উপর অনড় থাকাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই নেক বান্দাকে কবুল করুন ও তাঁর ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করুন। এবং তাঁকে আখিরাতের সমস্ত মানযিলে শান্তি ও সম্মান দান করুন। রহিমাহুল্লাহ রহমাতান ওয়াসি'আহ।" মাওলানা মমতাজুল ইসলাম ক্রন্দনরত হয়ে বলেছেন, "আল্লামার মৃত্যুটা স্বাভাবিক হলে হয়তো এতটা কষ্ট পেতাম না। আমি ছোট থেকেই তাঁর সমস্ত বই পড়েছি। আমার মা ছোটবেলায় বারবার বলতেন, তোমাকে আল্লামার মত আলেম হতে হবে।" পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের প্রবীণ আলেমে দ্বীন ও ওয়েজিন মাওলানা সওকত আলি বলেছেন, "মাওলানা সাঈদী মানেই একজন 'কুরআনের ভাষ্যকর'। তাঁর বক্তব্য সাক্ষ্য দেয় তিনি একজন ময়াক্কিদ এবং তাওহীদের একনিষ্ঠ খাদেম।"

আল্লামার মৃত্যুতে এপারের হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানরাও গায়েবানা জানাজার দোয়ায় সামিল হয়েছে। কলকাতায়, হাওড়ার উলুবেড়িয়া, হুগলির জাঙ্গিপাড়ার পাঁচবেড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয় গায়েবানা জানাজা। গ্রাম বাংলার অসংখ্য মসজিদ থেকে আল্লামার জন্য দোয়ার সওগাত পাঠানো হয়। মুর্শিদাবাদে সামশেরগঞ্জের লোহরপুর ঈদগাহ ময়দানে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.)-র গায়েবানা জানাজায় হাজার হাজার কুরআন-প্রেমীর ঢল নামে। দু-হাত তুলে দোয়ার মাধ্যমে এপার বাংলা থেকেও বাংলাদেশের পিরোজপুরে শায়িত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) এর জন্য আল্লাহর দরবারে অশ্রুপাত করেন মানুষ। তাঁদের আর্তনাতে ছিল দীর্ঘ স্মৃতি বিজড়িত আল্লামার জন্য প্রেম আর শ্রদ্ধা যা তারা দীর্ঘদিন বুকের মধ্যে লালন করে চলেছে।

তিনি ছিলেন কিংবদন্তি, বিশ্ব মুসলিমের কাছে এক অমূল্য সম্পদ স্বরূপ। বিশ্বনন্দিত মুফাসসিরে কুরআন। তিনি ছিলেন রাহাবার তথা পথপ্রদর্শক। তিনি ছিলেন মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধকারী তথা মুযাক্কী। 'খায়রা উম্মাহ' তথা ইসলামী আদর্শের অনুসারী বিশ্ব মুসলিম সমাজের এক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আল্লাহর দ্বীনের পথে শাহেদ তথা সাক্ষ্যদাতা। আবার তিনি ছিলেন মুসলেহ তথা মুসলিম সমাজের সংস্কার-সংশোধনের এক প্রবল ব্যক্তিত্ব। একজন মুমিনকে যে যে দায়িত্ব ও গুণাবলি অর্জন করতে হয় আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) সেগুলিকে নিজ জীবনে ধারণ করার ক্ষেত্রে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লামা সাঈদী (রহ.) জেলের ছোট্ট কুঠুরিতে শাহাদাতের তামান্নায় ঘুমাতেন। আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করেছেন। একজন মুমিনের জীবনে এর থেকেই পরম পাওয়া আর কী হতে পারে! তাঁর বিদায়ে শুধুমাত্র বাংলাদেশের পিরোজপুরের মানুষের হৃদয় ভাঙেনি, সীমান্তের সকল কাঁটাতার উঁপড়ে পশ্চিমবঙ্গের বুকেও হৃদয় বিদারক সুর শোনা যায়। একজন আলেমে-দ্বীন থেকে টেপ রেকর্ডারে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে শোনা সাধারণ মুসলমান সকলেই দুঃখে কাতর। একজন আল্লামার প্রেমে মিলেমিশে একাকার পশ্চিমবঙ্গ এবং ওপার বাংলার মুসলমান যা নিশ্চয় ইতিহাস হয়ে থাকবে।

লেখক:- কেন্দ্রীয় সম্পাদক, স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া (SIO)

যেভাবে শুরু হয়েছিলো শহীদ আল্লামা সাঈদীর (রহ.) মাহফিল জিন্দেগী

আবদুস শহীদ নাসিম

সেই স্মরণীয় ঘটনাটি....

১৯৭৪ সাল। রবিউল আউয়াল মাস। ঢাকার রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সরোওয়ার্দী উদ্যান)। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সিরাতুন্নবি মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উম্মুক্ত রেসকোর্স ময়দানে। কওমি অঙ্গনের উসতাজুল আসাতিজা ঢাকার প্রখ্যাত আলেম মুফতি দীন মোহাম্মদ খানের নেতৃত্বে গঠিত হয় সিরাতুন্নবি কমিটি।

সময় নিয়ে ব্যাপক প্রচারণার পর নির্ধারিত দিনে আরম্ভ হয় সীরাত মাহফিল। বিশাল মঞ্চে দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত আলেমগণ উপবিষ্ট। মুফতি দীন মোহাম্মদ খানের সভাপতিত্বে এবং ঢাকার অপর জঁাদরেল আলেম মওলানা মুহাম্মদ মাসুম সাহেবের পরিচালনায় শুরু হয় আলেমগণের আলোচনা। ঐ মাহফিলে যুবক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে মঞ্চের পাশেই আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়।

বিশাল উম্মুক্ত ময়দানে মানুষ আর মানুষ। কয়েকজনের আলোচনার পরই ঢাকায় নতুন আসা এক নওজোয়ান আলেমের নাম ঘোষণা করা হয় বক্তব্য রাখার জন্যে।

তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বক্তব্য শুরু করেন অন্যদের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অতীব আকর্ষণীয় ও বলিষ্ঠ ভাষায়। তাঁর প্রতিটি কথা ছিলো তীর্যক মাধুর্যময়। প্রতিটি কথাই যেন শ্রোতাদের কর্নভেদ করে হৃদয় মনকে করে তুলছিল উদ্বেলিত উজ্জীবিত।

রেসকোর্স ময়দান অবিরাম 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হচ্ছিল। ফাঁকে ফাঁকে ধ্বনিত হচ্ছিল 'মাওলানা সাঈদী-জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।'

এদিকে মঞ্চে ঘটে যাচ্ছিল ভিন্ন কাণ্ড। সাঈদী সাহেবের সময় ছিল দশ মিনিট। কিন্তু কোন ফাঁকে যে পার হয়ে গেছে ১৫ মিনিট, ২০ মিনিট! সাঈদী সাহেব বক্তব্য রেখেই যাচ্ছিলেন আর শ্রোতারা স্লোগানে স্লোগানে কাঁপিয়ে তুলছিল রেসকোর্স ময়দান– এ যেন সেই ৭ই মার্চের রেসকোর্স ময়দান!

পরবর্তী বক্তাগণের চেহারা হয়ে উঠছিল বিষাদময়। কিন্তু সভাপতি মুফতি দীন মোহাম্মদ খানের সাথে কথা বলার সাহস কারোই ছিল না। তবে পাশের কয়েকজন আল্লামা আজিজুল হক সাহেবকে খোচাচ্ছিলেন মুফতি সাহেবকে বলার জন্যে। কিন্তু তিনি উসতাজের সাথে কথা বলার সাহস করছিলেন না। অতঃপর তিনি সাহস করে হুজুরের পেছনে এসে হুজুর! হুজুর! কয়েকবার বললেন। কিন্তু মুফতি দীন মোহাম্মদ খান কোনো সাড়া দিলেন না। তিনি তো মন্ত্রমুগ্ধের মত সাঈদী সাহেবের বক্তব্যের শোনছিলেন।

অন্যান্য আলোচকদের ঠেলাঠেলিতে অতপর আজিজুল হক সাহেব পুনরায় হুজুরের পেছনে এসে বললেন, হুজুর উনকা ওয়াক্ত তো বহুত পহলেহি গুজার গিয়া----চ

মুফতি দীন মোহাম্মদ খান, "খা মূ শ, দেখতে নেহি ময়দান উনকা হো গিয়া"!!!!! (খামুশ, দেখতে পাচ্ছ না - ময়দান তাঁর পক্ষে চলে গেছে!)

অতপর পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মিনিট বক্তব্য রাখার পর সাঈদী সাহেব নিজেই তাঁর বক্তব্য শেষ করে দেন। যদিও ময়দান থেকে জোর আওয়াজ আসছিল, হুজুর আরো বলেন, আরো বলেন ---------!

ঐ সীরাত মাহফিলে সারা দেশ থেকে মানুষ এসেছিল। রেসকোর্স তখনও খালি ময়দান ছিল।

তারপর থেকে তাঁকে আটক করার আগ পর্যন্ত তিনি সারা দেশে এবং বিদেশে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার জন্যে অবিরাম দৌড়তে থেকেছেন।

আল্লাহ্ পাক তার সমস্ত প্রচেষ্টাগুলোকে কবুল করুন এবং তাঁকে মুকাররাবিনদের অতর্ভুক্ত করে নিন। আমিন ইয়া রববাল আলামিন!

লেখক: বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার ও সভাপতি, বাংলাদেশ কোরআন শিক্ষা সোসাইটি।

সাঈদী হুজুরের সাহচর্য

আইয়ুব খান

আল্লামা সাঈদী সাহেবকে আমি চিনি ১৯৭৮ থেকে। এই সময় থেকে আল্লামা সাঈদী সাহেব নিয়মিত ইউকে তে আসতেন, প্রতি বছরই আসতেন। ১৯৭৯ এ যখন ইসলামা মসজিদের সামনে ফিলকে ডিস্টিকদের রাস্তা বন্ধ করে ওয়াজ মাহফিল করা হয় আমি তখন সেখানে ছিলাম। আমি ইয়াং ভোলান্টিয়ার ইনচার্জ ছিলাম তখন। শুধু ইএলএম নয় সাঈদী সাহেবকে আমি বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়েছি। সাথে গিয়েছি, এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করেছি এবং একসাথে বিদেশ সফরও করেছি। আমার মনে আছে ১৯৭৯ এ ওনার সাথে ম্যানচেস্টার গিয়েছি, আরও বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি। ১৯৯৯ এ অস্ট্রেলিয়া সফর করেছি একসাথে একই প্লেনে। পাশাপাশি সিটে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করেছি। সাঈদী সাহেব একাধিকবার আমার বাসায় এসেছেন। আমি দাওয়াত দিয়েছি উনি এসেছেন। ওনার সাথে অনেক স্মৃতি রয়েছে। একাধিকবার ওনার ইউরোপ এবং ইউকে সফরের পুরো প্রোগ্রাম আমি ম্যানেজ করেছি। আমি ওনার ওয়াজ খুবই পছন্দ করতাম। উনি কখন ইউরোপে আসবেন, কখন ওয়াজ করবেন সে অপেক্ষাতে থাকতাম।

আল্লামা সাঈদীকে আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অবদান রাখার যে সুযোগ দিয়েছেন তা অতুলনীয়। সাঈদী সাহেব তার ওয়াজের মাধ্যমে ইসলামকে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং এটাই মনে হয় প্রথম যে একজন আলেম এভাবে ইসলামকে তুলে ধরেছেন সাধারণ মানুষের সামনে। তিনি ওয়াজ মাহফিলের নাম পরিবর্তন করে তাফসীর মাহফিল করেছেন এবং সেই তাফসীর মাহফিলের অডিও-ভিডিও সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তার ওয়াজ শোনার জন্য সাধারণ মানুষ পাগল ছিলেন। তাই এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেকে তার ওয়াজের স্টাইল, ভঙ্গি ইত্যাদি নকল করে ওয়াজ করার চেষ্টা করছেন এবং মনে হচ্ছে যে, এক সাঈদী শহীদ হলেও আরও শত শত সাঈদী তৈরি হচ্ছে।

আমি মনে করি আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জেলে পাঠিয়েছে। এতে তার লাভ হয়েছে, যদিও আমরা তার ওয়াজ থেকে বঞ্চিত হয়েছি কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার নবী-রাসুলগণও জেলে গিয়েছেন, সাহাবীরাও জেলে গিয়েছেন, আমাদের ঈমামরাও অনেকে জেলে গিয়েছেন ও জেলে মৃত্যুবরণও করেছেন তবুও ওনারা কম্প্রোমাইজ করেন নাই। আল্লামা সাঈদী সাহেবকেও সেইভাবে আল্লাহ তা'য়ালা জেলে নিয়ে গিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত নীরবে করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আল্লামা সাঈদী সাহেব জেলে যাওয়ার পরে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাওবা করার সুযোগ পেয়েছেন নীরবে বসে। যে কাজ তিনি বাহিরে থাকলে হয়তো ব্যস্ততার মধ্যে সবসময় করতে পারতেন না। আল্লাহ তা'য়ালা চেয়েছেন যে, তিনি মানুষ হিসেবে যে ভুলত্রুটি করেছেন বা হয়েছে, সেজন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তওবা করার সুযোগ করে দিয়েছেন, কান্নাকাটি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। যদিও কারাগারের জীবন অনেক কষ্টের, সুখের নয়। আল্লাহ তা'য়ালা হয়তো চেয়েছেন এর মাধ্যমে তার সমস্ত গুনাহকে তওবার মাধ্যমে নেকিতে পরিবর্তন করে দিতে। জেলে যাওয়ার কারণে আল্লামা সাঈদীর সুনাম, খ্যাতি একটুকুও কমেনি বলে আমি মনে করি। বরং জেলে যাওয়ার পরে তিনি যে অপরাধী নন, অপরাধ করেননি তা সকলের কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তা'য়ালা তার সমস্ত ত্যাগ, কুরবানি এবং কষ্টকে ইসলামের কবুল করুন এবং তাকে মাফ করে দিন। আল্লামা সাঈদী কুরআনের যে রাজ দেখতে চেয়েছিলেন সেই রাজ আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিষ্ঠিত করে দিন। সমাজে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত হোক। আল্লাহ তা'য়ালা সাঈদী সাহেবকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দান করুন এবং আমরা যেন সবাই সেই কুরআন মেনে চলতে পারি। আমিন।

লেখক : সাবেক চেয়ারম্যান, ইস্ট লন্ডন মসজিদ সেন্টার ও সাবেক বায়তুলমাল সেক্রেটারি, এমসিএ

লন্ডনে শহীদ মাওলানা সাঈদী ঃ
অম্লান স্মৃতিতে ভাস্বর

মুহাম্মাদ আনসার মুস্তাকিম

২০০৯ সালের অক্টোবর মাস। ইসলাম এবং টাওয়ার হামলেটস এর মুসলিম কমিউনিটির উপরে প্রকাশিত হয় এক গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট-ারি। ব্রিটিশ মিডিয়ার অন্যতম টেলিভিশন চ্যানেল "চ্যানেল ৪" এ প্রকাশিত হয় ডেসপ্যাচ।

২০০৯ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত এই ডেসপ্যাচ কমিউনিটির মধ্যে সৃষ্টি করে এক তুমুল আলোড়ন। ইসলাম ও মুসলিম কমিউনিটি সম্পর্কে এই ডকুমেন্টারিতে আসে বেশ কিছু স্পর্শকাতর তথ্য। মুস-লিম কমিউনিটির মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব। অক্টোবরের এসময়ে বিশ্ব নন্দিত মুফাসসিরে কোরআন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, কোরআনের পাখি নামে খ্যাত শহীদ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) লন্ডনেই অবস্থান করছিলেন।

তিনি সেদিন অবস্থান করছিলেন কমিউনিটির এক প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং অত্যন্ত পরিচিত মুখ জনাব আতিকুর রহমান জিলু ভাইয়ের বাসায়। কমিউনিটির পরিস্থিতি ছিল সে সময় অত্যন্ত থমথমে।

এমনি এক পরিস্থিতিতে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নিজ মাতৃভূমি প্রিয় বাং-লাদেশে ফিরে যাবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জিলু ভাইয়ের বাসা থেকে আমি মাওলানাকে এবং জিলু ভাইকে আমার গাড়িতে উঠালাম। এরপর মাওলানাকে নিয়ে রওনা হলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। প্রিয় মাওলানাকে নিয়ে এর আগেও অনেক জায়গায় মহান মাবুদ যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আজও মাওলানাকে নিয়ে আমি গাড়ি ড্রাইভ করছিলাম গেট উইক এয়ারপোর্ট।

দীর্ঘ এক ঘণ্টার এই ড্রাইভিং এ মাওলানা যুক্তরাজ্যে ইসলাম ও বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটির ঐক্য, সংহতি ও উন্নতি সম্পর্কে অনেক পরামর্শ রাখলেন। পরামর্শ রাখলেন বাংলাদেশী মুসলমানরা তাদের ঈমান এবং দ্বীন নিয়ে কীভাবে এই সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। থমথমে পরিস্থিতির এই সময়েও আমরা মাওলানাকে দেখেছি অত্যন্ত ধীর স্থির, গম্ভীর, অসীম সাহসী এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় অত্যন্ত কঠোর। মাতৃভূমির রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও তিনি আশঙ্কা করছিলেন। তারপরও তিনি প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।

ঘণ্টা খানেকের মাথায় আমরা যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম, আমরা একসাথে জোহরের নামাজ আদায় করলাম। নামাজ শেষে তিনি সকলের জন্য বিশেষ দোয়া করলেন। এরপর সহাস্যে আমাদের সাথে করমর্দন করলেন, কোলাকুলি করলেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর মাওলানা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে আমাদেরকে বিদায় দিলেন। তিনি বললেন, সম্ভবত মহান মাবুদ এর পর আর তোমাদের সাথে দেখার সুযোগ নাও দিতে পারেন।

এই বলেই তিনি আমাদেরকে আবারো এক এক করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বুকে আলিঙ্গনের সময় লক্ষ্য করলাম চোখ দিয়ে এই প্রিয় ব্যক্তিত্ব পানি গড়িয়ে পড়ছে। স্পষ্টতই দেখলাম তিনি কাঁদছেন আর মহান মাবুদের কাছে দোয়া করছেন। ব্রিটেনের বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটি যেন তাদের ঈমান এবং ইসলাম নিয়ে টিকে থাকতে পারে এবং সমাজকে এগিয়ে নিতে পারে।

সেদিনের স্মৃতি আজও মনে স্পন্দন জাগায়। জাগায় ঈমান ও ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এবং দ্বীনের জন্য কাজ করে যাওয়ার অবিরাম অনুপ্রেরণা।

আজ কোরআনের এই পাখি আমাদের মাঝে নেই। স্বৈরাচ-ারী সরকারের রোষানলে পড়ে দীর্ঘদিন কারাবাসের পর পৃথিবী থেকে চির প্রস্থান গ্রহণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আমরা জানি, অনেক রাজনৈতিক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ কারাবাসের পর মাওলানা সাঈদীর শারীরিক ইন্তেকাল হয়েছে। কিন্তু এই প্রিয় মাওলানা যে আদর্শের জন্য সারা জীবন সাধনা করেছেন, যে আদর্শের জন্য তিনি দীর্ঘদিন কারাবরণ করেছেন, সে আদর্শের কোনোদিন মৃত্যু হবে না। এই আদর্শ হচ্ছে ইসলাম আর ইসলাম টিকে থাকবে কেয়ামতের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। বাং-লাদেশের উত্তপ্ত ময়দানে একদিন আল্লাহর দ্বীনের বিজয় পতাকা পতপত করে উড়বে, ইনশাআল্লাহ। মাওলানা সাঈদী (রহ.) কে যারা ভালোবাসেন তাঁরা ভালো করেই জানেন মাওলানা সাঈদীকে স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের জন্য এই জমিনে অবিরত কাজ করে যাওয়া। নিজের জীবন, পরিবার, সমাজ এবং কমি-উনিটিকে আল্লাহর দ্বীনের নির্দেশনা অনুযায়ী সাজানোর অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো। শহীদ মাওলানা সাঈদী এ কথাটি আমাদেরকে সারাটি জীবন শিখিয়েছেন। মহান মাবুদ মাওলানা সাঈদী কে শহীদি মর্যাদা দান করুন। তাঁর সমস্ত গুনাহ খাতা গুলোকে ক্ষমা করুন। আর তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন এবং সর্বোত্তম স্থান দান করুন, মহান মাবুদের নিকট আমরা এই দোয়াই করি।

আপন নীড়ে কুরআনের পাখিঃ একজন অকুতোভয় নির্ভীক সৈনিক দাঈ ইলাল্লাহ'র বিদায়

মুহাম্মাদ আবদুল কুদ্দুছ খান

গত ১৪ই আগস্ট ২০২৩, মরহুম হযরত মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর (রহ.); শতাব্দীর এক মহান ব্যক্তির জীবনের যবনিকা পতন (মৃত্যু) ঘটে। এই মৃত্যু আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক, বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক– যা বিশ্বের সকল মুসলমান এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে। তাঁর মতো ক্ষণজন্মা একজন ইসলামিক চিন্তাবিদ এবং সত্য প্রচারে (উচ্চারণে) অকুতোভয় নির্ভীক সৈনিক মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। যার ফলে আলেম ও ইলম (পণ্ডিত ও জ্ঞান) এর জগতে এক মহাগভীর শূন্যতার সৃষ্টি হলো। ইসলামের তথা মানবতার জন্য তাঁর অবদান মানুষ চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। ইনশাআল্লাহ।

মরহুম আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর জীবদ্দশায় পৃথিবীর প্রায় ৫০টিরও বেশি দেশে আমন্ত্রিত হয়ে ইসলামের সুমহান বাণী (আদর্শ); জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। অনেক দুর্বল ঈমানের মুসলিম তাঁর আলোচনা শুনে নিজেদের পরিশুদ্ধ করে নিয়েছেন এবং অনেক অমুসলিম তাঁর তাফসীর ও আলোচনা শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইকামাতে দ্বীনের কাজে মরহুম আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) আপোষহীনভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনকে স্বৈরাচারী, ফ্যাসিস্ট জালিম সরকার দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি সকল রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করে নিরলসভাবে দ্বায়ী ইলাল্লাহ এর কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তার ফলে তিনি এমন একটি নামে ভূষিত হয়েছেন যা ইতঃপূর্বে কেউ অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। সেই নামটি আজ সার্বজনীন হয়ে গেছে "কুরআনের পাখি"।

মরহুম আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) কে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে হলে কুরআনের পাখির ঝাঁকের মধ্যে (তার সহকর্মী, সহযোগী এবং সহমর্মীদের সাথে মিলেমিশে একাত্ব হয়ে কাজ করতে হবে বিচরণ করতে হবে কুরআনের জগতে। কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে হবে। তিনি আজীবন কুরআনের আলোকে ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে গেছেন। তাঁর মধ্যে শাহাদাতের তামান্না ছিল প্রবল। কারাবন্দি অবস্থায় ও তিনি দ্বীনের দাওয়াত সম্প্রসারণে কাজ করে গেছেন। তিনি ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখতেন এবং সে লক্ষ্যে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল ও অবিচল ছিলেন। তার এই বর্ণাঢ্য জীবন আমাদের জন্য বিশাল প্রেরণা, অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় উপমা হয়ে থাকবে। ইহকালে যারা যে লোকের অনুসারী হয়, পরকালেও তারা সে লোকেরই অনুসারী হবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপন রহমত দ্বারা তাকে আবৃত করে রাখুন এবং তাঁর সমস্ত ভাল আমল গুলো কবুল করুন এবং তাঁর জীবনের সমস্ত ভুল-ত্রুটি গুলো ক্ষমা করুন, তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [وَعَذَابِ النَّارِ]

"হে আল্লাহ! আপনি ওনাকে ক্ষমা করুন, ওনাকে দয়া করুন, ওনাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখুন, ওনাকে মাফ করে দিন, ওনার মেহমানদারীকে মর্যাদাপূর্ণ করুন, ওনার প্রবেশস্থান কবরকে প্রশস্ত করে দিন। আর আপনি ওনাকে ধৌত করুন পানি, বরফ ও শিলা দিয়ে, আপনি ওনাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করুন যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করেছেন। আর ওনাকে ওনার ঘরের পরিবর্তে উত্তম এর ঘর, ওনার পরিবারের বদলে উত্তম পরিবার ও ওনার জোড়ের (স্ত্রী/স্বামীর) চেয়ে উত্তম জোড় প্রদান করুন। আর আপনি ওনাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং ওনাকে কবরের আযাব (ও জাহান্নামের আযাব) থেকে রক্ষা করুন। (মুসলিম ২/৬৬৩, নং ৯৬৩)

পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের ফিনল্যান্ডে "কুরআনের পাখির" জন্য দোয়া ও গায়েবানা জানাজা

ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে (পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের এবং সর্ব উত্তরের জাতীয় রাজধানী) গত ১৬.০৮.২০২৩ তারিখে মুসলিম কমিউনিটি অফ ফিনল্যান্ডের উদ্যোগে বরেণ্য আলেমে দ্বীন ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন হযরত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) এর জন্য দোয়া ও গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দোয়া ও জানাজায় নিম্নোক্ত মসজিদ ও সংগঠন সমূহের সম্মানিত দায়িত্বশীলগণ সহ দেশী-বিদেশী মুসলিমদের পদচারণায় হেলসিংকিস্থ মালমী পার্ক মুখরিত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশী অংশগ্রহণকারী সংগঠন গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- মুসলিম ফোরাম ফিনল্যান্ড। MCA Affiliated Islamic Organisation in Finland (বাংলাদেশী)
- মসজিদ দারুল আমান ও ইসলামিক সেন্টার (বাংলাদেশী)।
- এসপো ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদ (বাংলাদেশী)।
- কনতুলা বাংলাদেশী মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার।
- বাংলাদেশী ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, মালমী (বাংলাদেশী মসজিদ)।
- আলহেরা ইসলামিক সেন্টার ও (বাংলাদেশী), মসজিদ।
- মুসলিম কমিউনিটি ফিনল্যান্ডে প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন দেশের মুসলিম ইমিগ্রান্ট অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও দলমত নির্বিশেষে দেশী বিদেশী অনেক মুসলিম অংশগ্রহণ করেন।

গায়েবানা জানাজা পূর্ব বিশাল গণসমাবেশে (সকল শ্রেণির ও পেশার আপামর জনসাধারণের গণসমাবেশ) বক্তব্য রাখেন ফেডারেশন অফ ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ফিনল্যান্ডের সভাপতি জনাব আলাদীন মাহের (মিসরী)। স্মৃতিচারণ করেন মুসলিম ফোরাম ফিনল্যান্ডের দাওয়া সম্পাদক ডা. খালিদ সাইফুল্লাহ।

মূল আলোচনা করেন ফেডারেশন অফ ইসলামিক অর্গানাইজেশনস অফ ফিনল্যান্ডের সাবেক সভাপতি, MCA Mainland Team এর সদস্য এবং হেলসিংকিস্থ মসজিদ দারুল আমানের ইমাম ও খতিব জনাব মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুছ খান।

আলোচনায় জনাব মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুছ খান আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর কুরবানির ভূয়ষী প্রশংসা করেন। আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) দ্বীন ইসলামের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার জন্য ত্যাগ তিতিক্ষার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের কিংবদন্তি, পাইওনিয়ার ও সূতিকাগার । বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। তাঁর এই ত্যাগ তিতিক্ষা থেকে আমাদের প্রেরণা নিয়ে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ঈমানের উত্তম অবস্থায় মাঠে ময়দানে অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে। তাঁর কারাবাসের আর কোনো কারণ ছিল না; শুধু একটাই কারণ ছিল:

وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

"তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এই কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।" (আল-বুরুজ, ৮৫:৮)

অর্থাৎ ঐ সব লোকেদের অপরাধ যাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল এই ছিল যে, তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল।

ঠিক একই কারণে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) এর কারাগারে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নিকট দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। আমিন।

আসুন আমরা এই কঠিন শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাঁর ভালোবাসার উৎকৃষ্ট উদাহরণ পেশ করি। হযরত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবেসে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নির্ভীক ও অটল ছিলেন। কবি গোলাম মোহাম্মদ এর ভাষায়: "সেই সংগ্রামী মানুষের সারিতে/ আমাকেও রাখিও রহমান/ যারা কুরআনের আহ্বানে নির্ভীক/ নির্ভয়ে সব করে দান"।

إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ﴾ ﴿نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾

নিশ্চয় যারা বলে,আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তারপর তাতে অবিচল থাকে। তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে) তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না। এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। (সুরা হা-মীম সিজদা ৪১:৩০-৩২)

আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। প্রতিপালকও তিনিই এবং উপাস্যও তিনিই। এ রকম নয় যে, তাঁর প্রতিপালকত্বকে কেবল স্বীকার করবে এবং উপাস্যত্বের ব্যাপারে অন্যকেও শরীক করবে। কেউ কেউ এখানে এই 'ইস্তিক্বামাত' এর অর্থ করেছেন, ইখলাস। অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্তে কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত ও আনুগত্য করে। যেমন, হাদিসেও এসেছে যে, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-কে বলল, আমাকে এমন কথা বলে দিন যে, আপনার পর যেন আমার অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তখন রাসুল (সা.) তাকে বললেন, (قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ) "তুমি বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম। অতঃপর তারই উপর অবিচল থাক।" (মুসলিম : কিতাবুল ঈমান)

সর্বশেষে আবারও ইসলামী রেনেসাঁর কবি মরহুম মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতার বাস্তবায়নের মাধ্যমে কুরআনের পাখির অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য আল্লাহর নিকট কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করছি, "দাও খোদা দাও হেথায় পূর্ণ ইসলামী সমাজ।"

মাওলানা সাঈদীর বিনয়, আদব ও রাসুল (সা.) প্রেম

মাহমূদ বিন সাঈদ

যুক্তরাজ্যের বারমিংহামে গায়বানা জানাযার পূর্বে আযহার ইউনিভার্সিটির স্কলার শেখ কাযী বিলাল আল-আযহারী স্মৃতি-চারণ করে বললেন–

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাওলানা সাঈদী (রহ.) তুরে সীনাই ভিজিট করেন। পাহাড়ের পাদদেশে যাবার সাথে সাথে নিজের জুতা খুলে হাতে নিলেন। আমরা তাকে জিজ্ঞাস করলাম ইয়া শেখ! এটি কী করলেন?

জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী মূসা আলাইহিস সালামকে এখানে জুতা খুলতে নির্দেশ করে বলেছেন,

فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى

এখানে মূসা এর পা স্পর্শ করেছে। আমিও মুসা আলাইহিস সালামের সুন্নাহ পালন করে ধন্য হতে চাই।

সুবহানাল্লাহ!

লেখক : শিক্ষাবিদ ও সমাজচিন্তক।

আল্লামা সাঈদীকে যেমন দেখেছি

উম্মে তাহমিদ

দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আল্লামা সাঈদীকে অসাধারণ প্রতিভা দান করেছিলেন। তিরিশটি বছর পেরিয়ে গেল এখনও সেই দিনের স্মৃতি বিদ্যমান।

একদিন ডাক আসলো আল্লামা সাঈদীর মাহফিলে যোগদান করার জন্য ইস্ট লন্ডন মসজিদে। যাত্রা শুরু করলাম এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেখি মহিলাদের সেকশন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। শুধুমাত্র অপেক্ষায় আছেন যে কখন সাঈদী সাহেব তাফসীর শুরু করবেন। যখন উনার সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াত শুনতে লাগলো। সবাইকে মুগ্ধ করে ফেলল উনার সেই সুললিত কণ্ঠের আওয়াজ। বিশেষ করে মা-বোনদের উদ্দেশ্য করে বললেন- নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে আগুন থেকে বাঁচাও, সন্তানদেরকে কীভাবে লালন-পালন করা, দাওয়াতি কাজে মহিলাদের কি ভূমিকা এবং নিজেকে কীভাবে দাওয়াতি কাজে নিয়োজিত করা, ভারসাম্য জীবন কীভাবে কাটানো, স্বামী-স্ত্রীর হক, আত্মীয় স্বজনের হক কীভাবে আদায় করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে দিক নির্দেশনা দিয়ে সবার মন জয় করে নিতেন।

ইউকের প্রায় প্রতিটি শহরে এবং ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় আল্লামা সাঈদীর ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে- যার ফলে প্রতিটি মুসলমানের ঘরে ঘরে, কি বলেন গাড়িতে, কি বলেন অডিও এবং ভিডিও থেকে দ্বীনের আওয়াজ বেজে উঠত। মহিলারা ধীরে ধীরে সাঈদীর উৎসাহ উদ্দীপনায় দ্বীনের কাজে অগ্রসর হতে থাকলো।

সাঈদী সাহেব সত্যিই একজন কোরআনের পাখি ছিলেন বিধায় সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ও সুদূর ইংল্যান্ডে পাড়ি দিয়ে যে তাফসীর মাহফিল করেছেন তা পুরুষ-মহিলা, কি বলেন বৃদ্ধ, কি বলেন যুবক-যুবতী, কি বলেন কিশোর-কিশোরী কোরআনের সুরে সবাইকে আলোকিত করেছেন।

মুমিনের দরবারে আরজ- আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যেন আল্লামা সাঈদীকে তাঁর দ্বীনি কাজের জন্য বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান দান করেন- আমিন।

আল্লামার সাথে দুই বার সাক্ষাতে এক ও অভিন্ন নসিহা

আবু নাঈম মু শহীদুল্লাহ

পৃথিবীর সৌন্দর্য প্রকাশের একটি অসাধারণ মাধ্যম হলো ফুল। এটি মহান আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম সৃষ্টি গুলোর মধ্যে অন্যতম। ফুল বরাবরই সৌন্দর্যের প্রতীক। ফুলের সৌন্দর্য মানুষের মনকে দারুণ ভাবে প্রভাবিত করে। যদিও সৌন্দর্য সবাইকে একই ভাবে আকৃষ্ট করে না কারণ দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ও নমুনা একেক জনের কাছে একেক রকম। কিন্তু ফুল পছন্দ করে না বা ভালোবাসে না এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। ফুল যেমন সৌরভ ছড়ায় ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তেমনি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আল্লাহ তাআলা কিছু দাঈ তৈরি করে দেন। যারা ফুলের মত সৌরভ ছড়ানোর সাথে দ্বীন ইসলামকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন সুন্দর ও সহজ ভাবে। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সে দাঈ ছিলেন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.)। তিনি শুধু দাঈ-ই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে সংগঠক, মুফাসসিরে কুরআন ও জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি (সাংসদ) ।

তাফসীরুল কুরআন মাহফিল ও তাফসীরে সাঈদী

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.)-র ৮৩ বছর হায়াতে জিন্দেগীর বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন মহগ্রন্থের আল কুরআনের তাফসীর করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উনি কুরআনের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাফসীর শুনিয়ে মানুষের হৃদয়ে কুরআনের মহব্বত তৈরি করার চেষ্টা করিয়েছিলেন। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় তিনি কুরআনের তাফসীর করে গিয়েছেন নিরলসভাবে, ঐতিহাসিক ধারাবাহিক তাফসীর করেছিলেন ঢাকার খিলগাঁও ইসলমী পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ পরিষদ এর উদ্যোগে আয়োজিত তাফসীর ও সিরাত মাহফিলে (পল্টন ময়দান) এবং সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে আয়োজিত (প্যারেড গ্রাউন্ড / লালদিঘীর ময়দানে) তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে (৫দিন ব্যাপী) প্রধান অতিথি হিসাবে তাফসির করেছিলেন ২৯ বছর। খুলনা সার্কিট হাউজ ময়াদানসহ বিভিন্ন মাঠে (২দিন ব্যাপী) তাফসির মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন ৩৮ বছর, সিলেট সরকারি আলীয়া মাদ্রাসা মাঠে (৩ দিন ব্যাপী) মাহফিলে ৩৩ বছর, রাজশাহীতে ৩৫ বছর। এভাবে করে ১৯৬৭ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বাণী সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। মাহফিল সমূহের অডিও ভিডিও এখনো বাজারে পাওয়া যায় তবে এগুলোর মাস্টার কপি সংরক্ষণ করতেছেন (সিএইচপি)। আল্লামার মাহফিল জগতের বিশাল খেদমতের পাশাপাশি প্রিয় মরহুম আব্দুস সালাম মিতুল ভাইয়ের কঠোর পরিশ্রমে তাফসীরে সাঈদী প্রকাশিত হয়েছে যা এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তাফসীরে সাঈদী ছাড়াও উনার লেখা বেশ কিছু বই বাজারে রয়েছে।

আল্লামা সাঈদী (রহ.) জীবনের প্রতিটি সময় দাঈ ইলাল্লাহর ভূমিকায় ছিলেন। তিনি শুধু মৌখিক ও লেখনীর মাধ্যমেই আল কুরআনকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন তা নয়। বরং তিনি আল কুরআনের দাবি কুরআনের আলোকে সমাজকে সাজানোর সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু এলাকায় জাতীয় নির্বাচনে দু'বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ।

তাই অনেক উনাকে বাংলার হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালা বলে থাকেন। উনার তাফসীর মাহফিল গুলো মানব সাগরে পরিণত হতো । মাহফিলে মুসলিম জনতার পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মের লোকেরাও কাছ থেকে আলোচনা শুনতো

এবং চমকিত হতো। অনেকেই ইসলামের সুমহান আদর্শকে গ্রহণ করে উনার হাতে কালেমা শাহাদাত পড়ে মুসলমান হতেন ।

জন্ম ও বসবাস বাংলাদেশে হলেও তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর এক অনন্য রাহবার। যেখানেই মুসলমানদের উপর অন্যায় ও জুলুম হতো তিনি প্রতিবাদ করতেন জোরাল কণ্ঠে। বৃদ্ধ বয়সের প্রতিবাদী কণ্ঠ শুনে অনেকেই উনার বয়স বুঝতে পারতেন না।

স্মৃতি বিজড়িত দুটি ক্ষণ: আমাদের কিশোর বয়সে দেখতাম প্রায় সকল বাড়িতে, হাটে বাজারে আল্লামা সাঈদীর ক্যাসেট ওয়াজ চলতো। চমৎকার আলোচনা শুনে সকলের মত আমিও ওনার ভক্ত হয়ে গেলাম। সর্বপ্রথম সরাসরি মাহফিল শুনতে ১৯৯৪ বা ১৯৯৫ সালে অনেকের সাথে আমিও চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার। ১৯৯৭ সালে ঢাকার মাহফিলে দূর থেকে অনেকটা মাছরাঙ্গা পাখির মত তাকিয়ে দেখেছিলাম, কী চমৎকার কথা বলার ভঙ্গি এখনো চোখের সামনে বাসছে "এ সমাজ ভাঙতে হবে নতুন সমাজ গড়তে হবে" সে বছর উনার এ কথা টা স্লোগানে পরিণত হয়েছিল। বছরটি ছিল শহীদ আবুল কাশেম ভাইয়ের শাহাদাতের বছর। যিনি খিলগাঁও ইসলমী পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

এভাবে প্রতি বছর মাহফিলে যাই কিন্তু ক্লোজলী দেখার সুযোগ পাইনি। সৌভাগ্যক্রমে ২০০২ সালে মরহুম আব্দুস সালাম মিতুল ভাইয়ের চান বেকারী গলি মগবাজারের বাসায় পাশাপাশি বসে দীর্ঘ সময় আলাপ খাবার ও নসিহা পাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। একই বছর রাফে সাদমান ভাইয়ের সাথে শহীদবাগে আল্লামার বাসায় যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। কী সুন্দর করে সাজানো লাইব্রেরি চোখে এখনো ভাসছে। যে জন্য দুটি সরাসরি সাক্ষাৎ এর কথা বলছি–দুইবারেই উনি একই নসিহা করেছেন।

১. জীবনে যত ব্যস্ততাই থাকুক জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবা।

২. কুরআন এবং হাদিস অধ্যয়ন করবা মনোযোগ সহকারে, সম্ভব হলে সাথে সাথেই নোট করবা।

৩. দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দিবা; এতে যত বাধাই আসুক না কেন তোমরাই সাফল্য লাভ করবা।

আল্লামার নসিহা গুলো এখনো হুবহু মনে রয়েছে। জালিমের জুলুমের শিকার প্রিয় আল্লামাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমিন।

লেখক: সভাপতি, ইউথ মুসলিম এসোসিয়েশন, পর্তুগাল

আমার ভাই দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

হাজী আব্দুল মান্নান

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.)-এর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল একটি কনফারেন্সে। তিনি বার্মিয়া কনফারেন্সে এসেছিলেন। ইস্ট লন্ডন মসজিদের সালাম সাহেব ও মমতাজ আলীসহ অনেরেক এই কনফারেন্সে এসেছিলেন।

কনফারেন্সের দুদিন পর সালাম সাহেব আমাকে বললেন– মান্নান সাহেব, আপনার বাড়ি তো বড়ো। আপনি যদি সাঈদী হুজুরকে আনা-নেওয়া করেন, বেশ ভালো হয়। উত্তরে বললাম, আমি তো কাজ করি– থাকা ও খাওয়ার দায়িত্ব আমি নিতে পারি।

সাঈদী হুজুর মঈন ভাইয়ের ঘরে ছিলেন। বিসমিল্লাহ বলে ঘরে প্রবেশ করলাম। হুজুরকে সালাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ভালো আছেন? তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! ভালো আছি। আপনি কে? বললাম, আমি হাজী আব্দুল আজিজ। বেশ সময় নিয়ে হুজুরের সাথে আলাপ করলাম। তাঁকে বললাম, আপনি যখন সিলেটে গিয়েছিলেন, তখন আমার গ্রামের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, কেমন করে আপনার বাড়িতে গেছি? আমি বললাম, মুখতার আমার ভাতিজা। সে জামায়াতের লোক। সে আপনাকে নিয়ে গেছে। সাথে বিলকিছ মিয়া থ(সাবেক আর্মি) ছিলেন।

আমি বললাম, আপনি যদি আমার বাসায় যান, অসুবিধা হবে কি না? তিনি বললেন, অসুবিধা নেই। আমি পুনরায় বললাম, আমার স্ত্রী অসুস্থ। আপনাকে খাওয়াতে পারবো না। তিনি বললেন, অসুবিধা নেই। তিনি তো আমার বোন।

একটি গাড়ি ঠিক করে তাঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসলাম। তিনি আমার বাড়ির প্রশংসা করে বললেন, খুব সুন্দর ও বড়ো বাসা। হুজুর বললেন, এখানে কী পার্মানেন্ট থাকবো? বললাম, আপনার যতদিন ইচ্ছে। থাকতে পারেন। যাওয়ার সময় বললেন, আমিতো বিদায় নিচ্ছি। আপনার ঘরে কী আমার রিজিক থাকবে? আবার আসতে পারবো? থাকতে পারবো? আমি বললাম, অবশ্যই। আপনি যখনই এদেশে আসবেন–আমার বাড়িতে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ।

এরপর তিনি যতবার এসেছেন–আমি সবার আগে এয়ারপোর্ট চলে যেতাম।

আমার একজন খালু ছিলেন– হাজী আব্দুস সালাম। খুব ভালো মনের মানুষ ছিলেন। তার সাথে আমার ভালো সখ্যতা ছিল। ওনার পর সাঈদী হুজুরের সাথে সাথে বেশি মায়া-মহব্বত হয়ে গেলো।

একবার শুনলাম, সাঈদী হুজুর আমাদের গ্রামের বাড়ির দিকে যাবেন মাহফিলে। আমি আমার ভাইকে বললাম, হুজুরকে আমাদের বাড়িতে নেওয়ার জন্য। মাহফিল শেষে তিনি বললেন, এটা কী হাজি সাহেবের বাড়ি? আমি যাবো।

বাড়িতে গিয়ে তিনি বললেন কী কী খাবার আছে? তারপর খাওয়া দাওয়া করলেন। অনেক গল্প করেছেন। আমার চাচতো ভাই দুধ নিয়ে এসে বলছেন, এগুলো আমার নিজের গাইয়ের দুধ, তিনি তা তৃপ্তিসহকারে পান করেছেন। এরপর বহুবার তিনি আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছেন।

তিনি যখন জেলে গেলেন, তখন তাঁর ছেলে নাসিমকে আমি বললাম, তোমার আব্বাকে আমি দেখতে যাবো। যেকোনো উপায়ে ব্যবস্থা করুন। অতঃপর দেখা করলাম। আমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছেন। আমাকে চুমু খেয়েছেন। দেখি ওনার চোখে পানি

এসেছে। বললাম বিদায় দেন, তিনি বললেন বিদায়তো দিতে চাই না। একটু কষ্ট হয়। তিনি বললেন আমারতো বসতে কষ্ট হয়, পরে আমি একটা চেয়ার দেই। পরে আরও একবার দেখতে গিয়েছি-লাম। তিনি আমাকে ভাইসাব ডাকতেন আমিও ভাই ডাকতাম। তিনি বলতেন, আপনার তো কষ্ট হচ্ছে। আমি বললাম, হোক এতো আমার সমস্যা নাই।

আমার পরিবারের সাথে সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। তিনি তো বলেছি-লেন, আপনার পরিবারের সাথে আমার কেয়ামত পর্যন্ত ভাই-বোনের সম্পর্ক থাকবে। কোনোদিন খারাপ ব্যবহার দেখি নাই। একদিন আমার এক ছেলে রাত্রে আমাকে বলতেছে, মামায় খালি আল্লাহু আল্লাহু বলতেছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে উপরে গেলাম, দরজা খুলে দিতে বললাম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। বললাম আপনার কী সমস্যা হয়েছে, আমাকে বলেন। বললেন তেমন কিছু না; হার্টে একটু সমস্যা অনুভব করছি। বললাম আমি একটু মেসেজ করে দেই। তিনি বললেন, সমস্যা নাই আল্লাহ শেফা দেবে। তখন আমার ছেলেকে বললাম তুমি যাও; মেসেজ করি দাও।

আমার ছেলে গিয়ে বললো, মামা আমি মেসেজ করে দেই, তিনি বললেন নারে বাবা লাগবে না আল্লাহ শেফা করে দিবেন। তাঁর থেকে যা আচরণ পেয়েছি, তাঁর পরিবার থেকে একই আচরণ পেয়েছি। আমি কোনোভাবেই হুজুরের অমায়িক ব্যবহার ভুলতে পারি না। তাঁর সন্তান বুলবুল, শামীম, মাসুদের ব্যবহারও অসাধারণ ছিল। মাসুদ একবার খুব অসুস্থ ছিলো, সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে সময় তার চিকিৎসায় অনেক টাকা ব্যয় হয়েছিল। আমরা চেষ্টা করেছিলাম চিকিৎসা ব্যয়ে শরীক হওয়ার। সেখান থেকে আমার প্রতি বেশি ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল। মাসুদ বলতেন, আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন।

সিডরের সময় আমি আমিসহ দুই-তিনজন গিয়েছিলাম সহযোগিতা করতে। ৭/৮ হাজার পাউন্ড মাসুদ সাঈদী-এর হাতে দিয়ে বললাম, মালপত্র কেনেন। আমরা আসতেছি। তিনি সকল ব্যয়ের ভাউচার আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি বললাম, আমি তো হিসাব চাই না। তিনি বললেন, এগুলো তো জনগণের টাকা।

একবার সাঈদী হুজুরের শ্যালক মোস্তফা, আমাকে বললো–দুলাভাই ব্যবসার জন্য কিছু টাকা লাগবে। আমি বললাম, কত টাকা? তিনি বললেন, দুই লাখ। পরবর্তীতে সে ব্যবসায় লস খায়। আমি কোনোদিন এই টাকার কথা সাঈদী হুজুরকে বলি নাই। আমার স্ত্রী তাঁর স্ত্রীকে টাকার বিষয়ে জানিয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি বললেন, ভাইজান– মোস্তফা আপনার কাছ থেকে টাকা নি-ছিলো সে তো নষ্ট করে ফেলছে। তাই আপনাকে আমি টাকাগুলো ফেরত দিলাম। আমি বললাম, না না লাগবে না। তিনি বললেন, এটা আপনার উর্পাজনের টাকা।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তিনি কোনোদিন কিছু বলেন নাই। যা দিছি তাই খেয়েছেন। কখনো বলেন নাই যে, আমি এটা খাবো বা এটা খাবো না। শুধু বলতেন, আমার বোনের হাতের রান্না আমার খুব ভালো লাগে। দীর্ঘ ২৮ বছরের সম্পর্কে কোনোদিন কোন প্রকার ত্রুটি আমি পাইনি। আমার বাসা থেকে যাওয়ার সময় আমার স্ত্রীকে বলতো বোন, তোমারে অনেক কষ্ট দিছি। আল্লাহ চাইলে আগামী বছর আসবো নাকি?

ইসলামে মহিলাদের অধিকার : শহীদ মাওলানা সাঈদীর অসাধারণ বক্তব্য

আনজুম আরা বেগম (বিউটি)

যিনি জীবনভর কোরআনের বক্তব্যকে মানুষের মধ্যে তুলে ধরেছেন। যিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে কোরআনের শাসনকে সমাজে কীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আজকের এই লেখায় সেই মহান আলেমে দ্বীনকে নিয়ে আমি দু'একটি কথা লিখতে চাই। আমি তখন সবেমাত্র লন্ডনে এসেছি। সেই নব্বই সালের কথা। আমি নতুন এদেশে এসেই খবর পেলাম একজন আলেমে দিন আলোচনা রাখবেন ইস্ট লন্ডন মসজিদে।

মাওলানার প্রথম আলোচনা শোনার জন্য আমি ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রোগ্রামে আসি। ইতিপূর্বে আমি অনেক মাওলানার আলোচনা শুনেছি, অনেক প্রোগ্রাম গিয়েছি। মাওলানার প্রোগ্রামে আমি যে জিনিসটা লক্ষ্য করেছি সেটা হল এত অধিক সংখ্যক বোনদের উপস্থিতি এবং সমাগম অতীতে কোন প্রোগ্রামে আমি কখনো দেখিনি ।

প্রোগ্রাম চলাকালীন কাউকে বলতে হয়নি কথা বলবেন না। একদম পিন পতন নীরবতা। সবাইকে লেগেছিল একান্ত মনোযোগ সহকারে মাওলানার বক্তব্যকে শুনছেন। আমার এখনো মনে আছে মাওলানার প্রথম আলোচনার বিষয়বস্তু। বিশ্ব সভ্যতা বিনির্মাণে পৃথিবীকে ইসলাম কি দিয়েছিল আর পাশ্চাত্য বা ওয়েস্টার্ন কালচার মানব সভ্যতাকে কি উপহার দিয়েছিল।

মানব সভ্যতায় তথা ইসলামে মা-বোনদের অবস্থান যে কত গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার তা শহীদ মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর কাছ থেকেই আমরা শুনতে পেরেছি। তিনি তার বক্তব্যকে সেদিন তিনটি ভাগে পেশ করেছিলেন। একটি ভাগে ছিল ইসলামের পূর্বে তৎকালীন সমাজে নারীদের অবস্থান তা নিয়ে আলোচনা।

তিনি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলছিলেন, ইসলাম পূর্ব যুগে নারীরা ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা এক জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হতো। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হতো না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না তাদের। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হতো। সে যুগে নারীদেরকে মনে করা হতো দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসেবে। নারীদেরকে সেসময় ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসেবে কাউকে এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হতো না।

সভ্যতার এই অন্ধকার যুগকে সামনে রেখে মাওলানা কোরআনের একটি আয়াত পেশ করেন। যেখানে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ،

'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? (সুরা আত-তাকভীর, ৮১:৮-৯)

তিনি আলোচনার এক পর্যায়ে বললেন, সেযুগে মহিলারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হতো। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহর দানে

তাকে বিবাহ করতে সম্মত হতো না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। সুন্দরী বাঁদী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হতো।

আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি সেদিন। এই মহান আলোচক যখন নারীদের তৎকালীন সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে এ কথাগুলো বলছিলেন, তখন অনেক মা-বোনেরাই কান্না করছিলেন।

দ্বিতীয়ত তিনি বলছিলেন, সেই সমাজে নারীরা যেমন মর্যাদা ও সম্মান পেতো না, ঠিক তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীদের অধিকার গুলোকে নানা ভাবে অপব্যবহার করা হতো।

নারীদের উত্তরাধিকার নিয়ে নারী তাঁর পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয় ও স্বামীর পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ পেয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন: "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও অংশ রয়েছে। (সুরা আন-নিসা, ৪:৭)

তৃতীয়ত তিনি যে কথাটি বলেছেন, সেটি হচ্ছে নারীদের মোহরের অধিকার। নারী তাঁর স্বামীর নিকট থেকে নির্ধারিত ও সম্মানসূচক অতিরিক্ত আর্থিক নিশ্চয়তা স্বরূপ মোহরানার অধিকার পাবেন। (সুরা আন-নিসা, ৪:৪)

চতুর্থ তিনি যে কথাটি বলেছেন সেটি হচ্ছে নারীদের ভরণ-পোষণের অধিকার। মহানবী (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তুমি যখন খাবে স্ত্রীকেও খাওয়াবে এবং তুমি যখন পরবে স্ত্রীকেও পরাবে।' (সুনান আবু দাউদ হা: ২১৪২)

নারীদের ধর্মীয় মর্যাদা সম্পর্কে শহীদ মাওলানা সাঈদী বলেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'পুরুষ বা নারী যে লোকই নেক 'আমল করবে এবং সে ঈমানদার হলে, তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।' (সুরা আন-নিসা, ৪:১২৪)

তিনি বলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পদ নারীদের ব্যক্তিগত ভাবে ভোগ ও ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে। নিজ পরিশ্রমের অর্থসহ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থ তারই একান্ত মালিকানাধীন। এ মর্মে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'পুরুষগণ যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য। আর নারীরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য।' (সুরা আন-নিসা, ৪:৩২)

তিনি বলতেন, নারীর মর্যাদা ইজ্জত-সতীত্ব সুরক্ষার জন্য আল্লাহতায়ালা পর্দার বিধান ফরজ করেছেন। তিনি বললেন, কোরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে, হে নবী! মুমিনদের বলে দিন, তারা যেন পর স্ত্রী থেকে তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং নিজ যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তেমনি মুমিন নারীদের বলে দিন, পুরুষের থেকে তাদের দৃষ্টি যেন অবনমিত রাখে এবং স্বীয় যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করে। (সুরা আন-নূর, ২৪:৩০)

শহীদ মাওলানা সাঈদী হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক'। (সহিহ মুসলিম)

তিনি স্বামীদের সম্পর্কে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম'। (সহিহ বোখারি)

মাওলানার ওয়াজ থেকেই কুরআনের এই আয়াতগুলো আমরা শুনতে পেয়েছি আর তা হচ্ছে, মহান মাবুদ বলেন, এ গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন,

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،

'আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়'। (সুরা আন-নূর, ২৪:৩৩)

তিনি কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তখনকার সেই অন্ধকার যুগে একের অধিক নারী বিবাহ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত করা হতো। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যত্র স্বামী গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হতো না। এ জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারী জাতির উপর করা হতো।

তিনি পশ্চিমা সভ্যতায় নারীদেরকে বাজারের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে উল্লেখ করে বলেন, ইসলাম মাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মা-বাবাই হলো তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম'- (ইবনে মাজাহ-মিশকাত, পৃ. ৪২১)

আনাস ইবনে মালিক (রা.) একটি হাদিস উল্লেখ করে মাওলানা বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসুল (সা.) এর নিকট এসে বললো, আমি জিহাদে-সংগ্রামে অংশ নিতে চাই, কিন্তু আমার সেই সামর্থ্য ও সক্ষমতা নেই। তখন রাসুল (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার মাতা-পিতার কেউ কি জীবিত আছেন?' লোকটি বলল, আমার মা জীবিত। তখন রাসুল (সা.) বললেন, 'তাহলে মায়ের সেবা করে আল্লাহর নিকট যুদ্ধ-সংগ্রামে যেতে না পারার অপারগতা পেশ কর। এভাবে যদি করতে পার এবং তোমার মা সন্তুষ্ট থাকেন তবে তুমি হজ্ব, ওমরাহ এবং যুদ্ধ-সংগ্রামের সওয়াব পেয়ে যাবে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং মায়ের সেবা করো।' (মাজমাউজ জাওয়াইদ, হাদিস : ১৩৩৯৯)

ইসলামে মা-বোনদের মর্যাদা যে এত উচ্চতায় তা শুধুমাত্র শহীদ মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মাহফিলেই শুনতে পেরেছি।

তিনি হাদিসের রেফারেন্স তুলে ধরে আরো বলেন, বায়হাকির এক বর্ণনায় এসেছে, 'যখন কোনো অনুগত সন্তান নিজের মা-বাবার দিকে অনুগ্রহের নজরে দেখে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজ্বের সওয়াব দান করেন।' (সুনানে বায়হাকি: ৪২১)

এই হাদিসটি শোনার পর আমি লক্ষ্য করেছি অনেক বোনেরাই কান্নাকাটি করছিলেন। আমি শুধু চিন্তাই করেছি মহান মাবুদ আ-ল্লাহ রাব্বুল আলামীন কত সহজ করে আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যেতে চান তারপরও আমরা দুনিয়ার মোহে পড়ে এই আমল থেকে অনেক দূরে থাকি।

শহীদ মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে আরো বলেন, বৃদ্ধা হয়ে গেলেও মায়ের সেবা জরুরি। একবার রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, 'সে দুর্ভাগা! সে দুর্ভাগা! সে দুর্ভাগা!' উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কে? ইয়া রাসুলা-ল্লাহ' (সা.)? উত্তরে তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি মাতাপিতা উভয়কে অথবা যেকোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না।' (মুসলিম: ৬২৭৯)।

তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) আরও ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান আছে যাদের সে লালন-পালন করে এবং তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করে, তার জন্য অবশ্যই জান্নাত ওয়াজিব। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি দু'টি মেয়ে থাকে? নবীজী বললেন, দু'টি থাকলেও। [সহিহ বোখারী]

মানব সভ্যতায় মহিলাদের মর্যাদা এবং সামাজিক অবস্থান কোথায় তা মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ওয়াজ থেকেই আমরা পেয়েছি।

আজ মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী আমাদের মাঝে নেই। তিনি ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু মাওলানা সাঈদীর রেখে যাওয়া বক্তব্য, কোরআনের আলোচনা এবং তাঁর পাঠ্যপুস্তক এই সমাজে আলোর বাতিঘর হিসেবে কাজ করবে। মাওলানার রেখে যাওয়া আল-কোরআনের আদর্শ সমাজে কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে।

আমরা তাই মুসলমান মা বোনদের কাছে আবেদন রাখতে চাই । আসুন মহান শহীদ মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর রেখে যাওয়া অসমাপ্ত আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য একসাথে কাজ করি। আর সেই সাথে মহান মাবুদের সন্তুষ্টি লাভ করে আমরা যেন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি।

Departure of Maulana Sayedee

Syed Nuh

In a world of voices, strong and clear,
Stood Maulana Sayedee, without fear.
With his red beard and words so wise,
He touched hearts, reaching far and wide.

Imprisoned for his beliefs, he stood tall,
opposing systems that held others in thrall.
His influence spread like wildfire's blaze,
Guiding Muslims through life's winding maze.

From Bangladesh to Mecca's sacred land,
Funeral prayers held, a united stand.
His legacy lives on, forever enshrined,
In the hearts of those whose souls he refined.

Maulana Sayedee, a beacon of light,
His words of wisdom shining bright.
May his spirit inspire us each day,
to stand for truth and lead the way.

শহীদ আল্লামা সাঈদী রাহিমাহুল্লাহ

মুহাম্মদ উমর ফরহাদ

এই কোটি মানুষের ঢল,
দুই চোখ ভেজানো জল,
শকুন চক্ষু উপেক্ষা
কেবল তোমার জন্য।

এই লোকের তীব্র মাতম,
পবিত্র কুরআন পড়ার খতম,
জিয়ারত, দুরুদ, দোয়া
তোমার রুহের জন্য।

সেই জমিন কাঁপা কম্পন,
আর আকাশে মেঘের ক্রন্দন,
পৃথিবীর ম্লান ফরিয়াদ
তোমার বিদায় বেলায়।

সেই শিকল মুক্ত ক্ষণে,
সেই ঈমানদীপ্ত মনে,
বিজয় হাসিতে তুমি
সবুজ পাখির খেলায়।

তবু জুলুম হয়নি শেষ,
দেখো চলছে তেমন বেশ;
ঘন কালো মেঘ ভাসছে
দেশের ভাগ্যাকাশে ।

তবু তোমায় আবার চাই,
নাই বিকল্প সাঈদী নাই,
সেই বিপ্লবীদের জাগায়
যে প্রাণ বিলিয়ে হাসে।

দেখো কাঁদছে সেসব মাঠ,
আর হাহাকার বাজার-হাট;
বাতাসে ভাসছে ধ্বনি,
বিদায় দা'য়ী ইল্লাল্লাহ।

ইয়া ত'লাবুল জান্নাহ্,
নাফসুল মুতমাইন্না,
জান্নাতের সবুজ পাখি
সাঈদী রাহিমাহুল্লাহ।

- ২১ আগস্ট ২০২৩

প্রিয় আল্লামা

হাসান আল রুমি

একটি দরাজ কণ্ঠ
অসামান্য কথার যাদুময়তা
কী মোহনীয় তিলাওয়াতের মূর্ছনা
আর হৃদয়গ্রাহী ভাষণ
হে যুগের মুয়াজ্জিন।

কাল থেকে কালে সুদীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর
এ দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটির ধুলো যার পায়ে মিশে আছে
মাঠ থেকে ময়দান। শহর তল্লাট ছাড়িয়ে সমগ্র দুনিয়াব্যাপী
ইথার থেকে ইথারে।

হৃদয় থেকে হৃদয়ে-
অগণিত অসংখ্য মানুষের কাছে
যে আওয়াজ পৌঁছে যায় কালোত্তীর্ণ হয়ে!
সে আওয়াজ স্তব্ধ করে কোন জালিম?
সে আওয়াজ রুদ্ধ করে কোন অত্যাচারী শাসক?
সে আওয়াজ লুণ্ঠিত করে কোন স্বৈরাচার, সাম্রাজ্যবাদী?
প্রিয় আল্লামা!
ভেড়ার দল উৎসর্গ হয় জলসায়
আর সাহসীরা উৎসর্গ হয় যুদ্ধক্ষেত্রে
আপনি যুদ্ধক্ষেত্রই বেছে নিলেন।
আপনি সংগ্রাম বেছে নিলেন
আপনি জাতিকে শিখিয়েছেন সংগ্রাম হলো ইসলামের রাজটিকা।

নষ্ট পঁচা দুর্গন্ধ লেলিনবাদ আবু মার্কসবাদের-
শেষ নকশাটুকু মুছে দিলেন অগ্নিঝড়া হুংকারে!
ধর্মনিরপেক্ষতার অন্ধকারে যখন ঠোকর খাচ্ছিলো মানুষেরা
দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কদাচারে মানুষেরা যখন ওষ্ঠাগত;
তখন আপনিই আপামর জনতাকে জানালেন,
এ মাটি ইসলামের
এ মাটিতে মিশে
এ মাটিতে গেঁথে আছে ইসলামের গহীন শেকড়
আছে তিতুমীর, হাজী শরীতুল্লাহর বিদগ্ধ সংগ্রাম
এ মাটি খান জাহানের সফরী দলের তাবু ঘেরা
এ মাটি শাহ জালালের বছর ফেরা নোঙর আঁকড়ানো মাটি।

প্রিয় আল্লামা!
আপনার মোহিত ভাষণ অবিনাশী হয়ে-
জনতার হৃদয়তন্ত্রীতে মূর্ছনা জাগায়।
নদীর মতো কলকল করে বয়ে চলে
আপনার ঈমান জাগানিয়া কোরানের সুর
নিষ্ঠুর কারা প্রকোষ্ঠে কেটে গেছে আপনার তেরোটি বসন্ত!!
তীব্র অসহ্য যন্ত্রণায় কেটে গেছে আপনার একেকটি দিন
স্বজন পরিজনহীন একেকটি রজনী
তবুও রবের সন্তুষ্টির কাছে হেরে গেছে
সমস্ত অন্যায় আর জুলুমের বিবর্ণ দুনিয়া
জালিমের শত প্রলোভন থোরাই কেয়ার করে দিয়ে গেছেন
ত্যাগের নজরানা।

ওরা আপনাকে সহ্য করেনি
আপনার হাসিকে ওরা ভয় পেয়েছে
ওরা আপনাকে শহীদ করেছে!
শোকের কাসিদায় কোটি জনতা সেদিন অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছে!
আপনাকে হারানোর ব্যাথায় অজ্রস জনতার চিৎকারে আকাশ বাতাশ প্রকম্পিত হয়ে গিয়েছে
জনতার জায়নামাজে লেপ্টে গেছে কান্নার দরিয়া
আর কলিজায় মোড়ানো সব বিদ্রোহ
এক পলক দেখতে চাওয়ার কি আকুল বেদনা!
বক্ষ উজাড় করা তরুণ যুবক নারী আবালু বৃদ্ধ বর্নিতার আকাশের দিকে হাত তুলে সে কি দরদী মুনাজাত!
প্রিয় নেতা, প্রিয় রাহবার,
আপনাকে হারিয়েছি!
নিরব বেদনায় বারবার হাহাকার করে উঠি
তবুও আমরা শপথ নিয়েছি
আপনার দেখানো পথ ধরে
আল কোরআনকে বুকে নিয়ে
হক এবং বাতিলের সংগ্রামে
দুর্বোধ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে যাবো
সিংহের মত মাথা উঁচু করে
আমাদের কঠিন গণবিস্ফোরণে উল্টে দেবো
দখলদারের সমস্ত পাশা খেলা।

প্রিয় আল্লামা
আমাদের কোরআনের পাখি!
বেহেশতের এক খণ্ড জমিনে আপনার জন্য
নির্মিত হোক সুউচ্চ প্রাসাদ
অবারিত সবুজ ফুল বাগানে হোক আপনার পদচারণা!
ফেরদৌসের সফেদ পাঞ্জাবি।

মেহেদী রঙের মসৃণ দাড়ি আর
কারুকার্য খচিত টুপ্পির স্মৃতিচিহ্ন
আমাদের হৃদয় থেকে কোনদিন মুছে যাবে না!

গান

জুবায়ের আহমেদ তাশরীফ

আল্লামা সাঈদী তুমি মরনি
শহীদ হয়েছো তুমি এটাই জানি (২)

কারাগারে কাটালে তেরোটি বছর
বাতিল কেপেছে তোমায় দেখে থরথর (২)
তুমি যে ছিলে মোদের নয়নমণি
শহীদ হয়েছো তুমি এটাই জানি (২)

দেহ মাঝে যতদিন ছিলো তব প্রাণ
পড়েছিলে তুমি সেই প্রভুরি কালাম (২)
তাইতো তোমায় ভাবি প্রতিদিনি
শহীদ হয়েছো তুমি এটাই জানি (২)

দেখাতো হবে না আর এই জীবনে
দেখা হবে জান্নাতে ফুল বাগানে (২)
এ আশা কবুল কর আল্লাহ তুমি
শহীদ হয়েছো তুমি এটাই জানি (২)

আল্লামা সাঈদী তুমি মরনি
শহীদ হয়েছো তুমি এটাই জানি (২)

গান

হজরত আল্লামা সাঈদী

মোঃ রোকন আহমেদ

কুরআনের তাফসীর কে শুনাবে
হজরত আলামা সাঈদী ?
জালিমের কাড়াগার থেকে
মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে,
জান্নাতে দিলে পাড়ি।

হে কুরআনের পাখি
হজরত আলামা সাঈদী।

প্যারেড ময়দান থেকে করেছিলে
কুরআনের তাফসীর,
লক্ষ লক্ষ অমুসলিম শুনে
ইসলামে পথে হয়েছিল স্হীর।

হে কুরআনের পাখি
হজরত আলামা সাঈদী।
মিথ্যা অপবাদে গেলে তুমি
জালিমের কাড়াগারে,
আবেগ বশত হয়ে কত মুসলিম
গেছে শহিদের পথে।

কুরআনের তাফসীর কে শুনাবে
হজরত আলামা সাঈদী ?
জালিমের কাড়াগার থেকে
মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে,
জান্নাতে দিলে পাড়ি।

পৃথিবী যতদিন আছে,ততদিন
তুমি রবে বেঁচে,
তোমার মৃত্যু নেই ,তুমি আছো
জালিমের পথন একদিন হবে

-৩১ শ্রাবণ ১৪৩০

সংগঠন সংবাদ

লন্ডনে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) স্মরণে সেমিনার

বিশ্ব বরেণ্য ইসলামিক স্কলার ও মুফাসসিরে কোরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী স্মরণে লন্ডনে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের দাওয়াতে বিগত অর্ধশতাব্দী আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী যে অবদান রেখে গেছেন সেটা ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে। আল্লামা সাঈদী ছিলেন দ্বীনের নির্মূল এক খাদেম ও দ্বায়ী ইলাল্লাহ। কোরআনের তাফসীরে তাঁর দরদী ভাষা ও মাধুর্যতা মানুষকে শুধু আকৃষ্টই করে নাই, দ্বীনের আলো পৌঁছে গেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে। আল্লামা সাঈদী'র জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও কোরআনকে মানুষের অন্তরে প্রাণবন্ত ভাষায় রেখে গেছেন শতশত বছরের জন্য। বক্তারা বলেন, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং কোরআন মানব জীবনের সংবিধান এই কথাটি আল্লামা সাঈদী'র মতো তাফসীর মাহফিলে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে দিতে পারেননি। আল্লামা সাঈদী মানুষকে বুঝিয়েছেন ইসলাম ছাড়া মানুষের জীবন পরিপূর্ণ নয়। ইসলাম সকল অন্ধকারের বিপরীতে তারুণ্যকে আলোর পথ দেখাতে পারে।

কমিউনিটি ও ইসলামিক ব্যক্তিত্ব দিলওয়ার হোসেন খানের পরিচালনায় মুসলিম ভয়েস এর উদ্যোগে গত ৩১ আগস্ট (বৃহস্পতিবার) লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুসলিম এসোসিয়েশন এর সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট মুসলেহ ফারাদী, ইস্ট লন্ডন মসজিদের ঈমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ও আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী'র আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু নাসের মোহাম্মদ আব্দুজ জাহের, ইউকে বাংলাদেশী উলামা-মাশায়েখ কমিটির প্রেসিডেন্ট শায়খ মওদুদ হাসান, টাওয়ার হ্যামলেট'স কাউন্সিলর স্পীকার কাউন্সিলর জাহেদ চৌধুরী, শ্রীলঙ্কান মুসলিম কমিউনিটি-বৃটিশ মুসলিম সোসাইটির অন্যতম সদস্য আনসার মোহাম্মদ মাহির, খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ, টোটেনহ্যাম মসজিদ আয়স্থুর ইমাম ও খতিব মাওলানা খিদির হুসাইন, প্লাস্টো মসজিদ ইব্রাহিম এর ইমাম ও খতিব আবু বক্কর সাজ্জাদ, মুসলিম ভয়েস এর কনভেনার নাহিদ মাহফুজ প্রমুখ।

বক্তারা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসির ও সাবেক সংসদ সদস্য আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী'র মাধ্যমে বিগত পাঁচ দশকে ইসলামের দাওয়াত ও ইসলামী আন্দোলনকে জনপ্রিয় করতে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন সেটার উল্লেখ করে বলেন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ১৯৭৪ এবং ২০০৪ সালে ইস্ট লন্ডন মসজিদের জন্য তহবিল সংগ্রহে পবিত্র কাবা'র ইমাম ও খতিব শায়খ আবদুল রহমান সুদাইস এর সাথে যোগদান করেন।

মুসলেহ ফারাদী বলেন, আমি বাংলাদেশের বৃহত্তর নোয়াখালীর ফেনীতে মাওলানা সাঈদীর সাথে প্রথম দেখা করি। তিনি বহু মানুষকে নানাভাবে মুগ্ধ করেছেন। তাঁর জানাজার পর শেষ বিদায় জানাতে প্রার্থনা করতে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি প্রমাণ করেছে তিনি যখন সংসদ সদস্য ছিলেন তখন প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর অবদান প্রমাণিত। ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তীব্র প্রতিবাদে তিনি কখনো পিছপা হননি। তার প্রতি যা করা হয়েছিল তা ছিল অবিচার ও বিচারের নামে মহা অন্যায়।কথিত আদালত যখন তাঁর মৃত্যুদণ্ডের অন্যায় রায় দেয়, তখন সে রায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় ১৫০ জনেরও বেশি মানুষ জীবন দিয়েছিলো। তাঁর অবদানেই বাংলাদেশে তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের এতো জনপ্রিয়তা।

মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম বলেন, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একজন উঁচুমানের ইসলামিক সুবক্তা দার্শনিক ছিলেন। প্রচুর সময় নিয়ে পড়াশোনা করতেন। বাড়িতে তার একটি বিশাল লাইব্রেরি আছে, খুব গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করে এবং এটি তাকে এত উচ্চ পদে নিয়ে আসে। তিনিই বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোরআনকে সম্প্রদায় ও সামাজিক ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে নিয়ে আসেন।

১৯৭৫ সাল থেকে জেলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা তার সাথে অনেকবার দেখা করেছি। মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান।

ইমাম খিদির হুসাইন বলেন মাওলানা সাঈদী ছিলেন সমাজের পরিবর্তনের কারিগর, তাঁর আশ্চর্যজনক বক্তব্য, দোকান, ব্যবসা, অফিস, বাড়িতে সর্বত্র তাঁর ক্যাসেট বাজিয়েছেন আপামর জনতা। তিনি হক, সত্য, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সারাজীবন ওয়াজ করেছেন, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আপস করেননি। সমাজের অন্যায়, অনৈতিকতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ভূ-রাজনীতি, স্থানীয় জ্ঞান, সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান রয়েছে, ১৯৮০ সালে তার দেওয়া বক্তৃতা শুনলে যেন মনে হয় তিনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে কথা বলছেন।

অধ্যাপক আব্দুজ জাহের বলেন ১৯৭২ সাল থেকে আল্লামা সাঈদীকে চিনি। আমি ১৯৭২ সালে চাঁদপুর কোর্টে একটি তাফসীরুল কুরআনে প্রধান অতিথি হিসাবে তার সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে টানলেন, আমি তার আসন্ন স্পর্শ শুনলাম এবং তার সাথে একসাথে আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। তিনি শুধুমাত্র কুরআন প্রচারের জন্য বাংলাদেশের বৃহত্তর সমস্ত জেলা ভ্রমণ করেছিলেন। আমি যখন বাংলাদেশে সৌদি দূতাবাসে সেক্রেটারি ছিলাম তখন অনেক আরব তাকে খতিব, আল্লামা, শেখ বলে আখ্যায়িত করেছিল। তিনি বদলে দিয়েছেন মানুষের রুচি, কুরআনের বর্ণনায়। সাধারণ শিক্ষার লোকেরা অল্প সময়েই নামাজের অভ্যাস করে, কিন্তু আল্লামা সাঈদীর অবদানের কারণে তারা কোরআনকে বুকে নিয়েছিল। ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তিনি কুরআনের জন্য কাজ করেন, কুরআনের জন্য মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কুরআনের সাথে থাকেন।

শেখ মওদুদ হাসান বলেন আল্লামা সাঈদী শুরু করেছিলেন জনপ্রিয় স্লোগান, আল-কুরআনের আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো। আজ প্রতিটি ঘরে ঘরে সেই আলোয় আলোকিত করেছেন তিনি।

ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সীরাত সম্মেলনে তার সঙ্গে দেখা হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময়। যুক্তরাজ্যে কুরআন প্রচারে তার অবদান অপরিসীম, মসজিদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা। ইসলামের জন্য জীবন দিয়েছেন। আল্লাহ তার অবদানকে কবুল করুন, আমিন।

আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) এর আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সিদ্দিকী বলেন, ২০১৩ সালের ১৯ জুন আল্লামা সাঈদীর কে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এবং তারপর তাকে মানবতার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়। আমি তাকে বাংলাদেশ হাইকোর্টে ডিফেন্ড করেছি এবং প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে, যে তিনি নির্দোষ, তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ ও জুলুম করা হয়েছে। তাকে রক্ষা করার জন্য সবচেয়ে বড় তৃপ্তি। তিনি প্রতি মুহূর্তেই মর্টার হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। জাতির কাছে প্রমাণ করতে পেরেছি তিনি নির্দোষ।

বক্তারা আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর মাগফিরাত কামনা করে আরও বলেন তিনি জাতীয় সংসদে শিরকী প্রথার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। সমাজ সেবায়ও তার অসংখ্য ভূমিকা রয়েছে। দেশ বিদেশে তার অগণিত ভক্ত রয়েছে। তিনি কারাবন্দী অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তার ইন্তিকালে জাতি একজন ইসলামী স্কলার ও কুরআনের খাদেমকে হারিয়েছে। যা পূরণ হবার নয়।

অনুষ্ঠানের মাঝেমাঝে মেসেজ কালচারাল গ্রুপের পক্ষ থেকে ইসলামিক নাশিদ পরিবেশন করা হয়।

মরহুম আল্লামা সাঈদীর প্রতি ওল্ডহামবাসীর ভালোবাসা

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তাফসিরের মাধ্যমে ইসলামের পুনর্জাগরণে অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন

বৃটেনের সর্বদলীয় উলামা সংগঠন বাংলাদেশী উলামা মাশায়েখ ইউকের উদ্যোগে বরেণ্য মুফাসসিরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) স্মরণে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর এক আলোচনা সভা গত ২৪ সেপ্টেম্বর (রবিবার) লন্ডন মুসলিম সেন্টারের গ্রান্ড হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাওলানা মোহাম্মদ হাসান ও মাওলানা দেলোয়ার হোসেনের তিলাওয়াতের মাধ্যমে সূচিত আলোচনা সভায় সংগঠনের সভাপতি মাওলানা এ কে মওদুদ হাসানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শাহ মিজানুল হক এর পরিচালনায় বৃটেনের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম, পেশাজীবী ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, মসজিদ সমূহের প্রতিনিধি ও বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অতিথিগণ তাঁদের আলোচনায় বলেন, মাওলানা সাঈদী সাহেব বাংলাদেশের সমাজ ও জন মানুষের ইসলামী পুনর্জাগরণের চেতনা জাগ্রত করতে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ওয়াজ ও বয়ানের ময়দানে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনেন। আল কোরআনের সুমিষ্ট তিলাওয়াত ও এর আলোকে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে তুলে ধরে তিনি সাধারণ ও শিক্ষিত সমাজে ব্যাপক জাগরণ তৈরি করেন। তিনি হক্ব চিহ্নিত করণে উচ্চাঙ্গ সাহিত্য সম্বনিত প্রাঞ্জল উপস্থাপনা মানুষকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতো।

বাংলাদেশের মানুষের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে যার প্রভাব সুদূর প্রসারী। তাঁর অন্যায় গ্রেফতারে তাই বাংলাদেশে নজিরবিহীন প্রতিবাদ হয় এবং প্রায় দেড়শতাধিক মানুষ জীবন দান করে। তিনি ছিলেন ইসলামের এক বিপ্লবী কণ্ঠ। অতিথিগণ বলেন, তাঁর এই অনন্য ও সাহসী ভূমিকার জন্য ইসলাম বিদ্বেষীরা সমাজ জীবনে খুব কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। তাই তাঁর বিরুদ্ধে এবং তাঁর কণ্ঠকে দমিয়ে দেবার জন্যে সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র করে তারা। যা তাঁকে অহেতুক মামলায় দীর্ঘদিন কারাভোগ করে অবশেষে কারাবন্দি ব্যক্তি উদ্যোগে ওল্ডহামের চিরচেনা, প্রিয় কিছু মুখ, বিবেকের দায়বদ্ধতা থেকে "ওল্ডহাম মুসলিম সোসাইটির" ব্যানারে স্থানীয় গ্রান্ড ভেনুতে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে।

ইউ, কে তে প্রতিবছর অর্থাৎ ১৯৯৯ সাল থেকে শুরু করে জেল জীবনের আগ পর্যন্ত আল্লামা সাঈদী 'ইসলামিক ফোরাম অব ইউরোপ' এই সংগঠনের আমন্ত্রণে বৃটেনের সবকটি শহরে ওয়াজ নসিহত করতেন। এই সংগঠনে তার অবদান অনস্বীকার্য।

আল্লামা সাঈদীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা অফুরন্ত, আকাশচুম্বী। যার প্রমাণ দিয়েছে ওল্ডহামবাসী। দলমত নির্বিশেষে সবাই এসেছেন, এক কাতারে সামিল হয়েছেন। প্রিয় ওল্ডহামবাসীকে আমাদের পক্ষথেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন।

অবস্থায় বিদায় নিতে হয়েছে। তাঁরা বলেন, মাওলানা সাঈদী সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার নির্মম জুলুমের শিকার।

অতিথিগণ তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম কামনা করেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন দাওয়াতুল ইসলামের আমীর হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদ, সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, ইসলামী শরীয়া কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল ড. শায়খ শোয়াইব হাসান, ইস্ট লন্ডন মসজিদের খতীব শায়খ আবদুল কাইয়ুম, খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুসলেহ ফারাদী, জমিয়তে উলামা'র কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক ড. মাওলানা শোয়েব আহমদ, বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার নজির আহমদ, মাজাহিরুল উলুম লন্ডন এর প্রিন্সিপাল মাওলানা ইমদাদুর রহমান মাদানী, খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের সভাপতি মাওলানা ছাদিকুর রহমান, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী, ইসলামী টিভি ভাষ্যকার মুফতি আবদুল মুনতাকীম, মুফতি মাওলানা হাসান নূরী চৌধুরী ও মাওলানা আবদুল মালেক মুহসিন প্রমুখ।

এ উপলক্ষে একটি সমৃদ্ধ স্মরণীকা প্রকাশ এবং উপস্থিত অতিথি ও মুসল্লিগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গিপুর জেলার পাঁচবেড়িয়া ফুটবল মাঠ প্রাঙ্গণে আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.)-এর গায়েবানা জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাযা নামাজে ইমামতি করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক শেখ তাহের উদ্দিন। জানাযার পূর্বে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.) জীবন ও কর্মের ওপর তিনি বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, সাঈদী বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপোষহীন ছিলেন। তিনি একজন মর্দে মুজাহিদ ছিলেন। আজীবন তিনি সত্যের পক্ষে লড়াই চালিয়ে গেছেন।

ফিনল্যান্ডে সাঈদীর জন্য দোয়া ও গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত

ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে গত ১৬ আগস্ট মুসলিম কমিউনিটি অফ ফিনল্যান্ডের উদ্যোগে বিশ্ব বরেণ্য আলেমেদ্বীন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী-এর গায়েবানা জানাজা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে নিম্নোক্ত সংগঠনের নেতাকর্মীগণ অংশগ্রহণ করেনস–

1. মুসলিম ফোরাম ফিনল্যান্ড (বাংলাদেশী)
2. মসজিদ দারুল আমান ও ইসলামিক সেন্টার (বাংলাদেশী)
3. এসপো ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদ (বাংলাদেশী)
4. কনতুলা ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, মালমী (বাংলাদেশী মসজিদ)
5. আলহেরা ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদ (বাংলাদেশী)

জানাযা পূর্ব বিশাল গণ সমাবেশে বক্তব্য রাখের ফেডারেশন অফ ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ফিনল্যান্ডের সভাপতি আলাদীন মাহের (মিসরী)। স্মৃতিচারণ করেন মুসলিম ফোরাম ফিনল্যান্ডের দাওয়া সম্পাদক ডা. খালিদ সাইফুল্লাহ। মূল আলোচনা পেশ করেন ফেডারেশন অফ ইসলামিক অর্গানাইজেশনস অফ ফিনল্যান্ডের সাবেক সভাপতি ও দারুল আমান মসজিদের ইমাম ও খতিব মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুছ খান।

রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টের কেন্দ্রীয় মসজিদে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী-এর গায়েবানা জানাযা

রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টের কেন্দ্রীয় মসজিদে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী-এর গায়েবানা জানাযা জুম্মার নামাজের পর অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ইমামতি করেন শায়খ আহমেদ বায়ুমী। বিভিন্ন দেশের অসংখ্য কুরআনপ্রেমি জনতা এতে অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে আল্লামার জন্য দোয়া করা হয়েছে।

সাইপ্রাসে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী-এর গায়েবানা জানাযা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

একজন সত্যের সাক্ষীর বিদায়

যার কথা শুনতে দৌড়ে দৌড়ে মাহফিলে যেতাম, যতদুর দেখতাম শুধুই মানুষের ঢল। নিজেই দেখেছি পল্টনের একটা তাফসীর মাহফিলে কিভাবে বোমা মেরে বানচাল করতে চেয়েছিল অভাগারা, পারেনি দমাতে। সেই বজ্রকণ্ঠ কাপিয়ে ফেলে দিয়েছিল উদ্ধত শাসকগোষ্ঠীকে। সেই মধুময় কণ্ঠ নকল করতে দেখেছি হাজারো আলেমদের। ঘরে ঘরে, বাজারে বাজারে যার ওয়াজের ক্যসেট চলতো। একটি বিশেষ দলে যোগ দেয়াই তার জন্য কাল হলো (অনেকের মতে)। উনি বলেছিলেন উনি সেরাদের দলেই আছেন, থাকবেন সত্যের সাক্ষীদের সাথেই। কিন্তু জালেমেরা এটাকেই পুঁজি করে উনাকে অপবাদ দিয়ে জেলে পুরে দিল। যুগে যুগে, জেলে জেলে কত নবি, অলিরা আল্লাহর প্রিয় হয়েছেন এই জুলুমের মাদ্ধমে। এতটুকুও টলাতে পারেনি খুলুসিয়াত, ইমানের দিপ্ত হাসিতেই সকল সত্যের সাক্ষদের মতই উনার বিদায়। কবুল করো

ও প্রভু, আমাদেরও সে পথে রেখো আজীবন।

এমন কজন ওয়াজেইন আছেন/ছিলেন যারা যৌতুক না নেবার ওয়াদা নিতেন, দুহাত তুলে আল্লাহ কে সাক্ষি রেখে বলতে বলতেন ওআজ থেকে আর নামাজ ছেড়ে দেব না ওআজ থেকে ঘুস/সুদ খাবো না, দুর্নীতি করবো না. কাছের অনেক ভাইদের দেখেছি দল-মত্ বাদ দিয়ে উনার মাহফিলে যোগ দিতে। যিনি পথ দেখিয়েছেন এদেশের হাজারো ওয়াজেইনদের- কিভাবে বিষয় ভিত্তিক ওয়াজ করতে হয়। ওয়াজের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, লক্ষ্য লক্ষ্য ভাই-বোনদের হেদায়েতের পথ বাতলে দিয়েছেন, কত যে নও মুসলিম কালেমা পরে সত্যের দিশা পেয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

কোরান হাতে নিয়ে বলে যেতেন- উনার স্বপ্নের কথা। একদিন এদেশে কোরানের আইন কায়েম হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ গফুর উনাকে জান্নাতের মেহমান হিসেবে নিয়ে গেছে। আমরা দোয়া করি উনার সপ্ন যেন আমাদের দিয়ে আল্লাহ বাস্ড়বায়নের তৌফিক দেন। নিজেদের জীবনকে ও সমাজকে যেন কোরানময় করতে পারি। আমিন।

ছবি- সাঈদী সাহেবের জন্য ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে দারুল আরকাম মসজিদে আয়োজিত দোয়ার অনুষ্ঠান (১৪ই আগস্ট ২০২৩ বাদ মাগরিব)

ইতালির রোমে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী-এর গায়েবানা জানাযা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্মৃতি এ্যালবাম

নিজ নির্বাচনী এলাকা পিরোজপুর-১ আসনের জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বৃক্ষ মেলা উদ্বোধন শেষে পরিদর্শন করছেন জনতার নেতা কোরআনের পাখি আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.

সিংগাপুরের 'ইসলামিক রিলিজিয়াস কাউন্সিল ইন সিংগাপুর (আইআর-সিএস)' এর আমন্ত্রণে সিংগাপুরের 'তামপিন্স ষ্টেডিয়ামে' আয়োজিত তাফসীর মাহফিল শেষে আয়োজকবৃন্দের সাথে

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মহান রবের দরবারে সিজদারত কোরআনের পাখি আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.

আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ. প্রতিষ্ঠিত দারুল কুরআন সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসা খুলনার একটি অনুষ্ঠানে বাম দিক থেকে বসা ১. কোরআনের পাখি আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ. ২. সাবেক ধর্ম মন্ত্রী ও জমিয়াতুল মুদারিসিনের এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান রহ. ৩. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সাবেক আমীর শায়খুল হাদীস আলামা আজিজুল হক রহ.

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রধানমন্ত্রী ও দুবাইর শাসক শেখ মোহাম্মাদ বিন রাশেদ আল মাখতুমের ব্যবস্থাপনায় দুবাইর জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে আয়োজিত তাফসীর মাহফিলের প্রধান অতিথি আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ. এর সাথে মাহ-ফিলের স্টেজেই সাক্ষাত করতে এসেছেন দুবাইর এটর্ণী জেনারেল ইব্রাহিম বুমিলহা।

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটিতে আয়োজিত ইসলামিক কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন তাফসীর সম্রাট আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.

১৯৮৭ সালে পাকিস্তানের করাচীতে আয়োজিত তাফসীর মাহফিলের প্রধান অতিথি আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.

১৯৯৩ সালে আমেরিকার জাতিসংঘের সামনে আয়োজিত মুসলিম ডে প্যারেড অনুষ্ঠানে গ্র্যান্ড মার্শাল পদক প্রাপ্তির পর বিশ্বের বাছাইকৃত চারশত ইসলামিক স্কলারের সাথে বাংলাদশের অহংকার আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রাহিমাহুল্লাহ।

সংসদ সদস্য থাকাকালীন অবস্থায় নিজ এলাকার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শনে জনতার নেতা আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রাহিমাহুল্লাহ

করাচী সফরকালে পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত দৈনিক জং- কে সাক্ষাতকার প্রদান করছেন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.

সপ্তম জাতীয় সংসদের একটি অধিবেশনে বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রাহিমাহুল্লাহ

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে সাউথ কেরিয়ান মুসলিম ফেডারেশন নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে স্মারক উপহার গ্রহণ করছেন বিশ্বনন্দিত মুফাসসির আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.

১৯৮৬ সালে আমেরিকার মহাশুন্য গবেষণাগার নাসা পরিদর্শনে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.

সিলেটের আলীয়া মাদরাসা মাঠে আয়োজিত তাফসীর মাহফিলে বিশ্বনন্দিত মুফাসসির আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ. এর তাফসীর শুনে ইসলাম গ্রহণকারী কয়েকজন

সিলেট বিমান বন্দরে নগরিক সংবর্ধনা সভায় আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.

জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজ নির্বাচনী এলাকা পিরোজপুর-১ আসনে ২০০৪ সালে নতুন একটি উপজেলা প্রতিষ্ঠা করেন জনতার সেবক আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। জিয়ানগর নামক সেই উপজেলা উদ্বোধনের পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আলামা সাঈদীর হাতে জিয়ানগার উপজেলার চাবি তুলে দিচ্ছেন স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ ও জনপ্রতিনিধিগন

পদ্মা সেতুর দাবিতেও আন্দোলন করেছিলেন আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.। ২০০৫ সালে পদ্মা সেতুর দাবীতে পদ্মার পাড়ে দক্ষিণাঞ্চলের জনগনকে সাথে নিয়ে দাবি আদায়ে লক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন পিরোজপুরের উন্নয়নের রূপকার জনতার সেবক আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.।

১৯৮৯ সালে আমেরিকা সফরকালে ভয়েস অব আমেরিকা-কে সাক্ষাৎকার প্রদান শেষে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধানসহ অন্যান্যদের সাথে আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.

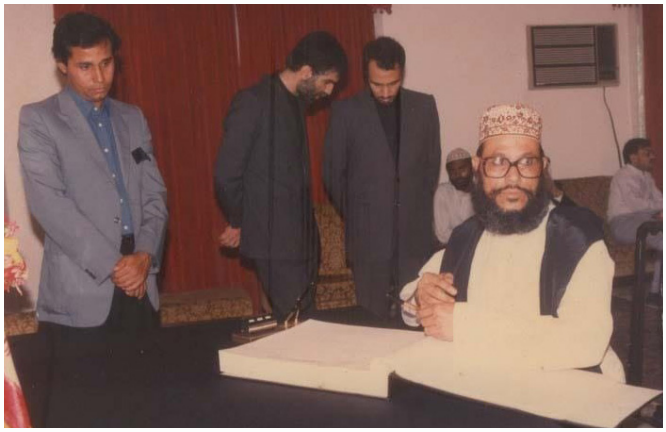

১৯৮৯ সালে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ইন্তেকালের পর ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের শোকবইতে শোকবানী প্রদান করছেন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.।

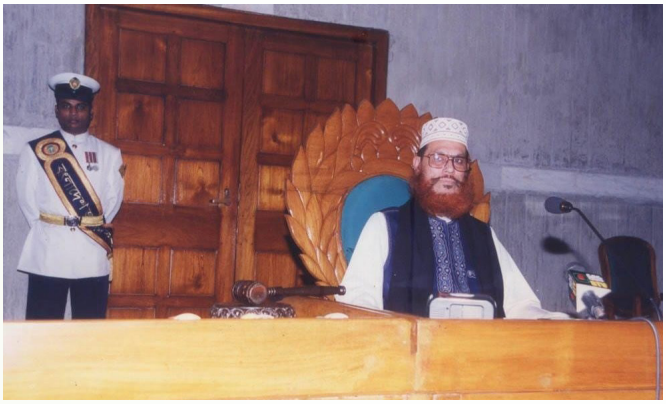

সপ্তম জাতীয় সংসদের একটি অধিবেশনে জাতীয় সংসদের স্পীকারের দ্বায়িত্ব পালন করছেন বিশ্বনন্দিত মুফাসসির আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রাহিমাহুল্লাহ

বিশ্বব্যাপী কুরআনের বানী প্রচারে বিশেষ অবদান রাখায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালর ভিসি'র হাত থেকে

ইসকপ প্রদত্ত সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন বিশ্বনন্দিত মুফাসসির আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.।

আওয়ামী জালিম সরকার কর্তৃক ২০১০ সালে গ্রেফতারের পর আদালত থেকে প্রীজন ভ্যানে করে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল, সাবেক মন্ত্রী শহীদ আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ ও সাবেক এমপি, বিশ্বনন্দিত মুফাসসির, কোরআনের পাখি, শহীদ আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.

ইটালীর রাজধানী রোমে আয়োজিত তাফসীর মাহফিল শেষে গাড়িতে উঠার প্রাক্কালে ভক্তকূল পরিবেষ্টিত আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.।

জাতীয় সংসদে ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী সভায় সভাপতিত্ব করছেন স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান আলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রহ.।

FLIGHT CONCEPT ®
Flight Concept will take you there
Flight
Ticket
Hotel
Umrah
• WORLDWIDE AIR TICKET
• HAJJ & UMRAH
• HOLIDAY PACKAGE
• CARGO SERVICE/DHL/ UPS/TNT/FEDEX
• WORLDWIDE HOTEL
• E-VISA NO VISA
• MONEY TRANSFER
• PASSPORT RENEW
FLIGHT CONCEPT
HotLine: 020 7375 0055
info@flightconcept.co.uk
ETIHAD
SAUDIA
GULF AIR
QATAR
Emirates
bangladesh
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
Address: 117 Whitechapel Road, London, E1 1DT, United Kingdom

ALL SEASON FOODS
ALL SEASON FOODS
SANDWICH & CHILLED FOOD SUPPLIER
RAMADAN SPECIAL OFFER FOR IFTAR
SCHOOL MEAL CATERER
HALAL
WEDDING & EVENT MANAGEMENT
Contact Us
020 7423 9366
www.allseasonfoods.com
88 Mail End Road, El 4UN
info@allseasonfoods.com
sandwiches@allseasonfoods.com

KARAM AL - HEJAZ

FOR UMRAH SERVICES

AlMadinah AlMunawwarah - Hotel Karam AlMadinah - Beside Masjid AlGhamamah
Mobile: +966 542940540, +966 538932179
Email: karamalhijaz@gmail.com, khumrahservice@gmail.com

Muslim Community Association

Seeking social and spiritual renewal

The Muslim Community Association (MCA) is a community organisation whose values are enshrined in the Qur'an and the Prophetic Traditions. It charts a balanced message, the Middle Path (al-wasatiya) understanding of Islam and its members are guided by the spiritual teachings, ideals and moral values that emanate from their faith.

Aims:

The aims of MCA are to bring about a spiritual, moral and social renewal based on faith-based values.

Objectives:

The objective of MCA is to strive for the pleasure of Allah (God) by worshipping Him alone and serving humanity.

Who we are.

MCA is a collective of community activists, Muslim personalities, scholars and professionals from different backgrounds. Our membership comprises mainly of British born and bred Muslims. Youth, women and the elderly are all catered for within the organisation. Over the past decades, a number of MCA members have gone into successfully lead various local and national projects in the United Kingdom, which is a testament of the organisation's contribution and outreach.

What we do

Since its inception, the MCA has evolved to deliver timely community-based work and initiatives. Faith communities in the UK have a cherished record of providing values and hope to their adherents as well as the wider society, and in-turn contributing towards the building of a cohesive society.

MCA is active in the fields of education, youth development, interfaith dialogue, outreach and awareness through collective community endeavours. It also provides training and development and helps its members and the wider Muslim community be civic minded and play an active role in society, including engaging in the democratic process.

MCA values partnership work with other organisations, to help remove barriers in accessing education and public services. It has been also known for its activeness in campaigning for social justice issue issues in the UK and abroad.

A core part of MCA's effort is to correct negative characterisation of Islam and Muslims which abound in the media, literature and popular culture. We address these through dialogue, debate and positive interaction which take the form of organising seminars, workshops, exhibitions, as well as publishing and distributing Islamic literature.

We are firm believers in dialogue and discussion that lead to better understanding and appreciation of one and another.

Muslim Community Association

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

3rd Floor Business Wing
38-44 Whitechapel Road
London E1 1jx
www.mcasite.org

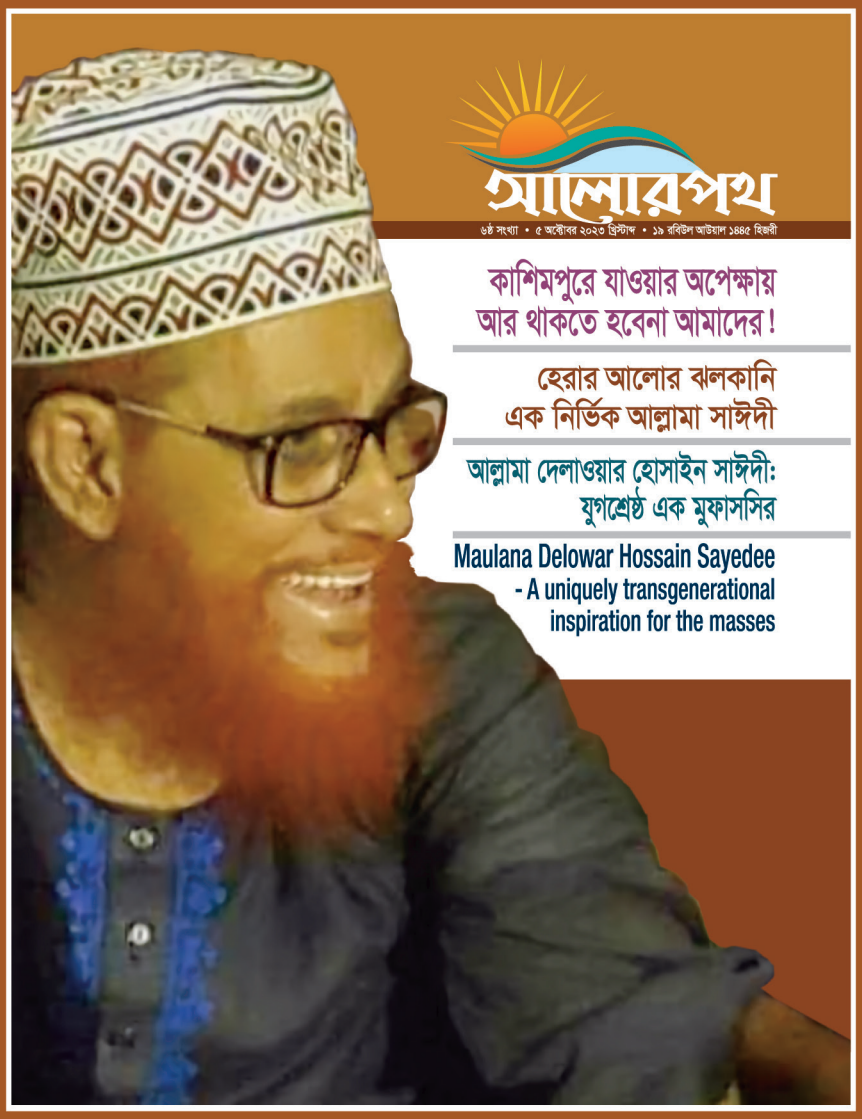

আলোরপথ

৬ষ্ঠ সংখ্যা • ৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ • ১৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরী

কাশিমপুরে যাওয়ার অপেক্ষায় আর থাকতে হবেনা আমাদের!

হেরার আলোর ঝলকানি এক নির্ভিক আল্লামা সাঈদী

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী: যুগশ্রেষ্ঠ এক মুফাসসির

Maulana Delowar Hossain Sayedee - A uniquely transgenerational inspiration for the masses